কুঞ্জে বাঁধা তরু দেবদার,
আসিয়া শুইল তলে তার।
করুণায় শিলাতল
পাতিয়া দিল অঞ্চল,
পদে সন্ধ্যা, শিরোপরে দিবা।

মুখর পাখীর কলস্বব
পূর্ণ ক'রে দিল বন-ঘর।
অঙ্কস্থ শিশুর চোখে
স্নেহ দৃষ্টি ধ'রে রেখে
বুকের উপর দিয়া হিযা,

যেন স্বর্ণকিরীটিনী মাতা
প্রাণময়ী দেবী শৈলসুতা
বালকে বিস্মৃতি দিতে
শৈল নির্ঝরিণী হ'তে
আনে গান ঘুম পাড়ানিযা।

সুষুপ্তি না আসিতে স্বপন
যুবারে করিল আকর্ষণ;
অন্তশ্চক্ষু মেলি হেরে
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে
বাম করপত্রে মুখখানি—

ভূমে লুটে সোণালি অঞ্চল,
পদপ্রান্তে সুশুভ্র কমল,
শিলায় হেলান দিযে
দাঁড়াইয়া আছে চেয়ে
তার পানে সুন্দরীর রাণী।

শুধু দৃষ্টি—পলকবিহীন,
শুধু দৃষ্টি—বচনবিলীন,
রুদ্ধ চারু ওষ্ঠাধরে
যেন যুগ যুগ ধ'রে
লুকাইয়া আছে কত কথা।

ব্যাকুল পিয়াসী চারিধারে
ঘেরে বসে সুন্দর মন্দিরে
উৎসর্গ করিছে ব্যথা,
তথাপি একটি কথা
ছাড়িল না অধর মমতা!

বিশ্বের নীরব অশ্রুজল
তুলিল তুমুল কোলাহল—
প্রচণ্ড স্পন্দন ঘায়
যায়—বক্ষ ভেঙ্গে যায়
তাড়নে জাগিয়া উঠে যুবা।

দুহ করে মুছিয়া নয়নে
চাহে সে স্বপন অন্বেষণে।
চেয়ে দেখ চারিধার
কুঞ্জে বাধা দেবদার,
তার মাঝে কোথা যেন কেবা।

কোথা হ'তে কেবা যেন এসে
জাগাইয়া ঘুমন্ত পরশে
নিঃশব্দে চলিয়া গেছে
কুঞ্জ ঘরে লুকায়েছে
আঁধার কবাট দিয়া দ্বারে।

পড়ে আছে সুগন্ধ নিশ্বাস,
ফেলে গেছে বসন বিলাস—
সোণালি অঞ্চল তার
বায়ু লয়ে উপহার
মণ্ডিত ক'রেছে শৈল শিরে।

আত্মরতি ছিল তার সার,
আজন্ম সাথী সে আপনার—
নিত্য এসে তার কাছে
মুগ্ধনেত্রে ফিরে গেছে
পদতলে তটিনী রচিয়া।

একান্তে বনান্তে পেয়ে দেখা
প্রতিশোধ নিতে চিত্রলেখা
আজি এক ছবি এঁকে
তৃষিত-তরঙ্গ-মুখে
সুপ্ত হিয়া দিয়াছে ঢালিয়া।

সবে মাত্র আজিকার প্রাতে
এলো সঙ্গী কোন দেশ হ'তে—
কত পরিচয় নিয়ে
মনোমত কথা কয়ে
তাহারে লইয়া এলো সাথে।

গিরি হ'তে গিরিরন্ধ্র কত
মধুগানে হ'ল মুখরিত—
জীবন্ত হাস্যের ধারা
কুঞ্জে কুঞ্জে ঢেলে তারা
অপরাহ্নে গেল কোন্ পথে।

সুবারে করিতে পরিহাস
তাদেরি কি ছড়ানো বিলাস—
শিলাজলে মিশাইয়া
দীর্ঘশ্বাস সূত্র দিয়া
রচিল এ সুধাবিন্দু কার ?

সঙ্গোপনে সঙ্গোপনে মিলে
পুষ্পমধু পবন হিল্লোলে,
তড়িত জমাট বেঁধে
আপনি কি এলো সেধে
তিলোত্তমা হয়ে উপহার ?

কে যেন ইঙ্গিত আকর্ষণে
লয়ে তারে গেল কুঞ্জবনে ;
সেথা আলো ছায়া সঙ্গে
জড়াজড়ি নৃত্যরঙ্গে
তাহারে করিল আবাহন—

পদশব্দে পদশব্দ কয়,
নিশ্বাসে নিশ্বাস বিনিময়,
কে যেন অনতিদূরে
কাছে গেলে যায় সরে
অঙ্গে দিয়া রঙ্গ আবরণ !

ব্যাকুল হইয়া যুবা ডাকে,
প্রাণময়ী পড়িল বিপাকে ।
"কেহ যদি হেথা রও
কথার উত্তর দাও,
বল তুমি নর কিম্বা নারী ।"

বক্ষ দেশে ছুটিল তরঙ্গ
মোচড়ি মোচড়ি উঠে অঙ্গ—
বিষাদ বসন প'রে
উত্তর আসিল ফিরে
রন্ধ্র মধ্য হ'তে কথা—"নারী"।

"নারী?" "নারী।" "সঙ্গে কেহ আছে?"
"আছে।" শুনে পাখী হাসে গাছে।
চারিধারে চায় যুবা,
কই হেথা আছে কেবা?
কোথা নারী, কোথা সহচর;

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার
নেমে এলো স্তূপের আকার।
অন্ধকার অন্ধকারে কয়,
স্তব্ধতার স্তব্ধ বিনিময়—
বুঝিবার গেল অবসর!

পল গেল, দণ্ড গেল, দিন,
বর্ষ হ'ল যুগান্তরে লীন,
নিত্য নিত্য ধ্বনিছুটে
আনে প্রতিধ্বনি লুটে
"সত্য ক'রে বল কেগো তুমি?"

আবার পাখীর কলস্বর
পূর্ণ ক'রে দিল বন-ঘর—
চড়ি শুভ্র মনোরথে
প্রভাত আলোকপথে
কথা ফিরে এল—"ওগো তুমি।"

[গ্রীক রূপক ব্যতীত কবিতাটীতে আর একটী উচ্চতর ভাব

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাঁর এক পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান প্রণালী।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কয়েক দিন পরে আবার ঐ চিন্তাই স্বামিজীর মনে প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমি ভবিষ্যতের যতটুকু দেখিতে পাইতেছি, তাহার শারীরিক ভিত্তি একটী বলশালী ও পৃথক্ নব জাতি।—ঐরূপ আধার ব্যতীত ঐ প্রকার চিন্তা স্থান পাইতে পারিবে না। সার্ব্বজনীনতা, উদারভাব—এ সকল মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর জগৎ উহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে না!"

নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবাত্মা জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিবার পর যখন উহাতে শ্রান্তি এবং বিরক্তি অনুভব করে তখন সে এই জগতে স্বীয় অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনুসন্ধানের প্রারম্ভে সে বুঝিতে পারে সমস্তই শক্তির খেলা। তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ নারীর ভিতর শক্তির বিশেষ বিকাশ দর্শন করিয়া নারীকে শক্তির প্রতীক বলিয়া থাকেন। শক্তির জ্ঞান উপস্থিত হইলে একজন শক্তিমানের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য জীবাত্মা তৎপরে শক্তিমানের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়--তখন সে একজন শক্তিমান পুরুষ যে আছেন ইহা বুঝিতে পারে। কিন্তু তৎক্ষণেই তাহার সন্দেহ হয়, তবে কি আমার শক্তি ও শক্তিমান পুরুষ এই তিন জনের অস্তিত্বই এককালে আছে। তখন সে আপনার নিকট হইতেই উত্তর পায়—না, শুধু তোমারই অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ 'তৎ ত্বমসি' এই জ্ঞান তখন তাহার নিকট উদ্ভাসিত হয়।—উঃ সঃ]

তিনি আবার বলিলেন, "মনে রাখিও—যদি তুমি একখানি জাহাজ দেখিতে কিরূপ তাহা জানিতে চাও, তাহা হইলে উহা ঠিক যেমনটী তেমনই ভাবে উহাকে বর্ণনা করিতে হইবে—উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার, এবং কি কি বস্তুতে উহা গঠিত—এই সকল বিষয়। কোন জাতিকে বুঝিতে হইলেও আমাদিগকে ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। ভারত মূর্ত্তিপূজক দেশ—স্বীকার করি। উহা যেমনটী আছে, ঠিক তেমনই ভাবে উহাকে সাহায্য করিতে হইবে—কোন কিছু বাদ দিলে চলিবে না। যাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা তাহার কোন উপকারই করিতে পারে না।

স্বামিজী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে, ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে। তাঁহার নিজের জীবনে দুইটী বিশিষ্ট সঙ্কল্প ছিল—একটী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্য একটী মঠ নির্ম্মাণ করা, এবং অপরটী স্ত্রীশিক্ষাকল্পে কোন উদ্যমের সূত্রপাত করিয়া যাওয়া। তিনি প্রায়ই বলিতেন, পাঁচশত পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করিতে পঞ্চাশ বৎসর লাগিতে পারে, কিন্তু পাঁচশত স্ত্রীলোকের দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উহা সাধিত হইতে পারে।

শিক্ষা দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইবার উপযোগী বিধবা ও অনাথ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, জন্মগত উচ্চ নীচ ভেদকে দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এইটী বিশেষ আবশ্যক যে, যাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হইবে, তাহারা যেন অল্পবয়স্ক হয় এবং গঠিতচরিত্র না হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জন্ম কিছুই নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সব।" কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি বুঝিতেন যে, এবিষয়ে অসহিষ্ণুতা অমার্জ্জনীয়। যদি বার বৎসরে কোন সুফল প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলেই বিশেষ সফলতা লাভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এটী এত গুরুতর কার্য্য যে উহা সম্পাদনে সত্তর বৎসর লাগিলেও তাহা অধিক হইবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক নানা

খুঁটিনাটী সম্বন্ধে কথা কহিতেন, একটী আদর্শ বিগ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে অনেক আকাশকুসুম রচনা করিতেন, এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাদরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতেন। হয় ত তাহার কোন অংশটীই যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত হইবে না, তথাপি উহার সবটুকুই নিশ্চিত মহামূল্য। কারণ, উহা হইতে দেখা যায়, তিনি কত স্বাধীনতা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দিক হইতে, কিরূপ ফলকে তিনি সুফল বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও বুঝা যায়।

ইহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, এই সকল প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হইবে—ইহার অন্য কারণ না থাকিলেও একটী প্রধান কারণ এই ছিল যে, আমি সেই সময়ে হিন্দুদিগের ধর্ম্মচিন্তাসমূহের আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলাম। এই প্রণালী সকলে পাণ্ডিত্যের দিকে তত লক্ষ্য না রাখিয়া উহাদিগকে সাধুজীবন যাপনের অনুকূল করিবারই বিশেষ চেষ্টা ছিল। কোন্ কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, তদপেক্ষা শিক্ষার প্রকৃতিটীই তাঁহার সমধিক চিন্তার বিষয় ছিল। "আমাদিগের বিদ্যালয় হইতে এমন সব নারী শিক্ষিতা হইবে, যাহারা ভারতের সকল নরনারীর মধ্যে মনীষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে"—একবার মাত্র হঠাৎ এই কথা বলিয়া উঠা ছাড়া, আমার মনেই পড়ে না যে, তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষা প্রস্তাবের ঐহিক দিকটীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি ইহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, কোন শিক্ষা বাস্তবিক তন্নামের উপযুক্ত কি না, তাহা উহার গভীরতা ও কঠোরতা দ্বারা নিরূপিত হইবে। তিনি সে মিথ্যা আদর্শকল্পনায় বিশ্বাস করিতেন না, যাহাতে স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্পতর জ্ঞান বা নিম্নতর সত্যলাভই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

কিরূপ গৃহোচিত স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলে স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যটী খুব উন্নতিশীল অথচ সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে পরিচালিত হইতে পারে—এই সমস্যা তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন

পুরাতন পদ্ধতির নিয়মগুলিকে এমন আকারে প্রকাশ করিতে হইবে, যেন তাহারা বরাবর আধুনিক ভাবাপন্ন লোকদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে।

সামাজিক স্থায়িত্ব ও একতার উপর বিদেশী ভাবসমূহের প্রভাব কিরূপ হইবে, তাহা বিচার না করিয়াই চট্ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করায় যে সকল নৈতিক ও নীতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় কুফল প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষের সামনে ছিল। তিনি স্বাভাবিক সংস্কারবশে জানিতেন যে, যে সকল বন্ধন দ্বারা প্রাচীন সমাজ একতাবদ্ধ ছিল, সেগুলি আধুনিক শিক্ষার আলোকে নূতন করিয়া প্রমাণিত ও পবিত্রতর বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া চাই, নতুবা সে শিক্ষা শুধু ভারতের অধঃপতনেরই সূচনা মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এই পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় যে সহজ ব্যাপার, এ কথা তিনি কদাপি ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই। কিরূপে আধুনিক ভাবগুলিকে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারা যায় এবং প্রাচীন ভাবগুলিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই কঠিন সমস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় ও চিন্তা অধিকার করিত। তিনি ঠিকই দেখিয়াছিলেন যে, যখন এই দুইটীকে জোড়া দিয়া এক করা যাইবে, তখনই জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

কিরূপে হিন্দুজীবনের প্রচলিত ঋণগুলিকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, আধুনিক যুগের দেশ ও ইতিহাসের প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ক সমগ্র ধারণাটীকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঐ পঞ্চ যজ্ঞের* ব্যাপারটী লইয়াই কত কি করা যাইতে পারে। উহাদিগকে কি বড় বড় কাজেই পরিণত করা যাইতে পারে!"

* ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

হোমো দৈবো, বলির্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"—মনু।

বিষয়টীর এইরূপ নূতন অর্থ হঠাৎ তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু উহা মন হইতে চলিয়া যায় নাই। তিনি ভাবটীর সূত্র ধরিয়া ক্রমশঃ খুঁটিনাটী ব্যাপারের অবতারণা করিলেন।

"[পিতৃযজ্ঞ], ঐ প্রাচীনকালের পিতৃ-উপাসনা হইতে তোমরা বীরপূজার সৃষ্টি করিতে পার।

"[দেবযজ্ঞ], দেবপূজায় অবশ্য প্রতিমাদির ব্যবহার চাই। কিন্তু তোমরা ঐগুলি বদলাইয়া লইতে পার। মা কালীকে সর্ব্বদাই এক-ভাবে দণ্ডায়মান রাখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ছাত্রীগণকে নূতন নূতন ভাবে মা কালীকে কল্পনা করিবার উৎসাহ দিবে। মা সরস্বতীকে একশত বিভিন্নভাবে ধারণা কর। মেয়েরা নিজের নিজের ভাবগুলি অনুযায়ী মূর্ত্তি গঠন করুক এবং চিত্রাঙ্কণ করুক।

"পূজার ঘরে বেদীর সর্ব্বনিম্ন ধাপে সর্ব্বদা একটী জলপূর্ণ কুম্ভ থাকিবে, এবং তামিলদেশের মত বড় বড় ঘৃতপ্রদীপ সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিবে। এই সঙ্গে যদি দিবারাত্র ভজনপূজাদির বন্দোবস্ত করিতে পার, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা হিন্দুভাবানুকূল আর কি হইতে পারে?

"কিন্তু যে সকল পূজাঙ্গের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহারা যেন বৈদিক হয়। বৈদিকযুগের মত একটী বেদী থাকিবে, তাহাতে পূজাকালে বৈদিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। আর ছোট ছোট মেয়েদেরও উহাতে উপস্থিত থাকিয়া আহুতি দিতে দিবে। এই অনুষ্ঠানটী সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

"[ভূতযজ্ঞ], নানা রকম জন্তু রাখিবে। গাভী হইতে আরম্ভ করিলে মন্দ হইবে না। কিন্তু অন্যান্য জানোয়ারও—কুকুর, বিড়াল, পাখী প্রভৃতি রাখিবে। ছোট ছোট মেয়েদের উহাদিগকে খাওয়াইবার ও যত্ন লইবার একটা সময় করিয়া দিবে।

"[ব্রহ্মযজ্ঞ] অর্থাৎ বিদ্যা-যজ্ঞ। এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ভারতে প্রত্যেক গ্রন্থই পবিত্র—একথা জান কি? শুধু বেদ নয়, ইংরাজী, মুসলমানী সব গ্রন্থ। সব পবিত্র।

"পুরাতন কলাবিগ্যাসমূহের পুনরুদ্ধার কর। তোমার বালিকা-গণকে খোয়া ক্ষীর দিয়া নানারূপ ফলের আকার অনুকরণ করিতে শিখাও। তাহাদিগকে সূক্ষ্ম পারিপাট্যযুক্ত রন্ধন ও সেলাই শিখাও। তাহারা চিত্রাঙ্কন, ফটো তোলা, কাগজের নানারূপ নক্সা কাটা এবং সোণারুপার তারে লতা পাতা তৈয়ারী ও সূচীকার্য্য শিখুক। যাহাতে প্রত্যেকেই এমন কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করে, যদ্দ্বারা প্রয়োজন হইলে তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও।

"[নৃযজ্ঞ] নরসেবার কথা কদাপি বিস্মৃত হইও না! সেবার ভাব হইতে মানবমাত্রকে পূজা করার ভাব ভারতে বীজাকারে আছে, কিন্তু উহা কখনও যথেষ্ট পরিমাণ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। তোমার মেয়েরা উহাকে ফুটাইয়া তুলুক। উহাকে কাব্য ও ললিতকলার অঙ্গরূপে পরিণত কর। হাঁ, প্রত্যহ স্নানের পর এবং-আহারের পূর্ব্বে ভিক্ষুকদিগের চরণপূজা করিলে হৃদয় ও হস্তের এক-সঙ্গে অপূর্ব্ব কার্য্যপরিণতা শিক্ষালাভ হইবে। কোন কোন দিন উহাদিগের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট মেয়েদের—তোমার নিজেরই ছাত্রীগণের—পূজা করিতে পার। অথবা তোমরা অপরের শিশুসন্তান-দিগকে চাহিয়া আনিয়া তাহাদিগকে সেবাশুশ্রূষা করিতে ও খাওয়াইতে দাওয়াইতে পার। মাতাজী মহারাণী আমায় কি বলিয়াছিলেন জান?—'স্বামিজী! আমার কোন সহায় সম্বল নাই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীগণকে পূজা করিয়া থাকি; ইহারাই আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে!' দেখিলে, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে তিনি এই সকল কুমারীর ভিতর উমাকেই সেবা করিতেছেন। বিদ্যালয় আরম্ভ করিবার পক্ষে উহা একটী অতি চমৎকার ভাব।"

কিন্তু স্বামিজী এইরূপে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেও, ইহা সকল সময়েই সত্য ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই আদর্শটীকে ধরিবার প্রধান উপায়-

স্বরূপ হইত—উহা লোকের আন্তরিক চেষ্টা মাত্রকেই ঐ আদর্শের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া দিত। উহাই অতি স্থূলবুদ্ধির নিকটেও প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া দিত। আধুনিক ভাবাপন্ন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল অনুষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পুনরাচরিত হইয়াও উহারই প্রভাবে সহসা সমুজ্জ্বল ও মূল্যবান হইয়া উঠিত। এইরূপে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে সকল বীরহৃদয় মনীষী জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি জনৈক ভারতীয় মহাবৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা দেখিয়া মনে হইল, উহা যেন প্রাচীনকালের আচার্য্যকুল-বন্দনারই আধুনিক রূপান্তর মাত্র। যে জাতি ব্রহ্মজ্ঞানকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, সে জাতির পক্ষে জ্ঞানের বাহ্যপ্রয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চ্চা একটী অবশ্যম্ভাবী মহত্ত্ব বলিয়াই মনে হইল। নাম যশ ও ধনের প্রতি মনে প্রাণে অনাসক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কর্ম্মী পৌর ও গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও ধর্ম্মের দিক হইতে তিনি সন্ন্যাসীই।

তাঁহার নিজ জীবনের এই যে গুণটীর প্রভাবে আর যাহা কিছু মহৎ ও বীরোচিত, সমস্তই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আদর্শ বিশেষেরই পরিচায়ক বা এক একটী বিশেষ উদাহরণরূপে পরিগণিত হইত, তৎসম্বন্ধে অবশ্য স্বামিজী কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি মনে হয়, ইহাতেই তাঁহার সকল জিনিষকে ধরিবার বুঝিবার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ইঙ্গিতগুলির সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, শিক্ষাব্যাপারে উহাদিগের সত্যতা দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই বিস্মিত হইয়া থাকি। উহার কারণ আমি কিছুতেই নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। যদিও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহাকে দুঃখদারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং সেই সময়ে তিনি হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের Education (শিক্ষা) নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত বিষয়ে আরও জানিতে ইচ্ছুক

হইয়া তিনি তৎসঙ্গে পেষ্টালট্‌সি* (Pestalozzi) রচিত যতগুলি পুস্তক পাইয়াছিলেন, সে গুলিকেও পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—যদিও উহা লেখা পড়ার ভিতর ছিল না। এই ঘটনাটীও আমার নিকট তাহার শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ গভীর জ্ঞানের যথেষ্ট কারণ বুলিয়া মনে হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ মনের ক্রিয়াকলাপকে তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে এত নিপুণ, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পান যে, তাঁহারা শিক্ষাসংক্রান্ত মতামতের আলোচনা ব্যাপারেও অন্য জাতি অপেক্ষা বিস্তর সুবিধা পাইয়া থাকেন। ইহাও ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চিন্তা করার রহস্যটীও তাঁহারা কোন না কোনও দিন আয়ত্ত করিয়া ফেলিবেন। ইতিমধ্যে, ঐরূপ বিশেষ স্থানীয় আদর্শ অবস্থাটী লাভের প্রথম সোপান—প্রচলিত মতামতগুলি হইতেই কি বিপুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাই বুঝা। স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনার বিস্তার ও পূর্ণতা সম্পাদন করার ভার ভারতীয় শিক্ষাচার্য্যগণের উপর রহিয়াছে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে, যখন আমরা তাঁহার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহার ভাবী বংশধরগণের প্রতি সাহস ও আশাবাণী এবং তাঁহার জ্ঞানমাত্রেরই পবিত্রতার নিকট মস্তক নত করা—এই সকলকে একযোগে গ্রহণ করিতে পারিব, তখনই ভারতীয় নারীকুলের জগতের সকল নারীর মধ্যে নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দিন সমাগতপ্রায় বুঝিতে হইবে।

---

* পেষ্টালট্‌সি জীবনের কতক অংশ শিক্ষাসম্বন্ধী সমস্যাসমূহ লইয়া অতিবাহিত করেন, এবং ঐ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। ইনি ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইজর্লাণ্ডের জুরিচ্ (Zurich) সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

শঙ্কর-দর্শন।

পূর্ব্বাভাষ।

(শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ)

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে তিনি কবে কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক; কারণ কাহারও কোনও মতবিষয়ে কিছু বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বের ও তাঁহার সময়ের সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি ভাল করিয়া অবগত হওয়া চাই। কিন্তু তাহা আমি এ প্রস্তাবে আলোচনা করিব না, কিন্তু তিনি কি ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জানিবার চেষ্টামাত্র করিব। নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশনে আমি শঙ্করের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে শঙ্করের যাহা শঙ্করত্ব, তাঁহার ধর্ম্মমত, তাঁহার দার্শনিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিছু আভাষ দিবার প্রয়াস পাইব। পঞ্চদশী, উপদেশসহস্রী, অদ্বৈতসিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, চিৎসুখী এবং শঙ্করের ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াই শঙ্করদর্শনের আলোচনার সূচনা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ শঙ্করের পরবর্ত্তী কালের এতই ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ যে, সেইগুলি দিয়া শঙ্করের মৌলিকভাবের পরিচয় পাওয়া সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ এবং বেদান্ত-সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ভিত্তি ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন দার্শনিক বিশেষ ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক হইবেন, তাঁহাকেই ভিত্তিস্থানীয় এই গ্রন্থগুলির উপর ভাষ্য লিখিতে হইবে। সেইগুলিকে দর্শনের সহিত এইরূপভাবে সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে পরস্পরবিরুদ্ধ মত আসিয়া না পড়ে। শঙ্কর, বল্লভ,

রামানুজ, মধ্ব এবং প্রায় সকল ধর্মপ্রচারকই এইরূপ করিয়াছেন। যেমন সংস্কৃতের স্থান প্রাকৃত অধিকার করিলেও, সংস্কৃতের ভাব পরিবর্তিত হয় নাই, সেইরূপ কতকগুলি ধর্মব্যাখ্যাতা এই সমস্ত গুরু-উপদেশকদিগের স্থান অধিকার করিয়া নূতন নামে পুরাতন ধর্মই উপদেশ করিয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যদি শঙ্করকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে হয় তাহা হইলে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যসাহায্যেই বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান নামে অভিহিত। ইহাতে বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণাদির মীমাংসার পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যভাণ্ডারের সহিত সূত্রগুলির কি সম্বন্ধ ইহা প্রথমে না বুঝিয়া আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত ভারতীয় সমাজ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বেদপদবাচ্য। বেদের প্রকৃতি-পূজা অনুসন্ধিৎসু-মানব-মনের অভাব-মোচন-বিষয়ে যথেষ্ট নয়। এমন কি বৈদিকযুগে পুরুষসূক্তের ন্যায় মন্ত্রগুলি সত্যরূপ প্রত্যূষের শুভাগমন ঘোষিত করিতেছে। সত্য যেন স্ফুটনোন্মুখ হইয়া কোলাহল করিতেছে। এই সময়ে যে ভাব উদ্বুদ্ধ হইল তাহা বেদের অন্তে উপনিষদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধভাবে ইহাতে সম্প্রবিষ্ট হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণসমূহ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জগৎসৃষ্টির বহির্ভূত জগদাত্মার জন্য ব্যাকুলতা নিয়মিত পূজা পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে।

তার পর এমন একটী যুগ আসিল যখন আয়াস স্বীকার করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া কেহ কিছু করিতে চাহিত না। এই সহজপ্রণালীর যুগে আবশ্যক বস্তু যোগাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমূহে তখন আর চলিল না—লোকে হাতে তোলা নজিরের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া একেবারে তৈয়ারী 'সূত্রের' সন্ধান পাইল। ঠিক এই সময়ে উপনিষৎসমূহও তুল্যরূপ সাহায্য পাইয়াছিল। এত দিনে জ্ঞানিগণ

জীবনসমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হইয়া ক্রমশঃ দর্শনসমূহ গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে মীমাংসাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মকাণ্ড যে মীমাংসার আলোচ্য তাহার নাম পূর্ব্বমীমাংসা—সমস্ত জ্ঞানের চরম লক্ষ্য যে মীমাংসার আলোচ্য বিষয় তাহা উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত। এই উভয় মীমাংসায় জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষৎসমূহই ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশে ধর্ম্ম বলিলে শুধু পরমার্থতত্ত্ব বুঝায় না—দর্শন এবং নীতিও তাহার আলোচনার বিষয়ীভূত। সাধারণ লোকের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মনের অন্তস্তম প্রদেশে আলোকজ্যোতিঃ সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়াই তাহাদের জন্য স্মৃতি ও পুরাণরূপ স্বচ্ছ নয়নমণির আবশ্যক হইয়াছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা স্থির করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ন্যূনাধিক ২৯০ খানা গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও উপনিষদ্-ভাষ্যকার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বলিয়া জনসাধারণের সংস্কার। সকলগুলিই যে তাঁহার রচিত নয়, তাহা অনেক গ্রন্থের ভাষা, শব্দ-বিন্যাস ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিয়া স্বরচিত গ্রন্থের বা কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন কোন দার্শনিক ও কবি শঙ্করাচার্য্যের নামে স্ব স্ব গ্রন্থ চালাইয়া যাইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা ব্যতীত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মঠাধিকারী মহান্তগণও শঙ্করাচার্য্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলিও শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন শঙ্করনামা কয়েক জন আচার্য্য, নৃপতি ও পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা একাধিক শঙ্করাচার্য্যের রচিত অনেক-গুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। কয়েকখানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা ও বেদান্তভাষ্য, সনৎসুজাতীয় ভাষ্য, সহস্রনামাধ্যায় ও কেবলাদ্বৈত-বেদান্তবিষয়ক

গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই জগদ্‌গুরু রচনা করেন নাই বলিয়া মাধবাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌ভাষ্যও সম্ভবতঃ তাঁহার রচিত নয়, কেন না, তাঁহার বহুপরের বার্ত্তিকগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বাক্য ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করানন্দনামক একব্যক্তি কৌষিতকী প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। ইঁহার ভাষ্যের রচনা-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌ভাষ্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। শঙ্করানন্দ ইহার লেখক হইলেও হইতে পারেন। উপদেশসহস্রী ও দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক শঙ্করের রচিত বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস; কিন্তু এগুলিও শঙ্করের মতের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহার রচনা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। অপরোক্ষানুভূতি, আত্মানাত্মবিবেক, বিবেকচূড়ামণি এবং আত্মবোধ প্রভৃতি কখনও জগদ্‌গুরুর লিখিত নয়। কেন না, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ও উপনিষদ্‌ভাষ্য-নিবদ্ধ শঙ্করের দার্শনিক মতের সহিত এগুলির ঐক্য নাই, শঙ্করের নামে প্রচলিত উপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তগ্রন্থের মধ্যে কতকগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।

স্বরচিত ভাষ্যেই জগদ্‌গুরুর মত সম্পূর্ণ দ্যোতিত হইয়াছে। গীতা, উপনিষদ্‌ বা বেদান্তভাষ্যের মধ্যে কোন একখানির আলোচনা করিলে তাঁহার মত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। বেদান্তশাস্ত্র ৫৫৬টী সূত্রে গ্রথিত। পরমারাধ্য ভগবান্‌ বাদরায়ণাচার্য্য ঋষি ইহার কর্ত্তা। জগদ্‌গুরু ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে মহাভারত-কারকে বুঝাইতে সর্ব্বত্র ব্যাসের নাম করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত-প্রসঙ্গে কেবল বাদরায়ণ নাম ভিন্ন কোথাও ব্যাসের উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি। "বৈয়াসকী ব্রহ্ম-মীমাংসা" এই প্রসিদ্ধ উক্তি হইতে ব্যাস বেদান্তকর্ত্তা বলিয়া সূচিত হইতেছে। বেদান্তদর্শনের সূত্রগুলি অতি কূটার্থময়, ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত বোধগম্য হয় না।

শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতার

নাম লইয়া অনেক গোলমাল। ব্যাসের রচিত বলিয়া এতগুলি গ্রন্থ আছে যে, কোন্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রকার তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। ভাগবতে বেদব্যাস নামে পরিচিত ব্যাসই যদি ব্রহ্মসূত্রকার হন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই পরাশরপুত্র বাদরায়ণ। ব্রহ্মসূত্রে অন্ততঃ সাতবার বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত আছে। ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ব্যাস বা বেদব্যাসের নামে কয়েকটী মতের অবতারণা করিয়াছেন। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্বদা আচার্য্য বলিয়াই দর্শনকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত উল্লেখের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, সূত্রকার ব্যাস ভাগবতের বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন। সূত্রকার যে নিজেই নিজের নাম সূত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত বা সন্দিগ্ধ হইবার কোনও কারণ নাই। অনেকের মতের সহিত যেখানে ঋষিগণের মতের অনৈক্য সেইখানে অথবা যেখানে তাহাদের প্রিয়মত প্রচার করিবার দরকার সেইখানে তাঁহারা নিজ নাম দিয়া থাকেন। ইহাই প্রাচীন প্রথা। আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্রে এইরূপ কতকগুলি ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর যে সূত্রকারকে আচার্য্য অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, কেন না তিনি অন্ততঃ দুইটী স্থানে বলিয়াছেন যে আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যতীত আর কেহই নন। সূত্রকার যে বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কোন কোন পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান-কালে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই এই দর্শনের প্রাচীনতম ভাষ্য বলিয়া প্রখ্যাত। ইঁহার ভাষ্য সর্ব্বত্র সূত্রানুযায়ী।

শঙ্কর তাঁহার উক্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য অনেক সময় নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'ইতি শ্রূয়তে, বা স্মর্য্যতে'; শাস্ত্রের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার উক্তির প্রামাণ্যস্বরূপ তিনি কোন্ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতেন,

তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাবলী একত্র করিলে বুঝা যাইবে, তিনি কোন্ শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকন্তু, এই বচনগুলির সাহায্যে সহজেই তাঁহার লিখিত গ্রন্থ-নিচয়ও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য্য এই ভাষ্যে পুনরুক্তি-সমেত ২,৫২৩টী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২,০৬০টী ঔপনিষদিক বচন, ১৫০টী বৈদিক এবং ৩১৩টী বেদেতর গ্রন্থোদ্ধৃত বচন। শঙ্করাচার্য্য মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় বচনের অধুনা প্রচলিত বচন হইতে বিভিন্ন পাঠও দিয়াছেন। পাঠের একটু ইতরবিশেষ করিলে বচনগুলি একাধিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে ঐ শাস্ত্রীয় বচন যে কোন গ্রন্থের, তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

শঙ্কর লিখিতেছেন—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুবরদৎ, তদ্ভেষজম্ "(তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২), অথচ কাঠকে আছে—"মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চ অবদৎ, তদ্ভিষজমাসীৎ।" মৈত্রেযানী সংহিতায় আছে—"আপো বৈ শ্রদ্ধঃ।" অথচ শঙ্কর দিতেছেন—"শ্রদ্ধা বা আপঃ"। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৬।৮।১)। শতপথ ব্রাহ্মণ—"তরতি সর্ব্বম্ পাপ্মানম্।"(১৩।৩।১।১)। শঙ্কর—"সর্ব্বম্ পাপ্মানম্ তরতি।" (তৈঃ সং ৫।৩।১২।১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—"সপ্ত বৈ শীর্ষং প্রাণাঃ।" (৩৩।১) বা পঞ্চ-ব্রাহ্মণ—"সপ্ত শিরসি প্রাণাঃ।" (২২।৪।৩), শঙ্কর—"সপ্ত বৈ শির্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চান্।" (তৈঃ সং ৫।৩।২।৫) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ বিভিন্ন পাঠের বচনগুলির আকরস্থান বিভিন্ন শাখা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শঙ্কর মাঝে মাঝে অন্যান্য শাখা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই তৈত্তিরীয় শাখা হইতেই বচন দিয়াছেন।

এইবার আমরা শঙ্করদর্শনের যাহা মূলভিত্তি তাহারই একটু আভাষ দিব।

বেদান্তসূত্রভাষ্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য এক "অধ্যাসভাষ্য" লিখিয়া অদ্বৈতমতের মূল ভিত্তি কি তাহা প্রদর্শন

করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয় গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মাৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ।"

আমরা যখন "আমার দেহ", "আমার মন", "আমার হস্ত," প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার করি, তখন আমাদের দেহ, মন ও হস্ত প্রভৃতির অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র "আমি" পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেন না, যদি "আমি" এবং দেহ, মন এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনদেহাদির সহিত সম্বন্ধসূচক "আমার" পদ ব্যবহৃত হইতে পারিত না। এই "আমি"ই দর্শনশাস্ত্রের "চিদাত্মা" এবং দেহ, মন ইত্যাদি "আমি" ভিন্ন অনাত্ম পদার্থ। শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে "উপাধি" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই আমি বা আত্মা 'বিষয়ী' বা "অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য" এবং তদতিরিক্ত যাহা কিছু সমস্তই "বিষয়" বা "যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য"। তমঃ ও প্রকাশ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, সেইরূপ অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ী ও যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ও পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যেমন যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নয়, সেইরূপ যাহা বিষয়ী তাহা বিষয় নয়। আর যদি স্বীকার করা যায়, বিষয়ীর ভাব বিষয়ের ভাবের বিরোধী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিষয়ীর ধর্ম্মও বিষয়ে বিদ্যমান নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিদাত্মক অস্মদাখ্য বিষয়ীতে যুষ্মদাখ্য বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও, লোকব্যবহারে "মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত" সচরাচর সত্য যে বিষয়ী তাহার সহিত মিথ্যা যে বিষয় তাহার মিথুনীকরণ হইয়া থাকে; ইহা 'নৈসর্গিক'। কাজেই বিষয় ও বিষয়ী 'অত্যন্ত-বিবিক্ত' হইলেও বিষয় ও বিষয়ীকে পৃথক্ না করিয়া লোকব্যবহারে একের ভাব ও ধর্ম্ম অন্যে সহজেই আরোপিত হইয়া

থাকে। সেই জন্যই আমরা "অহমিদং", "মমেদং"—'এই আমি' 'ইহা আমার' এইরূপ বলিয়া থাকি। কখন কখন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, কখন বা দৃষ্টিদোষে একমাত্র চন্দ্রকে দুইটী চন্দ্র দেখা যায়—এইরূপ একবস্তুতে অন্যবস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। এই আরোপের নাম অধ্যাস। বস্তুনিচয়ের এই ভ্রান্তিমান আরোপ এবং চিদাত্মার সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধ অসম্ভব নয়; কেন না, আত্মাও এক হিসাবে বিষয় অর্থাৎ অস্মৎপদবাচ্য বিষয়। এইস্থানে শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, আত্মা অপরোক্ষ বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত বিষয় নয়। তিনি নিজ ভাষ্যে ইহা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—অবিষয় যে প্রত্যগাত্মা তাহাতে বিষয়ধর্ম্মের কিরূপে অধ্যাস হইতে পারে? সকলেই যখন পুরোঽবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তর অধ্যাসিত করিয়া থাকে, তখন আপনি যে প্রত্যগাত্মার কথা বলিতেছেন, তাহা যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহা অবিষয়।

উত্তর—ইহা নিতান্ত অবিষয়ও নয়। কেন না, ইহা অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়। ভাল করিয়া বুঝিলে দেখিবে, ইহা "সাক্ষী" নয়, ইহা কেবল 'কর্ত্তা', অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মা বিষয়ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া অহংপ্রত্যয়বিষয় হইয়াছে। প্রত্যগাত্মা যে অপরোক্ষ নয় ইহা দ্বারাই প্রত্যগাত্মার সম্যক্ অর্থ প্রতিভাত হইতেছে। আর যে বিষয়ে বিষয়ান্তর আরোপিত হইবে, তাহা যে আমাদের পুরোভাগে থাকিবেই, এরূপও নয়; যেমন মূর্খলোকেরা আকাশে পৃথিবীর বর্ণ আরোপ করিয়া থাকে। এই প্রকারেই আত্মায় অনাত্মার এবং অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে।

আমরা এই অধ্যাসবশতঃ নানারূপ দুঃখভোগ করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা এই অধ্যাসকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। যতদিন অবিদ্যাপাশ ছিন্ন না হয় ততদিন দুঃখের শেষ হয় না। মানুষ অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে "মুক্তি" পাইয়া থাকে। অবিদ্যাই যত অনর্থের মূল। বিচার ও শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় দ্বারা অবিদ্যার বারণের

জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ইহাই শঙ্করদর্শনের মূলভিত্তি। ইহাই অবলম্বন করিয়া শঙ্কর নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে শঙ্করের মত স্থাপিত হইতে পারে না।

এই অধ্যাসতত্ত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া শঙ্কর যে মতটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা এই—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥
"ন নিরোধো নচোৎপত্তিঃ ন বদ্ধোন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

বৈতথ্যপ্রকরণ—২।৩২

যাহা সত্য তাহা ব্রহ্মই, জগৎ সত্য নহে পরন্তু ইহা মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই, জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত আদৌ নহে। সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ যাহা কিছু সকলই ব্যবহারিক পদার্থ, সাধক সিদ্ধ যাহা কিছু সকলই মায়ার খেলা। কিন্তু তথাপি এই বন্ধের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, মুক্তির সুখময় স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যে উপায় আচার্য্যের অভিমত তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কারণ, জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া আচার্য্য যেমন একটী বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এই উপায় সম্বন্ধেও তিনি একটী বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আচার্য্যের এই সকল সিদ্ধান্তই অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ, এই সকল বিষয়ে আচার্য্যমতের সহিত ভারতীয় অপর দার্শনিকগণ একমত নহেন। আর অপরাপর দার্শনিকগণ জীব বহু ও বিভু বলেন, আচার্য্য কিন্তু জীবকে এক ও অনন্ত বলেন। জগৎ অপরের মতে কূটস্থ নিত্য না হইলেও প্রবাহ-রূপে নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, আচার্য্যমতে জগৎ মিথ্যা—ইহার কোনরূপ নিত্যতা নাই। মুক্তির উপায় আচার্য্যমতে অদ্বৈতাত্মজ্ঞান, অপরের মতে পদার্থজ্ঞান অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম, কিংবা কেবলই কর্ম্ম, অথবা জ্ঞান ও ভক্তি বা উপাসনা উভয়ই। কর্ম্ম এই জ্ঞানোৎপত্তিতে

চিত্তশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া উপায় হয় অর্থাৎ মুক্তির প্রতি পরম্পরায় কারণ হয়, সাক্ষাৎ কারণ হয় না। আর সেই জন্য কর্ম্ম ও উপাসনা শঙ্করের মতে যেমন একমাত্র অবলম্বনীয় নহে, তদ্রূপ একেবারেও উপেক্ষনীয় নহে। কর্ম্ম ও উপাসনা চিত্তের মল অপনয়ন করিয়া তাহাকে একাগ্র করিয়া তুলে মাত্র, মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তির জন্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। ভক্তিপথ শঙ্করমতে উপাসনারই পথ। ভক্ত ও উপাসক একই কথা। অপরাপর দার্শনিকগণ জগতাদির মূলকারণ প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করেন; আচার্য্য শঙ্কর সেই মূলকারণ উক্ত অধ্যাস বা অজ্ঞানকেই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং মুক্ত হইলে অজ্ঞান নাশে মুক্তের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন জগতাদি কিছুই থাকে না, অপরাপর দার্শনিকের মতে কিছু না কিছু থাকে। শঙ্করের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। অপরের মতে তাহা সবিশেষ সোপাধিক ত বটেই, তবে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষয়, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ কি না তদ্বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। ইহাই শঙ্কর মতের এক কথায় সার সংক্ষেপ।

এইবার আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, ধর্ম্মোপদেশকরূপে শঙ্করের স্থান কোথায়। বৈদিক ধর্ম্ম বস্তুতঃ কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে দণ্ড ও পুরস্কারের দর্শনই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই বেদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন দার্শনিক ঋষি চরমপন্থা ও অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দর্শনগুলির উৎপত্তি এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি হইতে সঞ্জাত। কোন দর্শনে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা বলা হয় নাই। তবে উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছে যে, সমস্ত সুখ ও আনন্দ জ্ঞানে, কর্ম্মে নয়। তবুও কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড একেবারে বিনষ্ট হইল না। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাতে তিনি নির্ব্বাণ শিক্ষা দিলেন। এই নির্ব্বাণমতই কর্ম্মকাণ্ডকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। কুমারিল

কর্ম্মকাণ্ড পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই ধর্ম্মবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের যে সহায়, তাহাই প্রদর্শন করিলেন। তিনি উপনিষদ্‌কেই মূলমন্ত্র করিলেন, উপনিষদ্‌কে সর্ব্বসমক্ষে ধরিলেন—এ দিকে আবার বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইলেন। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে সম্ভবতঃ বুদ্ধবাণী অগ্রসর হইতে পারে নাই। শঙ্করের উপদেশ তথায় কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, কাজেই সেখানে কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে—সেখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ও শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া এখনও প্রচার করিয়া থাকে।

শঙ্করের দর্শন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, শঙ্কর-দর্শন বুঝিতে হইলে ভারতের সমগ্র দর্শন সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

ন্যায়মতাবলম্বিগণ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয় প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐগুলির সাহায্যে প্রণিধানবলে পরম বস্তু লাভ করা যাইবে। মনুষ্যের মন ও আত্ম-সম্বলিত এই জড়-জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা জীব হইতে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৈশেষিক-গণও এই মত গ্রহণ করিয়া পদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারাও ঈশ্বর স্বীকার করিলেন, কিন্তু পদার্থের স্বাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য নির্ণয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের মতে পদার্থ পরমাণু দিয়া সৃষ্ট—কিন্তু ঈশ্বর-দ্বারা পরিচালিত। গৌতম এই প্রকারে আদি কারণতত্ত্ব এবং কণাদ বিজ্ঞানতত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন। এই শাস্ত্রদ্বয় ন্যায়শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক positive side of abstract generalisation (অস্তি) লইয়া ব্যস্ত। চার্ব্বাক negative side(নাস্তি) লইলেন ; কিন্তু চার্ব্বাকের মত কেহই গ্রহণ করিল না। চার্ব্বাকের পর সাংখ্যদর্শনের আবির্ভাব হয়। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া

আলোচনা করেন ; প্রকৃতিই সাংখ্যের মতে সৃষ্টির মূল কারণ, তবে এই প্রকৃতি পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। সাংখ্য পুরুষের প্রতি কোন কর্ম্ম আরোপ করে নাই, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। সাংখ্যবাদী বিশ্বাস করেন যে, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়া যায়—সাংখ্য-বাদী প্রকৃতির উপর যাইতে পারে না। সাংখ্যমত-প্রচারক কপিল-মুনি নিরীশ্বর বাদ প্রচার করিলেন। পতঞ্জলি মুনি সাংখ্যমতের নিরীশ্বরতা মোচন করিয়া যোগদর্শন প্রচার করেন, তাহাতে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা আছে। মনুষ্য কি করিয়া প্রকৃতির উপরেও উঠিতে পারে তাহারও উপায়সমূহ ইহাতে কথিত আছে। তাহার পর বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন—ইহাই বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্কর এই ব্রহ্মসূত্রগুলির ভাষ্য করিয়াছেন। শঙ্করের দর্শন তাঁহার যুগের ক্রমবিকাশ দ্যোতিত করিতেছে। শঙ্করের মতে জগতের ক্রমবিকাশও স্বীকার্য্য, কিন্তু তজ্জন্য আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মময়—কিন্তু ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্ম জড়িত, কিন্তু ব্রহ্মের উপর প্রকৃতির প্রভাব নাই। সেই অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মের চিন্তনেই বিমল আনন্দ লাভ করা যায়। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই, অনাদি ও অচিন্তনীয়। প্রকৃতি ব্রহ্মের উপর নির্ভর করে এবং পরিবর্ত্তনীয়—কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয়। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে। উপনিষদ্ বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রসূত। শঙ্কর রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করেন ; যেহেতু রজ্জু সর্পের অনুরূপ। সেইরূপ প্রকৃতি ব্রহ্মের অনুরূপ। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্যাস বলে। ব্রহ্মের উপর নামরূপ প্রভৃতি আরোপ করা মায়ার কার্য্য।

আমাদের এই কথাগুলি আলোচনা করিলে শঙ্করের নিজের অবস্থা এবং তাঁহার দর্শনের ভিত্তি কি তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। শঙ্করের যুগে দর্শনের যে বিকাশ হইয়াছিল, সেই বিকাশের যুগের তিনি

যথার্থই অবতার ছিলেন। তিনি সমস্ত দার্শনিক সমস্যা নিজে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক দার্শনিকদিগের অসুবিধার কারণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত জীবন ও দ্রব্যজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উপনিষৎসম্মত নয় এমন কি ন্যায়সঙ্গতও নয়। অধ্যাপক Tyndall যখন British Association এ সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "Two courses and only two are possible. Either let us open our doors to the conception of creative acts, or abandoning them, let us radically change our notions of matter," তখন তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ভূয়োদর্শী ঋষি যে সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছিলেন। মহাত্মা Tyndallএর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'The origination of life is a point lightly touched upon, if at all, by Mr, Darwin and Mr. Spencer.' বর্ত্তমান অবস্থা যখন এইরূপ তখন অতি প্রাচীন কালে কিরূপ হওয়া সম্ভব? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মানবশক্তির নিকট যাহা অসাধ্য, তাহা তিনি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টি ও জীবনসমস্যা কার্য্যতঃ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শঙ্কর সৃষ্টি ও জীবন সমস্যার বিশ্লেষণকল্পে কোন কার্য্যকরী পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে বরাবরই তর্ক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমাদের তাহা আলোচ্য নয়। আমরা ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বই গ্রহণ করিব। শঙ্কর নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করিলে জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কিছুই বুঝাইতে পারা যাইবে না; বরং উহাতে ইহাই বলা হইবে যে, মনুষ্য ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে বা জানিতে সমর্থ নয়। বর্ত্তমান যুগের Mill এর ন্যায় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাপের সত্তার সহিত বিশ্বাতীত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণপবিত্র ভগবানের সত্তার মিলন

করা যায় না। Hamilton বা Mansel এর ন্যায় তিনি জ্ঞানকে ধর্ম্মজগৎ হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই এবং Spencer এর এক Negative "Unknown"কে এই সৃষ্টির মূলকারণ বা কর্ত্তা বলেন নাই। জড় হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি—জড়বাদীদিগের এই মত খণ্ডন ও প্রতিবাদ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি Leibnitz এর monad বা নিরবয়ব জীবৎপদার্থকে তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। শঙ্করের মতে সম্বন্ধ বলিলে সম্বন্ধের অতীত বুঝায়, কেন্দ্র বলিলে পরিধি বুঝায়, বহিঃ বলিলে অন্তর বুঝায়, বহিঃস্তর বলিলে অন্তঃস্তর বুঝায়, অনন্তকে ভাবিতে গেলে তাঁহাকে সান্ত করিয়া ধারণা করিতে হয়। একমাত্র Hegel ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ অনন্তকে যে ভাবে ধারণা করিতে চান, তাহা অসম্ভব।

কেহ কেহ শঙ্করকে মায়াবাদী বলিয়া দোষারোপ করেন। শঙ্কর 'মায়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে মায়া শব্দের প্রয়োগ অতি বিরল। তিনি মায়াবাদ উপদেশ করিযাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বিবর্ত্তবাদের একটী শাখা (corollary)। তিনি মায়াবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষভাবে ইহার সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপই মায়া, আমাদের ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। ভারতীতীর্থ 'বিবর্ত্তবাদ' ব্যাখ্যায় এই একই কথা বলিয়াছেন। 'দৃগ্ দৃশ্যবিবেকে' (২০) তিনি বলিতেছেন—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

অর্থাৎ, অস্তি, ভাতি (জ্ঞান, প্রিয় (সুখ), রূপ ও নাম এই পাঁচটী গুণ—প্রথম তিনটী ব্রহ্ম, শেষ দুইটী জগৎ (মায়া)।

ছান্দোগ্যও এই একই উপদেশ দিয়াছেন—

"যথা হি সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—ইত্যাদি।

অর্থাৎ হে সৌম্য, একটী মৃৎপিণ্ডকে জানিলে মৃৎপিণ্ড হইতে নির্ম্মিত সমস্তই জানিতে পারা যায়, নামগুলি শাব্দবিকৃতি মাত্র— সত্য হইতেছে একমাত্র মৃত্তিকা।

ভগবদ্গীতার উপদেশও এইরূপ—

'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৩।১

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" ১৩।২

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ॥" ৩।৫ ২৫

শঙ্করাচার্য্যও "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে (২।১।১৪) বলিয়াছেন, "অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্য-লক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি যতস্তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্য-মাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎকারণং পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে॥" এখানে শঙ্কর অনেকটা বাহ্মমায়াবাদের সহিত নিজ মত প্রকাশ করিতেছেন ইহা সর্পরজ্জু দৃষ্টান্ত, মরীচিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'ব্যতিরেকেনাভাবঃ" এই শব্দ দ্বারা 'অনন্যত্বম্' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে ইহার সহিত বাচস্পতি মিশ্রের অনন্যত্ব শব্দের ব্যাখ্যাও স্মরণ রাখা উচিত। বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোনও ঐক্য নাই পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক— চিন্তা ও সত্তা অভেদ্য। ইহাই বিবর্ত্তবাদের প্রকৃত অর্থ। গোবিন্দা-নন্দের মতে ইহা শঙ্করের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনন্যত্বের এই প্রকৃত অর্থ জানিয়া বুঝিতে হইবে যে, মায়া কেবল নাম ও রূপের মধ্যেই আবদ্ধ। 'জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ' এই বিপরীত মত গোবিন্দানন্দ স্পষ্টই প্রতিবাদ ও অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাই

পরিণামবাদ। মন হইতে দ্রব্যের পরিণতি হইয়াছে—ন্যায়ের এইরূপ প্রতিলোম রীতি ব্যতিরেকে পরিণামবাদ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বল্লভাচার্য্য এই জড়বাদ ও মায়াবাদ-মত উপেক্ষা করিয়া ইহাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা একটী ক্রমবিকাশ-বাদের ফল। রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের ন্যায় অপরেও মায়া ও ব্রহ্মকে পৃথক্ করেন এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মার এক অংশ বলিয়া মনে করেন। এক্ষণে আমাদের উক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শঙ্করের অপর একটী স্থলের উল্লেখ করিব। শঙ্কর অনন্যত্ব দ্বারা অভেদ ভিন্ন অপর কোন অর্থ যে করেন নাই তাহা সুস্পষ্ট, তবে তিনি জগতের কোন মূল উপাদান কারণে আস্থাবান্ ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই বিষয়টী যদি আমরা স্থির করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা দেখিব, মায়া অর্থে Illusionএর ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভবপর হইবে না। এইরূপে প্রকারান্তরে বিবর্ত্তবাদের মত আপনাকেই আপনি খণ্ডন করিবে। শঙ্করাচার্য্য "ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ" মতের উত্তরে বলেন যে, বাহ্য বিষয়ের অস্থায়িত্ব সপ্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ, কোন চিন্তা করিলেই, চিন্তার বিষয় কিছু থাকিবেই। তিনি বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে বলেন নাই। কেবল চিন্তা ও বস্তু যে অচ্ছেদ্য তাহাই বলিয়াছেন। কেহ যদি স্তম্ভের চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার মনে যে ঐরূপ প্রকৃতই একটা কিছু দৃষ্ট হয় তাহা নয়, তবে যাহা প্রকৃত তাহার অনুরূপ মাত্র চিন্তিত হয়। চিন্তিত বস্তুকে একেবারে কিছুই নয়, শূন্য বলিলে চলিবে না, কেন না তাহা হইলে কোনরূপ সংস্কার থাকে না।

জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য হেতু বিষয় নাশ হয় না। চিন্তা ও চিন্তিত বস্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের (subject ও object) সম্বন্ধ বিদ্যমান। শঙ্করের এই উক্তি দ্বারা অনন্যত্বের কিরূপ ব্যাখ্যা হয় তাহাই দেখা যাউক। শঙ্কর অনন্যত্ব বলিলে কোন চিন্তার বিষয় যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা-

কখনও মায়া ইহতে পারেন। ইহাকেই তিনি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। এইরূপেই মায়াও পুনরায় নাম ও রূপে পরিণত হইয়াছে, এমন কি, মায়াকে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিলে এবং স্বপ্নের আধারতত্ত্ব অবগত হইলে আমাদের ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নয়। যেমন সমস্ত স্বপ্ন (নাম ও রূপ) জাগরিত হইলেও ভ্রম বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের অবস্থায় মায়াকে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। এইরূপে শঙ্করাচার্য্য মায়া বা অবিদ্যা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাই জগতের কারণ। এইবার বিদ্যারণ্যের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মূলাধ্যাস বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মতস্মাৎ সমুত্থিতাঃ।
খং বায়ুবহ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ॥
আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে॥"

ব্রহ্ম হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীর উদয়। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম জগতের আদি এবং জগৎ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই পরস্পরের অধ্যাস বলে। এইখানেই ব্রহ্ম জড়-জগতের যে বিকাশ তাহার মূল কারণ হইতেছেন। ব্রহ্ম সমস্ত চিন্তার অতীত, কিন্তু জড় উহার ব্যতীত নয়। মায়া বা অজ্ঞানতা মধ্যস্থলে থাকিয়া কার্য্য করে এবং ইহাই জাগতিক বিকাশের অংশ। সুতরাং শঙ্করের দর্শন, চিন্তা ও সত্তার অচ্ছেদ্যসম্বন্ধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাই অদ্বৈতবাদের সারতত্ত্ব।

বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত যে মহাপুরুষকে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, বিংশ-শতাব্দীর চিন্তাশীল জগৎ সেই জগদ্‌গুরু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। য়ুরোপ ও আমেরিকায় কেহ কেহ তাঁহার উপদিষ্ট গ্রন্থাবলীর সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হইয়াছেন

সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ধারণা এই যে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মাত্র একজন পরমার্থবিদ্ (theologian) অথবা বড় জোর একজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক (dialectician) ছিলেন। ইহার অধিক তাঁহারা কিছু বলিতে রাজি নন। কারণ, আজ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দেশে যে সমস্ত প্রামাণিক দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Paul Deussen এর গ্রন্থ ব্যতীত কোথাও শঙ্করদর্শন অথবা যে সমস্ত মতবাদের সহিত শঙ্করের নাম সংযোজিত আছে তাহাদের ইঙ্গিত মাত্রও করা হয় নাই। এমন কি Encyclopædia Britannicaর ন্যায় প্রামাণিক কোষগ্রন্থেও শঙ্করের গ্রন্থসম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা দার্শনিক বিষয় (philosophy) বলিয়া উল্লিখিত না হইয়া পরমার্থতত্ত্ব (theology) বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। Dr Thibaut শঙ্করের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়াছেন। তিনি ইহার ভূমিকায় বেদান্তে নিহিত dogma বা তত্ত্বসমূহেরই আলোচনা করিয়াছেন। অধুনাতন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় দর্শন সমূহের আলোচনার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদিগকে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধায়ী হইয়া দার্শনিক ভাবে শঙ্করের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিতে হইবে। অধুনাতন বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ভারতীয় দার্শনিক-গণের মুখ্য উদ্দেশ্যের সন্ধান করিতে হইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় 'অদ্বৈতবাদ'কে ভ্রমক্রমে 'একেশ্বরবাদ' বলিয়া প্রায়ই নির্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এখনও অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তথ্য ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই।

প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের এবং প্রতীচ্যমতানুবর্ত্তীদিগের নিকট শঙ্কর পরমার্থবিদ্ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্রাভিমান বা হেতুন্যায়বাদী ছিলেন অথবা পরমার্থবিদ্ বা দার্শনিক ছিলেন এক্ষণে তাহাই আমাদের বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

পরমার্থবিদ্যা, ঈশ্বরজ্ঞান হিসাবে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁহার অস্তিত্ব,

তাঁহার জগৎ-সৃষ্টি, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তৎকর্ত্তৃক জগতে শোক, দুঃখ ও পাপের উদ্ভাবন সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। দর্শনের সহিত ঐক্য হয়, এরূপ খুব কমই ভাব ইহাতে আছে। এক-মাত্র সত্যনিরূপণই দর্শনের কার্য্য। দর্শন যুক্তি ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু পরমার্থবিদ্যা প্রতিপদে স্বতন্ত্রানু-যায়ী কিছু একটা ধরিয়া লইবেই, আর তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিবেই। ইহার পক্ষ সমর্থনকারী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সংখ্যাও অল্প নয়। ইঁহারা বলেন, বিচারের যখন সীমা আছে, তখন সকল চিন্তার চরমসীমায় উপনীত হইতে হইলে বিচারকে ফেলিয়া দিয়া কোন না কোন প্রকারের dogma বা ঋষিবাক্য ইত্যাদি শব্দ-প্রমাণের আশ্রয় লইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তির অসারতার কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহারা প্রকারান্তরে একই কথায় আসিয়া পড়িতেছেন। তাঁহারাও যুক্তির উপরই নির্ভর করেন। যুক্তিই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব—এই যুক্তি দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পরমার্থতত্ত্ব যে পরিমাণে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেই লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই পরিমাণে সত্যের দিকে ধাবিত হওয়া ইহার অভিপ্রেত নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচারকালে তাঁহারা তাহারই উপর নির্ভর করেন, যাহাকে তাঁহারা শ্রুতি, ঈশোন্মেষ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকেন। দার্শনিকগণ শাস্ত্রাদি তাদৃশ আলোচনা করুন আর নাই করুন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি অনুসারে বিচার করিতে হইবে; তাঁহারা 'শাস্ত্র' বলিয়া শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিবেন না। এই সমস্ত বিষয়ে পরমার্থতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পরবিরোধী হইলেও উভয়ের মধ্যে একটী সাধারণ বিষয় আছে। উভয়েই সত্যের অনুশীলনে তৎপর এবং উভয়েই জগৎ ও জীবনের প্রহেলিকা নির্ণয় করিতে উৎসুক। পরমার্থতত্ত্ব কতকগুলি সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া পরম সত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু দর্শন যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তাহা লইয়া আরম্ভ করে

এবং তাহা হইতেই বিচারে প্রবৃত্ত হয়। বলিতে গেলে, পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ শিশু—দার্শনিক বয়োবৃদ্ধ পুরুষ। প্রথমে শিশুকে শাস্ত্র-বাক্যের উপর নিভর করিতে হইবে, পরে তাহার বিচার করিবার শক্তি জন্মিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাক।

'মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ-কারিকা'র অদ্বৈতপ্রকরণে প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—

"অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যমাহোস্বিত্তর্কেণাপীত্যত আহ। শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্। তৎকথমিত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে।"

অর্থাৎ প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদ কেবল শ্রুতিবলেই প্রমাণিত হয় অথবা বিচারবুদ্ধি বা তর্কদ্বারা অবগত হওয়া যায়—এই অধ্যায়ে প্রমাণিত হইবে যে তর্কদ্বারা ইহা জানিতে পারা যায়।

পুনশ্চ—

জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইত্যুক্তম্। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তৎ। তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শক্যতেঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়প্রকরণমারভ্যতে।

বৈতথ্য প্রকরণ—১ম শ্লোক।

অর্থাৎ—দ্বৈতের অলীকত্ব শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত। যাহা হউক, ইহা শ্রুতিবাক্যদ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা সুপ্রমাণ করা যায়। এই জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এখন এ সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা যাইতে পারে যে, ইহা শঙ্করের অভীপ্সিত মত নয়। যদি তাহা হইত তাহা হইলে অন্যত্র তিনি অন্য মত প্রকাশ

করিতেন না। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, শঙ্কর বিশেষ-রূপে অবগত ছিলেন যে বৌদ্ধদিগের ন্যায় এমন একদল লোক সকল সময়েই জগতে থাকিবে যাহারা বেদের দোহাই মানিবে না। তাঁহাদের যুক্তি নিরসনের জন্যই শঙ্কর বেদের দোহাই না দিয়াই যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়াই বলিয়াছেন, "যাহা হউক এক্ষণে আমরা বেদান্তবাক্য-নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিব"—

"ইহতু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্‌যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে।"

শঙ্করভাষ্য—২য় অধ্যায়—১ম পাদ।

শঙ্কর জানিতেন যে, পৃথিবীতে সকল সময়েই বুদ্ধিহীন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। তাঁহাদিগের জন্য তিনি শ্রুতিবাদ সম্বন্ধে এত লিখিয়াছেন। শঙ্করের দ্বৈধভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ তাঁহার যুক্তিবাদ বুঝিতে পারেন নাই। Deussen এই ভুল করিয়াছেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কোন বিশেষ শাস্ত্র বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। সমগ্র শ্রুতি বাদ দিলেও তাহার মত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শঙ্করদর্শন কোন হিন্দু বা অহিন্দুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য লিখিত হয় নাই—ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী। যেমন জলবায়ু সকলেরই সমান উপভোগ্য—সেইরূপ তাঁহার মত সকলেই সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যদি কিছু সার্ব্বভৌমিক জগতে সম্ভবপর, তাহা হইলে তাহা এই শঙ্করমতেই সম্ভব। *

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাধারণ সভায় পঠিত।

বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্ব্বাণতত্ত্ব।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে, বৌদ্ধশাস্ত্রোল্লিখিত নির্ব্বাণ আর বেদান্তশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ এই দুইটি পৃথক পৃথক জিনিষ - ইহাদের মধ্যে একরূপতার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ; কিন্তু, আমাদিগের মতে এইরূপ ধারণা অতীব ভ্রমাত্মক এবং আমাদের এই মতও এই দুই দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনার প্রশস্ত ভিত্তির উপরই স্থাপিত, সুতরাং ইহা আমা-দিগের মনের কল্পনা অথবা স্বপ্নমাত্রপ্রসূত নহে। আসল কথা এই যে, এই উভয় দর্শনের প্রকৃত রহস্যের প্রতি অনবধানই সাধারণের মনে এই অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। অতঃপর বেদান্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রীয় পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ বচন ও প্রমাণাদি দ্বারা আমরা এই ভ্রম দূরীকরণের জন্য প্রস্তুত হইব। আরও একটি দ্রষ্টব্য এই যে অনেকেরই মতে বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, এমন কি অনেক আচার্য্যকল্প ব্যক্তিগণও ইহাই বলিয়া থাকেন। অবশ্য যদি ঈশ্বর বলিতে কোনও একজন পৃথক্ ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়, যিনি ইহলোক হইতে প্রকৃষ্টতম দূরবর্ত্তী স্থানে সিংহাসনের উপর আসীন হইয়া জীবনিবহের দণ্ডবিধাতারূপে তাহাদের পূজার্চ্চনাদি পাইয়া থাকেন, তিনি মানবের কেবল শাসক এবং তাহার সহিত অন্য সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব যে সত্য সত্যই বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী। ইহাদের দর্শনে এই-রূপ ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যুত খণ্ডনই আছে, কিন্তু যদি তাহা না হইয়া সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে অনুস্যূত, পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল ও আকাশের প্রত্যেকের একমাত্র আশ্রয়, জীব-মাত্রের প্রত্যেকের হৃদ্গত—সেই বিরাট অন্তর্যামী পুরুষকেই যথার্থ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে দেখিবে যে বুদ্ধকায়, ধর্ম্মকায় ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত সেই পরমেশ্বরই বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত ও

তিনিই বৌদ্ধসাধকগণের নিকট চিরদিনই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যাক সে কথা। অদ্যকার বিষয় হইতেছে নির্ব্বাণতত্ত্ব। এই নির্ব্বাণের আলোচনার দুইটি বিভাগ। (১) নিষেধমুখ ও (২) বিধিমুখ। নিষেধমুখে অভাবাত্মক নির্ব্বাণের আলোচনাই স্থান পাইয়াছে। আর বিধিমুখে নির্ব্বাণ জিনিষটি যে একেবারে অভাব নহে কিন্তু তাহা পরমার্থসৎ তাহারই সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়টি যেমন জটিল তেমনই দুরূহ, ইহা অল্প সময় ও অল্প আয়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে—তজ্জন্য অনেক সময় ও গবেষণার প্রয়োজন, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা অল্পের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ইহার সারাংশটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ব্যতিরেক মুখে নির্ব্বাণ কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া বৌদ্ধভিক্ষু নাগার্জ্জুন বলেন যে, নির্ব্বাণ সেই পদার্থ, যাহা "অপ্রতীতমসংপ্রাপ্তমচ্ছিন্নমনাগতম্। অনিরুদ্ধমনুৎপন্নমেবং নির্ব্বাণমুচ্যতে" যাহা প্রতীতির গোচর নহে, ব্যাবহারিক প্রমাণের দ্বারা তাহাকে জানা যায় না যাহা প্রাপ্তির বস্তু নহে, যাহা অপরিচ্ছিন্ন যাহা দূরের বস্তু নহে এবং যাহা আগত বা উপস্থিত বস্তু নহে, যাহা অনিরুদ্ধ এবং অনুৎপন্ন তাহাকেই নির্ব্বাণ বলা যায় অর্থাৎ যত কিছু লোকসিদ্ধ বস্তু হইতে পারে ইহা তাহা সকল হইতেই পৃথক নির্ব্বাণ যে ঠিক কি বস্তু তাহা বলা যায় না, কারণ আমরা সচরাচর যাহা দেখি বা বুঝি সেগুলির কারণপরম্পরা বা হেতুর নির্দ্দেশ সম্ভব কিন্তু নির্ব্বাণ সেরূপ বস্তু নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই নির্ব্বাণ শব্দের যৌগিক অর্থ কি। পাণিনির মতে 'নির্ব্বাণোঽবাতে' অর্থাৎ যে প্রদেশে বায়ু নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারই নাম নির্ব্বাণ। অপর বৈয়াকরণগণের মতে প্রদীপের নিবৃত্তি বা উচ্ছেদই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম মহাবিভাগ শাস্ত্রে নির্ব্বাণ শব্দের চারি প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—(ক) বাণ শব্দের অর্থ—পথ (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের হেতু), নিঃ শব্দের অর্থ—পরিত্যাগ। পুনর্জ্জন্মের পথকে পরিত্যাগ করাই নির্ব্বাণ।

(খ) বাণ অর্থে দুর্গন্ধ বা কুৎসিত বাসনা,—নিঃ নিবৃত্তি। মিলিত

অর্থ—শুভাশুভ বাসনার নিবৃত্তি। (গ) বাণ - গভীর বন। নিঃ—নির্গত হওয়া। মিলিত অর্থ—রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দুর্ভেদ্য বা গভীর বন হইতে নির্গত হওয়া।

(ঘ) বাণ—গ্রন্থি, নিঃ—ছেদ বা নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ—জন্ম ও মৃত্যুর গ্রন্থি বা জালের ছেদন।

আরও যথা—'দীপসম ইব নির্ব্বাণং বিমোক্‌খ আহু চেতনা নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং প্রদীপো॥"

প্রদীপের নিব্বাণের ন্যায়ই এই নিব্বাণ। এই এক দিকের কথা, অপরপক্ষে বিধিমুখে আলোচিত নির্ব্বাণপ্রসঙ্গে ভিক্ষু নাগসেন এক স্থলে বলিয়াছেন যে ভূতদয়া, প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্টরূপ বিকাশই নিব্বাণ। এতদ্ব্যতীত তিনি নির্ব্বাণকে আনন্দ-স্বরূপও বলিয়াছেন। মিলিন্দ পন্নহো নামক পুস্তকে নরপতি মিলিন্দ নিব্বাণের সহিত অপর কোন বস্তুর সাদৃশ্য আছে কি না জানিতে চাহিতেছেন। এই প্রসঙ্গে মিলিন্দ ও নাগসেনের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—

মিলিন্দ—হে শ্রদ্ধেয় নাগসেন, আমি বুঝিলাম যে নিরবচ্ছিন্ন সুখই নির্ব্বাণ; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের অভাবে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ আমি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। নির্ব্বাণের সহিত আর কোনও বস্তুর গুণগত যদি কোনও সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

নাগসেন—নিব্বাণের এমন কোনও আখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা ইহার প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, কিন্তু কতকগুলি বস্তুর সহিত ইহার কোনও কোনও অংশে সাদৃশ্য আছে, তাহাই আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি।

মিলিন্দ—তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই বুঝান।

নাগসেন—এই নির্ব্বাণে পদ্মের একটি গুণ আছে, জলের দুইটি গুণ আছে, ঔষধের তিনটি গুণ আছে, সমুদ্রের চারিটি গুণ আছে,

অন্নের পাঁচটি গুণ আছে, দিকের দশটি গুণ আছে, চিন্তামণির তিনটি গুণ আছে, হরিচন্দনের তিনটি গুণ আছে, নবনীতের তিনটি গুণ আছে এবং গিরিশৃঙ্গের পাঁচটি গুণ আছে।

মিলিন্দ—ভগবন্, দয়া করিয়া এই কয়টি দৃষ্টান্তের বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

১। পদ্ম জলের দ্বারা বিকৃত বা আর্দ্র হয় না, নির্ব্বাণও তদ্রূপ পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা কখনও কলুষিত হয় না। এই কারণে নির্ব্বাণ পদ্মের স্বরূপ।

২। জলের গুণ শৈত্য বা তাপবাহিতা, নির্ব্বাণও সমরসে শীতল ও ইহা দুষ্প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন তাপকে হরণ করে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, নির্ব্বাণও কামাদিজনিত তৃষ্ণাকে অপহরণ করে।

৩। ঔষধ বিষদাহকে নিবারণ করে নির্ব্বাণও কামক্রোধাদি বিষদাহের উচ্ছেদ করে, ঔষধ রোগ নিবৃত্ত করে নির্ব্বাণও দুঃখ নিবৃত্তি করে, ঔষধ অমৃতের কার্য্য করে নির্ব্বাণও লোককে অমর করে।

৪। সমুদ্রে কোন জঞ্জাল ফেলিলে সমুদ্র তাহা বহন করে না বরং উৎক্ষেপই করে, নির্ব্বাণও তদ্রূপ, কারণ দুষ্প্রবৃত্তিরূপ অমেধ্য বস্তু নির্ব্বাণে প্রক্ষিপ্ত হইলে, নির্ব্বাণও তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। সমুদ্র যেরূপ অসীম শক্তিশালী এবং অপার, নির্ব্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিময় ও অপার, সমুদ্রে যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহাই নিজ সত্তা ছাড়িয়া সমুদ্র হইয়া যায়, নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইলেও সকল পরিচ্ছিন্ন বস্তুই নির্ব্বাণের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যায়। সমুদ্র যেরূপ অসংখ্য শক্তিশালী জীবের আলয়, নির্ব্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিশালী মহাত্মা অর্হদ্‌গণের আলয়। সমুদ্র যেরূপ প্রতি তরঙ্গের অগ্রে ফেনরূপ শুভ্র কুসুমরাজিতে সর্ব্বদা সুশোভিত, নির্ব্বাণও সেইরূপ পবিত্রতা শান্তি ও বিজ্ঞানরূপ অমল ধবল কুসুমরাজির দ্বারা চিরবিমণ্ডিত।

৫। অন্ন যেমন জীবের জীবনীশক্তি দেয় নির্ব্বাণও সেইরূপ জন্ম জরা ও মৃত্যু দূর করিয়া শাশ্বত জীবনীশক্তি প্রদান করে, অন্ন যেমন জীবের বলবৃদ্ধি করে, নির্ব্বাণও সেইরূপ বলবর্দ্ধক। অন্ন যেমন

জীবদেহে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, নির্ব্বাণও সেইপ্রকার অণিমাদি সিদ্ধিরূপ সৌন্দর্য্যের সম্পাদক হয়। অন্ন ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, নির্ব্বাণও সেইরূপ কামের ও মোহের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। অন্ন দুর্ব্বলতা দূর করে নির্ব্বাণও জীবের সকল প্রকার অশক্তি বা দুর্ব্বলতাকে দূর করে।

৬। আকাশ যেমন অনাদি ও অনন্ত, নির্ব্বাণও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত এবং সকল জীবদেহ যেরূপ আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান বা বিচরণ করে, সেইরূপ নির্ব্বাণকে আশ্রয় করিয়া সকল অর্হদ্‌গণ সংসারে অবস্থান করেন ও বিচরণ করেন।

৭। চিন্তামণি যেমন সকলপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ করে, নির্ব্বাণও সেইপ্রকার সকল অভিলাষ পূর্ণ করে। চিন্তামণি যেমন আনন্দপ্রদ নির্ব্বাণও সেইরূপ আনন্দপ্রদ। চিন্তামণি যেমন জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বাণও সেইরূপ সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়।

৮। হরিচন্দন যেমন দুর্ল্লভ, নির্ব্বাণও তদ্রূপ দুর্ল্লভ, হরিচন্দনের সৌরভ যেমন অতুল, নির্ব্বাণের সৌরভও তদ্রূপ উহা যেমন সকলের প্রশংসনীয়, নির্ব্বাণও তদ্রূপ প্রশংসনীয়।

৯। ঘৃত যেরূপ কোমল, নির্ব্বাণও সেইরূপ কোমল, ঘৃতের গন্ধ যেমন তৃপ্তিকর নির্ব্বাণের সৌরভও তদ্রূপ। ঘৃত যেমন আস্বাদ্য নির্ব্বাণও তদ্রূপ আস্বাদ্য।

১০। গিরিশৃঙ্গ যেমন সমুন্নত, নির্ব্বাণও তদ্রূপ, গিরিশৃঙ্গ যেমন কম্পিত হয় না নির্ব্বাণও তদ্রূপ অকম্প্য। গিরিশৃঙ্গ যেমন দুরারোহ, নির্ব্বাণও তদ্রূপ দুরারোহ। সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে যেমন কোনও প্রকার লতাগুল্মাদি জন্মে না নির্ব্বাণেও তদ্রূপ বাসনারূপ লতা প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। গিরিশৃঙ্গ যেমন কাহাকেও তুষ্ট বা দুঃখিত করিতে কোনও কার্য্য করে না নির্ব্বাণও সেইপ্রকার কাহারও রোষ বা ভয়ের কারণ হয় না।

নাগসেনের এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে নির্ব্বাণ সেই অবস্থা যাহার উপর সুখ ও অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত, অথচ তাহা সর্ব্বশূন্যতা ও সর্ব্বনিবৃত্তির আলয়, বাঙ্মনসাতীত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

লঙ্কাবতারসূত্রেও নির্ব্বাণকে নিষেধমুখে ও বিধিমুখে বর্ণনা করা হইয়াছে। "নির্ব্বাণ সেই অবস্থা যথায় স্কন্ধাদি শরীরের ধাতু ও ষড়ায়তন নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আবার বলা হইয়াছে—"বিষয়বৈরাগ্যাৎ নিত্যং বৈধর্ম্যাদর্শনাৎ অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন বিষয়ানস্মরণাৎ দীপবীজানলবৎ উপাদানোপরমাৎ অপ্রবৃত্তির্বিকল্পস্য ইতি বর্ণযন্তি। অতস্তেষাং নির্ব্বাণ-বুদ্ধির্ভবতি ন চ মহামতে বিনাশদৃষ্ট্যা নিবার্য্যতে"। সুতরাং, সব বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াটাই নির্ব্বাণের অবস্থা নহে। এইরূপ পূর্ব্বে নির্ব্বাণকে যেমন নিরোধের দিক দিয়া দেখান হইয়াছে, তদ্রূপ বিধিমুখেও কথিত হইয়াছে যে, নির্ব্বাণ তাহাই যাহা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোগভূমি হইতে জীবকে তথাগত ভূমিতে লইয়া যায়, যেখানে উপস্থিত হইলে সকল পার্থিব পদার্থই মায়িক এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি উপস্থিত হয় এবং সেই অবস্থায় চিত্ত মন ও বিজ্ঞান সকলই নিবৃত্ত হইয়া যায়। 'সর্ব্বপ্রমাণাগ্রহণাপ্রবৃত্তি দর্শনাৎ তত্ত্বস্য ব্যামোহত্বাৎ অগ্রহণং তত্ত্বস্য তদ্ বুদ্ধ্যাসাৎ সর্ব্বপ্রমাণ স্বপ্রত্যাত্মার্য্যধর্ম্মাধিগমাৎ নৈরাত্ম্যাদ্বয়াববোধাৎ ক্লেশদ্বয়াবরণদ্বয়বিশুদ্ধত্বাৎ ভূয়্যত্তরতথাগতভূমিমায়াদিবিশ্ব সমাধি চিত্তমনোবিজ্ঞানব্যাবৃত্তেঃ নির্ব্বাণং কল্পয়ন্তি।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণ শূন্যত্ব নহে, তাহা জীবের সম্পূর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সে অবস্থায় সকলই এক—সমরস। আবার বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সম্বন্ধেও সর্ব্বসাধারণের একটা মস্ত আপত্তি এই যে, তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভীরুর ন্যায় দূরে পলায়ন করিত—যে সংসার তাহাদিগকে স্নেহ ও যত্নে বর্দ্ধিত লালিত ও পালিত করিয়াছিল—সেই সংসারকেই তাহারা ত্যজ্য ও হেয় মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিত, ইহাই কি তাহাদের যথেষ্ট ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক? কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য কি বস্তুতঃ তাহাই ছিল? নির্ব্বাণ যে সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এই ধারণাই তাহাদের ছিল। নাগার্জ্জুন স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ—

"নসংসারস্য নির্ব্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।
ন নির্ব্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্॥
ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্ব্বাণং নাধিগম্যতে॥"

সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাণের স্বরূপ প্রদর্শন হইতেই পারে না। ব্যবহার জগৎ সর্ব্বথা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থ কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? যদি তুমি নির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য করিয়া থাক, যদি তাহাতেই সকল পর্য্যবসান করিতে চাও তাহা হইলে তুমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে চাহিলে চলিবে না—ব্যবহার হইতে বিভিন্ন পরমার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে না—স্বার্থপরতার উপর পরম লক্ষ্যের অর্থাৎ নির্ব্বাণের অধিষ্ঠান হইতেই পারে না—নাগার্জ্জুনের ইহাই শিক্ষা।

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা
লোকসংবৃতি সত্যং সত্যং চ পরমার্থতঃ।
যেঽনয়ো র্ন বিজানন্তি বিভাগং সত্যযোর্দ্বয়োঃ
তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীরং বুদ্ধশাসনে।

বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ এইরূপেই লোকসংবৃত্তি ও পরমার্থরূপ দুই সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলে। যাহারা সত্যের এই দুইটি বিভাগকেই স্বীকার না করে তাহারা সেই গম্ভীর বুদ্ধশাসন বুঝিতেই পারে না। ইহাই হইতেছে বৌদ্ধধর্ম্মের সার—ইহার নাম মানবপ্রীতি,জীবের মৈত্রীর ভাব। ইহা স্বার্থপরতার কলঙ্কে কলুষিত নহে—সংসারের যাবতীয় জীবের উপকারের জন্য আত্মবলিদানই ভিক্ষুজীবনের চরম লক্ষ্য।

এতাবৎ আমরা এইরূপ পুঁথিগত সত্য বা বিবাদের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া আসিলাম, এখন দেখা যাউক, বৌদ্ধাচার্য্যগণ স্বয়ং এই নির্ব্বাণতত্ত্ব কি ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বুদ্ধের স্বরূপ কি? মাধ্যমিকশাস্ত্রে নাগার্জ্জুন এ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন:—

"স্কন্ধো নান্যঃ স্কন্ধেভ্যঃ নাস্মিন্ স্কন্ধা ন তে পুনঃ।
তথাগতঃ স্কন্ধবান্ ন কতমোঽত্রঃ তথাগতঃ

বুদ্ধঃ স্কন্ধানুপাদায় যদি নাস্তি স্বভাবতঃ।
স্বভাবতশ্চ যো নাস্তি কুতঃ স পরভাবতঃ॥
যদি নাস্তি স্বভাবশ্চ পরভাবঃ কথং ভবেৎ।
স্বভাবপরভাবাভ্যাং ঋতে কঃ সঃ তথাগতঃ॥
শূন্যমিতি ন বক্তব্যমশূন্যমিতি বা ভবেৎ।
উভয়ং নোভয়ং চেতি প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে॥"

বুদ্ধ যদি স্কন্ধবিরহিত* অবস্থাতেই থাকেন তাহা হইলে আমরা কিরূপে তাঁহাকে বুঝিব? স্কন্ধ ব্যতিরিক্ত কেহই থাকিতে পারে না, যাহা নিরুপাধিক তাঁহাকে তথাগত কিরূপে বলা যায়? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, স্বভাবাস্তিত্ব ব্যতিরেকে কিরূপে পরমার্থাস্তিত্ব ঘটিতে পারে? ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তিনি কিরূপেই বা থাকেন? শূন্যও নহেন, অশূন্যও নহেন কিরূপই বা তিনি? কঃ সঃ তথাগতঃ। ক্রমে সিদ্ধান্তপক্ষে ইহার উত্তর হইল, "তথাগতস্তৎস্বভাবো যৎ স্বভাবমিদং জগৎ"। তথাগতের যাহা স্বভাব জগতের স্বভাবও যে তাই, সকল অণু পরমাণুতে জীবে জীবে সেই তথাগতই বিরাজ করিতেছেন— তিনি কি কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন—জগতে তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়া রহিয়াছেন. প্রাণিমাত্রের স্বভাবে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই।

আবার দেখুন, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক পুস্তকে তথাগত আনন্দকে নির্ব্বাণের স্বরূপ কি বুঝাইতেছেন—

সমাদপেমী বহুবোধি সত্ত্বান্ বোধায় জানস্মি স্থাপেমি চৈন।
সত্ত্বান কোটীন্ অযুতাননেকান্ পরিপাচয়ামী বহু কল্পকোট্যঃ।
নির্ব্বাণভূমিং চুপদর্শয়ামি বিনয়ার্থসত্ত্বান্ বদাম্যুপায়ম্
ন চাপি নির্ব্বাম্যহু তস্মি কালে ইহৈব ধর্ম্মু প্রকাশয়ামি॥
তত্রাপি চাত্মানমধিক্ষিপামি সর্ব্বাংশ্চ সত্ত্বান তথৈবচাহম্।
বিপরীতবুদ্ধী নরা বিমূঢ়াঃ তত্রৈব তিষ্ঠন্তু পশ্চি ধূমাং॥

* পঞ্চ স্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, ইহার সহিত কাম, ক্লেশ ও কর্ম্ম লইয়াই বৌদ্ধদর্শনের অবস্থা।

ঋজু যদা তে মৃদুমার্দবাশ্চ উৎসৃষ্ট কামাশ্চ ভবন্তি সত্ত্বাঃ।
ততোঽহং শ্রাবক সংঘ কৃত্বা আত্মানন্দশেম্যহু গৃধকূটে॥

বুদ্ধের কার্য্য জগতের জীবসকলের উদ্ধার, সকলের চিত্তে সেই বোধির জাগরণ, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার জাগরণ। বহুকোটী কল্পান্ত ধরিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের ইহাই কার্য্য যে—আধিব্যাধিক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারসাধন, তাহাদিগকে জ্ঞানের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উপায় প্রদর্শন; মানুষ অন্ধ, শোকতাপগ্রস্ত, তাহাকে নির্ব্বাণভূমি দেখাইয়া দেওয়াই বুদ্ধের কর্ত্তব্য। যখন লোকে ভাবে যে বুদ্ধ কি আর আছেন, তিনি নাই, তিনি শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সময়ে তিনি (বুদ্ধ) নির্ব্বাণমার্গের উপদেশ করিয়া থাকেন—জীবহৃদয়ে বুদ্ধই অধিষ্ঠিত আছেন, যখন জগতে শুভযুগ আসে, ঋজুতা ও সরলতা আসিয়া ইহধামে বিচরণ করে, যখনই জীবগণ সত্ত্বগুণপ্রধান হয় তখন তিনি শ্রাবকসংঘ সংগঠন করিয়া গৃধকূটে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। জগতের সৃজন, পালন ও রক্ষণের জন্য তিনিই যুগে যুগে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়েন। মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই বিশ্বাস।

আমরা উপরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, বৌদ্ধদর্শনপ্রোক্ত নির্ব্বাণে ও আমাদিগের বেদান্তস্বীকৃত নির্ব্বাণ মোক্ষের কোন বৈসাদৃশ্য নাই। বেদান্তে নির্ব্বাণের আলোচনায় আমরা ইহা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। আরও দেখিলাম যে, বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদীও নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্ব্বাণদাতা বুদ্ধে বিশ্বাসী এ বুদ্ধের সহিত ও আমাদের পরমেশ্বরতত্ত্বের কোন বৈসাদৃশ্য নাই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ, জীবহৃদয়বিহারী পরম কারুণিক, সদিচ্ছার প্রেরক ও মঙ্গলবিধাতা পিতা, জীবের উদ্ধার ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্য্যই নাই। এই তথাগত বুদ্ধের সহিত কি আমাদিগের বেদান্ত শাস্ত্র-বর্ণিত অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ঈশ্বরের কোনও পার্থক্য আছে? বাস্তবিকই হিন্দুর ঈশ্বর ও বৌদ্ধের এই তথাগততত্ত্বের কোনও পার্থক্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আজ এই যুগসন্ধির দিনে আধ্যাত্মিক জীবনের

পুনর্গঠনের এই শান্ত উষার উন্মেষকালে আমরা সকলেরই মধ্যে এই একত্বের অনুসন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি। সময়ের আবর্ত্তনে আমরা আরও নূতন নূতন তথ্য জানিতে পারিব। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের কারণ আর থাকিবে না, এখন আমাদিগকে পরস্পর বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে এবং একযোগে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক বৌদ্ধ হিন্দু ও অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই অকপট-ভাবে পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই আমরা জগতের সমক্ষে ভারতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।*

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গলার কথা"।

(ভারতের সাধনার লেখক)

"বাঙ্গলার কথার" উপর এ পর্য্যন্ত যে সব কথার অবতারণা করা হইল, সমস্তই উহার তত্ত্বাঙ্গের প্রসঙ্গে, এইবার "বাঙ্গলার কথার" সাধনাঙ্গের আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

কিন্তু "বাঙ্গলার কথায়" আরও দুইটী তত্ত্বকথার সদ্বিচার আছে, একটী পাশ্চাত্য Industrialism সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টী আমাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে। এ দুইটীই বা বাকি থাকে কেন? সেইজন্য এই দুইটী প্রসঙ্গও যথাস্থানে থাকিবে।

পাশ্চাত্য Industrialism বা শিল্পবাণিজ্যনীতি পাশ্চাত্য পলি-টিক্সের একটী অনিবার্য্য পরিণাম। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে মানুষের যে পার্থিব জীবন, তাহার নানা আসবাব সরঞ্জাম মানুষ যতই বাড়াইতে চাহিবে, ততই তাহারা বাড়িয়া যাইতে পারে। আর

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাধারণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। ইহা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের' দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ওদিকে ঐ পার্থিব জীবনের প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের লক্ষ্য সুতরাং পাশ্চাত্য পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য Industrialism একই সুর লয়ে বাধা রহিয়াছে। একটীকে গ্রহণ করিলে আর একটী অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু পাশ্চাত্য পলিটিক্সকে সাদরে গ্রহণ করিব, অথচ পাশ্চাত্য Industrialismকে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করিব, এমন অসম্ভব ব্যাপার কোন দেশেই সম্ভবপর হইবে না। সেইজন্য পাশ্চাত্য পলিটিক্সের উৎসাহে আগুন ছুটাইয়া দিয়া দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দিকে ফিরিয়া চাওয়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে হইবে না তাহা যত শীঘ্র আমরা বুঝি, ততই মঙ্গল।

শিল্পবাণিজ্যের নীতি আমাদের দেশে কিরূপ হইবে, তাহা আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিয়া দিতে পারে। স্বদেশী পলিটিক্সের আদর্শ ও প্রকৃতি আমরা সুস্পষ্টভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছি। যে নীতি বলে, পার্থিব জীবনের নানা আসবাব-সরঞ্জাম যথাসম্ভব বাড়াইয়া যাও, সে নীতির সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের কখনও খাপ খাইতে পারে না। দেশের সমষ্টিজীবন যাহাতে ভোগবিলাসের মোহে আকৃষ্ট না হয়, তাহাই স্বদেশী পলিটিক্সের একটী উদ্দেশ্য। সেইজন্য পাশ্চাত্যে যেমন রাজৈশ্বর্য্য সমষ্টিজীবনের বনিয়াদ বলিয়া স্বীকৃত, আমাদের দেশে সেইরূপ সাধারণ চাষীর জীবনকে সমষ্টিজীবনের বনিয়াদরূপে আশ্রয় করিয়া স্বদেশী পলিটিক্সের উদ্ভব ও উৎকর্ষ। সাদাসিদা গ্রাসাচ্ছাদনের স্বচ্ছলতাই আমাদের দেশের অর্থনীতির সনাতন ভিত্তি। সেই সাধারণ ভিত্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে যেখানে যেরূপ ঐশ্বর্য্যঘটা ঘটিতে পারে ঘটুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমস্ত দেশটা ধনমদমত্ততায় স্ফীত হইয়া অপরাপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ধাবমান হইবে, এমন অর্থনীতির আদর্শ আমাদের পলিটিক্সে স্থান পাইতে পারে না। ঠিক এইরূপ মত্ততা ও প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য Industrialismএর জনকজনয়িত্রী। অতএব সম্মিলনের সন্তাপুতি-

মহাশয় পাশ্চাত্য Industrialism এর পরিহার্য্যতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করি।

কিন্তু সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে যে, পাশ্চাত্যের শিল্পবাণিজ্যনীতি আমরা যদি আজ অবলম্বন না করি, তবে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতা অতি সহজেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে আমাদিগকে মুছিয়া ফেলিবে। পলিটিক্সে, ব্যবসাবাণিজ্যে পাশ্চাত্য আজ যে প্রতিযোগিতার ধূয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সমগ্র জগৎকে যোগদান করিতেই হইবে; যে দেশ যোগদান করিবে না, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই সার্ব্বজনীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার আহ্বানস্বরূপ বিধাতা ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই ইংরাজী আমলে প্রতিযোগিতা এড়ান অসম্ভব।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ইংরাজ ভারতে রাজশক্তির আসনই গ্রহণ করায় জগতের রাজনীতির প্রতিযোগিতার বর্ত্তমান ভীষণ খাণ্ডবদাহ ও হলাহল হইতে আমরা নেপথ্যে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। বিধাতার অভিপ্রায় লইয়া যদি কথা উঠে তবে বলিতে হয় যে বর্ত্তমান যুগের তুমুল রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত যাহাতে নানা নেশনের মারামারি কাড়াকাড়ির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় না হয়, সেই জন্যই ভারতকে ইংরাজের রাজনীতিক অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে ভারতের জাতীয় জীবন এমনভাবে গঠিত হয় নাই, যাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশীকে রাজার আসনে বসাইলেই সেই জাতীয় জীবনের মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, গল্পে যেমন এক একটা রাক্ষসীর প্রাণ কোন গুপ্ত কৌটায় রক্ষিত হয়, সেইরূপ আমাদের দেশের প্রাণ ধর্ম্মরূপ কৌটার মধ্যে রক্ষিত আছে। যতদিন এই ধর্ম্মের উপর—প্রজার স্বধর্ম্মের উপর সমাজের স্বধর্ম্মের উপর—আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বধর্ম্মের উপর আততায়ীর হাত না পড়িবে, ততদিন আমাদের দেশের মৃত্যু নাই। আমাদের মরণ-বাঁচনের

কাটি রাজনীতিরূপ পেটিকায় রক্ষিত হয় নাই, যেমন অন্যান্য দেশে হইয়াছে—হইলে, রাজনীতিক অধীনতা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিত। তবে যে আজ অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের চাপে মৃত্যু আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার মূল কারণ এই যে আমরা আমাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, স্বদেশী পলিটিক্সের বর্জ্জন করিয়া বিদেশী পলিটিক্সের প্রবল পীবিতে "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইতেছি। প্রত্যেক দেশে একটা না একটা পলিটিক্স ত চালাইতেই হইবে; আমরা যখন আমাদের দেশের প্রজাধর্ম্মমূলক পলিটিক্স দেশে চালাইলাম না তখন ইংরাজ আপনার বিদেশী পলিটিক্স কেন না চালাইবে? তোমার ঘরের পলিটিক্স তুমি তোমার ঘরে চালাইলে না, বাহিরের পলিটিক্স ইংরাজ কেন না চালাইবে? আর সেই বাহিরের পলিটিক্স তুমি যে আদর ক'রে, আবদার ক'রে, নিজের অন্দরমহলে ঢুকাইতেছ, পল্লীবাসী প্রজার জীবনে খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যবস্থার দায় পর্য্যন্ত ইংরাজরাজের ঘাড়ে পদে পদে চাপাইতেছ। তোমার স্বধর্ম্মের উপর আততায়ীর হাত কে আগে উঠাইয়াছে?

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ আমরা নিজেরাই পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতাকে ডাকিয়া আনিয়াছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যতটা অত্যাচারের জোরে এ দেশে পাশ্চাত্য ব্যবসাবাণিজ্য ঢুকাইয়া দিতেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যভিচারের জোরে ইংরাজীশিক্ষিত-সম্প্রদায় এ দেশে বিদেশী ব্যবসাবাণিজ্য ঢুকাইয়া দিয়াছেন। এক-দিকে পূর্ব্বপক্ষ যদিও কারিগরের আঙ্গুল কাটিয়া থাকে, অপরদিকে উত্তরপক্ষ দেশশুদ্ধ কারিগরদের মুখের গ্রাস কাড়িতেছিল। আমা-দেরই বাবুয়ানার জন্য গ্রামে গ্রামে শিল্পকারিগর উদরান্নের দায়ে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে ভাগ বসাইতে ছুটিয়াছে, চাষের জমি দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছে, অথবা সহরে আসিয়া বিদেশী উপকরণে নূতন কারিগরী ফাঁদিয়া বসিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপার ত এখনও চক্ষের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় এখনও যায় নাই।

এখন, হায়, পরণের কাপড়টী পর্য্যন্ত যোগাইবার জন্য ম্যাঞ্চে-

বা জাপানের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। দেশে ঘরে ঘরে যে সূতা কাটা হইত, সে সূতার কাপড়ে সহরের বাবুয়ানা চলে না; কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাবু হওয়া ত চলে? যাদের না হয় গ্রামে একটা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তারা অনায়াসেই ত প্রত্যাবর্ত্তনের পালা সুরু করিয়া দিতে পারেন? গ্রাম্য তাঁতির কাপড়ের ক্রেতা যদি এক্ষেত্রে দলে দলে আবির্ভূত হইতে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই কাল তুলার চাষ আরম্ভ হইবে, চরকা ঘুরিতে আরম্ভ হইবে, তাঁত চলিতে থাকিবে। ক্রেতার আবির্ভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব ও উৎকর্ষ। দেশে কাপড়ের যে সব কল কারখানা হইয়াছে, তাহারা সহরে বাবুদের কাপড় যোগাইতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু গ্রাম্যপথের ধারে যে সমস্ত দেশটা পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাচীন হালচাল আজ আবার প্রবর্ত্তিত না করিলে তাহার কাপড় জুটিবে কি উপায়ে? নির্লজ্জভাবে আজ আমরা কি জাপানের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বসিয়া থাকিব এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদেশী পলিটিক্সের শোভাযাত্রায় নাচিতে ও দেশশুদ্ধ লোককে নাচাইতে ছুটিব?

আজ পরণের কাপড়কে উপলক্ষ্য করিয়া একটা মস্ত সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। স্বদেশবুদ্ধি, স্বদেশীবুদ্ধি আজ যাহার প্রকৃতভাবে জাগিয়াছে, যে আসরে আজ কেবল রাজসরকারকে লইয়া মান অভিমানের পালা চলিয়াছে সে আসর থেকে সে প্রকৃত দেশের কাজের আসরে ছুটিয়া যাইবে। সে বুঝিবে যে দেশী হোমরুলের মধুমক্ষিকা বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রামে গ্রামে গ্রাসাচ্ছাদনের মধু সংগ্রহ করিয়াছিল, সে মধুমক্ষিকাকে অবজ্ঞায় মরিতে দিয়া বিদেশী হোমরুলের সোণার ভীমরুলের পশ্চাতে ছুটা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দেশের লোকের দ্বারা দেশের পরণের কাপড়টা যদি আজ যোগাইতে পারি, তবে খুব ক্ষীণ হইলেও সত্যিকার হোমরুলের সামান্য একটা আস্বাদ পাওয়া যাইবে। এই আস্বাদ পাইবার জন্য কাহারও প্রাণ কি পাগল হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে,

তবে নগরে নগরে হাজার হাজার হোমকলার সঙ্ঘের তালিকায় নাম দস্তখৎ করিলেও বলিব, "হে ভারত, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"!

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি সে দিন দেশের লোককে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের লুপ্ত ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদের——

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় (Industrialism) কে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লিগ্রাম হইতে টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পল্লীগ্রামের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

(৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্যতা দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কার-বার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়

সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেই-জন্য জেলায় জেলায় জেলাবাসীদের সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।"

কি যে করিতে হইবে তাহা এর চেয়ে বিশদরূপে আপাততঃ বুঝাইবার ত আবশ্যক দেখিতেছি না। কিন্তু কে করিবে এই প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি মহাশয় একটা কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন। সেটাও এই সঙ্গে আমরা উদ্ধৃত করি, যথা :—

"প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ৫টী কি ২৫টী পল্লীসমাজ থাকিবে, এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চায়েৎ ব্যতীত, জেলা-সমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটী পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলাসমা-অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলাসমাজ——

(১) সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষাদীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীরশিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলাসমিতির অধীনে থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে

পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোট খাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।

(৬) গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকীদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকীদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলাসমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার সাধারণ পুলিশের ভার জেলাসমাজের হাতেই থাকিবে।

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফোজদারী আদালত তাহা জেলাসমাজের হাতে থাকিবে না, তাহারা সম্পূর্ণ হাইকোর্টের অধীন থাকিবে।

(৯) এই জেলাসমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুইশত হইতে পাঁচশত পর্য্যন্ত হইবে।

(১০) এই জেলাসমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটী একটী করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে। এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে

(১২) জেলা ও পল্লীসমাজের কোন কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা-সমাজ ও পল্লীসমাজের সকল কার্য্যনির্ব্বাহের

জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলাসমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে তাহা বন্ধ দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrateএর এখন যে সব ক্ষমতা আছে তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলাসমাজসমূহকে বঙ্গীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সভাপতি মহাশয় এই যে কার্য্যের তালিকা ও কার্য্যের প্রণালী উপস্থাপিত করিয়াছেন, ইহাকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়,— এক ভাগে "কি করিতে হইবে" তাহাই শুধু বলা হইয়াছে, আর এক ভাগে "কে করিবে" তাহাই দেখান হইয়াছে কি করিতে হইবে, এই অংশের অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতার মূল কথা—পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পল্লীগ্রাম থেকে সমস্ত দেশটাকে গড়িয়া তুলিবার কথা যে আজ উঠিয়াছে, ইহা "লাখো কথার এক কথা।" ইহাতে ভারতীয় সমস্ত সমস্যার যেন মূল বস্তুটী আমাদের করতলগত হইয়াছে। যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। আমাদের সমষ্টি-জীবনের পল্লীগ্রামরূপ মর্ম্মস্থলে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, সে প্রশ্নের মীমাংসা সমগ্র ভারতে হইবার নহে। এই মর্ম্মস্থল হইতে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, বাহিরে বাহিরে একটা ধার করা চক্‌চকে খোলসের খোলস পরাইয়া দিলেই জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিল না।

পল্লীগ্রামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলিলেই পল্লীজীবনের সমস্ত অঙ্গের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা বুঝায়। পল্লীতে পল্লীতে কৃষি, শিল্প, কারবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজধর্ম্মের মূলপত্তন করা চাই। এই মূলপত্তন প্রত্যেক পল্লীবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, আইনের জোরজবরদস্তির উপর নহে, কারণ ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা। পল্লীবাসীর এই যুগযুগান্তের ধর্ম্মবুদ্ধিকে উদ্বোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য লোকসেবায় উৎসৃষ্ট জীবন, পল্লীবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মশিক্ষাদাতৃগণের আবির্ভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য দেশে আজ সাধু ও সাধুকল্প সেবকসম্প্রদায়ের অভাব হইবে না। প্রত্যেক পল্লীসমাজে কোনও একটা ঠাকুরবাড়ী, কোনও একটা বারোয়ারিতলা, হরিসভা বা চণ্ডীতলা প্রভৃতি সৎশিক্ষার আড্ডা স্থাপন করা খুবই সহজসাধ্য। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত আড্ডা ধমনীসংযোগের মত সৎশিক্ষা, সৎপরামর্শ, কর্ত্তব্যনির্ণয় প্রভৃতি আবশ্যকীয় চিন্তা ও সাধনার সঞ্চার করিয়া দিবে, পল্লীর পঞ্চায়েৎ, মোড়ল প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, পল্লীসমাজ গড়িয়া তুলিবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পল্লীসমাজ জেলাসমাজ নির্ব্বাচিত করিবে। অতএব গোড়াথেকেই স্থির হইল, দেশের কাজ করিবে দেশের সাধারণ লোক,—চাষী, শিল্পী, কারিকর, ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক প্রভৃতি, এবং দেশের কাজ করাইবে দেশের ধর্ম্মশিক্ষক সম্প্রদায়।

তারপর পল্লীজীবনে পুলিশের কাজ, আইন আদালতের কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশের সাধারণ লোক যখন দেশের কাজের "কাজি" হইবে, তখন এই সকল রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহাদের বিরোধ হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি লোকসেবকসম্প্রদায় যখন দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেশের কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন রাজকর্ম্মচারীদের সহিত তাহাদের একযোগে কার্য্য করিতে হইয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের কাজে যতক্ষণ আমরা ইংরাজের রাজপ্রতিপত্তির বিরোধী ভাব পোষণ না করি, ততক্ষণ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত কোনওরূপ বিরোধ দূরে

থাকুক, কোনও সন্দেহমূলক কুব্যবহারেরও অবকাশ থাকে না। বরং পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগিতার ফলে দেশের কাজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া যায়। দেশের লোক দেশের কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে, পুলিশ ও রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যসাধনে সহজেই সুশৃঙ্খলা ও বাস্তবতা বাড়িয়া যাইবে। তখন রাজসরকারের বিদ্যা-পসারণ, সুবিধাবিধান ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্ত্তব্যসাধনের সহিত দেশের লোকের দেশের কাজের একটা অব্যর্থ সংযোগ গড়িয়া উঠিবে। সে অবস্থায় দেশের লোকের দেশের কাজের উপর সরকারী পূর্ত্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি বিভিন্ন-বিভাগীয় কর্ম্মের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইবে। আর যদিই বা কোনও ক্ষেত্রে রাজকীয় কোনও বিভাগের সহিত দেশের লোকের দেশের কাজে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, তবে জেলাসমাজ হইতে নির্ব্বাচিত লোক-প্রতিনিধিগণ রাজসভায় সেই অসামঞ্জস্যের প্রতি সেই রাজকীয় বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সে ত আর তখন কেবল ফাঁকা রাজনীতিক অধিকারের দাবী দাওয়া নহে, যে বাগাড়ম্বরের বস্ত্রবাহুল্যে একটা হৃদ্‌কম্পনের সহজে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। সে যে কর্ম্মব্রতধারী, স্বধর্ম্মৈকপ্রাণ প্রজাবৃন্দের ব্যক্ত অভিযোগ; সে যে কাজের কথা, মুখের কথা নহে; সে কথা কোনও চক্ষুষ্মান্ চাপা দেন না, উড়াইয়া দেন না। গবর্ণমেণ্ট ত দিবেনই না, কেন না প্রজা যে তখন নিজের দেশের কাজের উপর সরকারী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করাইয়া লইয়াছে। তখন দেশের লোক কৌন্সিল প্রভৃতিতে যে প্রতিনিধি পাঠাইবেন, সে প্রতিনিধিগণ সত্য সত্যই তাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের সহিত, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক আশা ও উদ্যমের সহিত এই প্রতিনিধিদের একটা বাস্তব যোগাযোগ থাকিবে। তখন আমাদের সমষ্টিজীবন কেবল একটা আশার কথা নহে, একটা কল্পিত আদর্শ নহে, তখন উহা একটা প্রত্যক্ষ বস্তুতন্ত্র সত্তা। যতদিন না দেশের জীবনে এই বস্তুতন্ত্রতার আবির্ভাব হয়, তত দিন বিলাতেই

বল আর এদেশেই বল আমাদের প্রজাপ্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র আমাদের আশার দূত, আশার শক্তিতে শক্তিমান,—সে শক্তি ইংরাজ রাজার কর্ম্মশক্তির সম্মুখে বেশীভাগই নিষ্ফল প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইবে। অলস প্রার্থীর আশাশক্তি কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তির সম্মুখে কি আর শ্রদ্ধা পাইবে? বাচনিক শ্রদ্ধায় কি কাজ হয়, কথায় কি চিঁড়ে ভেজে?

সহজেই বুঝা যায়, দেশের কাজের যে ব্যবস্থার কথা আমরা বলিতেছি, তাহার সহিত সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের ব্যবস্থার একটা প্রকাণ্ড গরমিল আছে। দেশের কাজ যে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মিল আছে, কে যে করিবে সে সম্বন্ধেও মিল আছে বলা যায়, কিন্তু দেশের কাজ কে করাইবে, এ সম্বন্ধে একটা মস্ত মতভেদ রহিয়াছে। দেশের কাজে একটা প্রেরণা চাই, একটা বিধিবত্তা চাই। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, সে বিধিবত্তা রাজসরকারের আইন-কানুনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কার্য্যপ্রণালীর ১৪ দফায় তিনি স্পষ্টই এ কথা বলিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, দেশের কাজের সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত বিধিবত্তা, আমাদের সনাতন প্রথানুসারে প্রজার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে; গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মশিক্ষকগণ তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের কাজ করাইবে। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স চিরকালই এইরূপ প্রজাধর্ম্মমূলক। রাজা কিছু করিয়া দেন না, গড়িয়া দেন না, কেবল বিঘ্নাপসারণ করেন, তত্ত্বাবধান করেন। প্রজা গড়িয়া তুলে, রাজা বজায় রাখে। আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের এই প্রাণধর্ম্মটীর অপলাপ করিলেই স্বদেশী পলিটিক্স বিদেশী পলিটিক্সে পরিণত হইবে। রাজাকে আইনকানুন করাইয়া যদি প্রজাকে দেশের কাজ করিতে বাধ্য করিতে হইল, তাহা হইলে আগেই রাজার দরবারে আইনকানুনের একটা আবেদনপত্র লইয়া ছুটিতে হয়। রাজাকে দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা দেশের কাজে আগে না নামাইতে পারিলে, প্রজার কাছে দেশের কাজের জন্য যাওয়া নিষ্ফল হইল। এই রাজসরকারের শক্তি দ্বারা দেশের কাজের পত্তন ও উন্নতি

করার নামই বিদেশী পলিটিক্স। সভাপতি মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাবে অকস্মাৎ এই একটা গলদ ঢুকিয়া গিয়াছে।

মহাজনের হাত থেকে প্রজাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাঙ্ক খুলিতে হইলে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ট্যাক্স বা চাঁদা তুলিতে হইলে যদি উপস্থিত কোনও বিশেষ আইনের সাহায্য লইতে হয়, সে আলাদা কথা। ঐরূপ ব্যাঙ্ক না থাকুক এখনও জায়গায় জায়গায় লোন আফিস আছে, ট্যাক্স না থাকুক চাঁদা বা বারোয়ারীর বা ধর্ম্মার্থের টাকা আদায় করা এখনও চলে। এ সমস্ত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সাহায্যেই কাজ চলে। ব্যাঙ্ক বা ট্যাক্স প্রভৃতি ইংরাজী নাম গ্রহণ করিলেই কি সরকারী নূতন আইন-কানুনের কথা মনে পড়িবে ?

তার পর সরকারী পুলিশ বা লোকাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রহিত-করণ, অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সঙ্কোচন ইত্যাদি যে সমস্ত রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সে সমস্ত সমর্থন করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য রাজকার্য্যকে দেশের কাজের সহিত সমঞ্জসী-ভূত করা, যাহাতে দুইটী একেরই অঙ্গীভূত হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী দেশের কাজের প্রবাহ বহাইয়া দিয়া ক্রমশঃ রাজকার্য্যের ধারাগুলিকে তাহার সহিত সম্মিলিত করাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। রাজ-কর্ম্মচারী যেখানে যেমন আছেন, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না। তাহাদের কার্য্যের খাতগুলির সহিত দেশের কাজের সংযোগ ঘটানই আমাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের সাধনা কিরূপে হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মনে করুন, আজ একটা সৌভাগ্যের কথা যে স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ রাজকীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পূর্ত্তাদি বিভাগের মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দেশের লোকের কাছে এই সকল কার্য্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা :—

Local self government, supplemented by the spread of the co operative movement, will gradually solve many of our most difficult problems—such as primary educotion, small industries, improved agriculture, indetbedness of the peasantry, rural sanitation and so forth, and *to this we must devote our best energies and attention in the immediate future*, bearing in mind we have got to build from the village upwards

তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"While I gratefully acknowledge the efforts now being made by the Government in all the provinces for truly laying the foundations of local self-government, I cannot help regreting that the Resolution of the Government of India of last summer does not go far enough or even as far as Lord Ripon's Resolution of 1882 in the direction of recommending less official control and a greater extension of the elective principle both as to members and chairmen of Rural and District Boards Let not our rulers forget that "self-government implies the right to go wrong, and it is nobler for a nation as for a man to struggle towards excellence with its own natural force and vitality, however blindly and vainly, than to live in irreproachable decency under expert guidance from without.'

স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের উদ্ধৃত উক্তি হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে আমরা যেরূপ দেশের কাজের ব্যবস্থা করিতে চাই; তাহার সহিত তাঁহার মতের একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। তিনিও পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের জাতীয় জীবন গড়িবার বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহসম্পন্ন। এ অবস্থায় তিনি যখন রাজকীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত্তাদি বিভাগের মন্ত্রিপদে আরূঢ়, তখন দেশের প্রজা-জীবনের সহিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা খুবই অধিক। এই সুযোগ ত উপস্থিত, কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোক কি দেশের কাজে আজ লাগিবে ?

আমাদের দেশের কাজ কি, আমাদের জাতীয়তা ধর্ম্ম কি, যদি একবার সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে দেশের লোককে কিরূপ শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা সহজ হইয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। আমাদের দেশেও তাহাই হইবে। প্রচলিত সমস্ত বিদ্যাদির অনুশীলন ত সব দেশেই উচ্চ শিক্ষার বিষয়ীভূত, কিন্তু সেই উচ্চশিক্ষাবিস্তারকে আমাদের দেশে আমাদের দেশের কাজের সম্পূর্ণ অনুকূল করিয়া দিতে হইবে। সেই উচ্চশিক্ষার মধ্যে এমন একটা ভাবরূপ ভিত্তির সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সমগ্র জাতীয় জীবনের দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে, যাহাতে জাতীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য প্রত্যেক শিক্ষিত জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, যাহাতে সেই লক্ষ্যানুগত্যের ফলে স্থায়ী দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে এবং দেশব্যাপী দেশের কাজে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান ও কাজ আশ্রয় করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করে। আর পল্লী-সমাজের নিম্নশিক্ষার ভার পল্লীসমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। এখন যেমন সহরের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া সে শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পল্লীজীবনের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ইহার পরিবর্ত্তে পল্লীজীবনের কর্ম্ম ও ভাবসম্পদ কি তাহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিরূপে কেন্দ্রস্থানীয় তাহা ছেলেরা ক্রমশঃ বুঝিতে শিখে, যাহাতে সেই জাতীয় জীবনের আদর্শ শিখিতে চাহিয়া তাহারা সমগ্র জগতের আদর্শ ও শিক্ষায় ক্রমশঃ প্রবেশলাভ করিতে শিখে। এইরূপে পল্লীগ্রামের প্রয়োজনাদি হইতে পত্তন করিয়া চিন্তামূলক শিক্ষা ও সাধনমূলক শিক্ষা উভয়েই ছেলেদের শিক্ষিত করিতে হইবে। এ শিক্ষায় কোনও আড়ম্বরের দরকার নাই; যেখানে যেরূপ আসবাব সরঞ্জাম জুটিয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট; পুস্তকপরীক্ষা অপেক্ষা চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির উৎকর্ষই লক্ষ্য করিতে হইবে। এ শিক্ষার আসল ভিত্তি শিক্ষাদাতার হৃদয় ও প্রাণ। পল্লীসমাজ ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা ইহাঁকে

নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন, কারণ পল্লীসমাজের সর্ব্ববিধ শিক্ষার মূল কেন্দ্র হইল পল্লীসমাজের দেবস্থান বা ধর্ম্মস্থান,—হরিসভা, বারোয়ারিতলা, চণ্ডীতলা প্রভৃতি। এখানে পঞ্চায়েৎ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে, চাষী ব্যবসায়ীরা মুখের কথায় আবশ্যকীয় শিক্ষালাভ করিবে, অথবা আবশ্যকমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইবে, গ্রামবাসীরা নিজ হিতাহিত বিচার করিবে, দেশবিদেশের ঘটনাবলী বিচার করিবে, আপনাদের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিবে। এক কথায় এই গ্রাম্য ধর্ম্মস্থানই দেশের কাজে উৎসস্বরূপ, এবং ইহার ধর্ম্মগতপ্রাণ, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান অধিষ্ঠাতাই দেশের কাজরূপ তরণীর কাণ্ডারী। তিনি দেশের লোককে তরণীর দাঁড় ধরাইবেন, তিনিই সারি গাওয়াইবেন; তিনিই দেশের লক্ষ্যসাধনারূপ তীর্থাবাসের পাণ্ডা। (সমাপ্ত)

একটি ডিট্রয়েট মহিলা ও তাহার ভারতীয় কার্য্য।

(আমেরিকার Detroit Saturday Night নামক পত্রে Rev. William F. Hopp লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত

লোকে তাঁহাকে সিষ্টার খৃষ্টীন বলিয়া ডাকে সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে রোমান্ কাথলিক চার্চ্চের কোনও একটী সম্প্রদায়ভুক্তা বলিয়াই ঠাওরাইযাছিলাম। তৎপরে কিন্তু এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত থাকিতে দেখিলাম, যেগুলি ঐরূপ সম্প্রদায়গত খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সীমানার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। তখন বুঝিলাম যে তিনি তাহা হইলে ঐরূপ কোনও সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক নহেন এবং হইতেও পারেন না।

সিষ্টার খৃষ্টীন রামকৃষ্ণ মিশন নামক হিন্দু সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তা। পনর বৎসর পূর্ব্বে ইনি ডিটরয়েটের খৃষ্টীয়ান্ চার্চের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কেবল 'নামে খৃষ্টান্'—যাহাদের সংখ্যা আমাদের মধ্যে এত অধিক সেরূপ নহে, বিশেষ শ্রদ্ধান্বিতা ও ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট-প্রাণা খৃষ্টীনের অন্তঃকরণ যথার্থই তখন ঐ সম্প্রদায়-প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া চলিত। শিক্ষা সমাপ্তির পর সতর বৎসর কাল ইনি আমাদের একটী সরকারী স্কুলে অধ্যাপনা করিয়া কাটাইয়াছেন। দশ বৎসর হইল ইনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া হিন্দুদের মধ্যে তাহাদেরই একজনরূপে কাল কাটাইয়া আসিতেছেন। যে ভারতীয় জনসাধারণের সহিত অবাধে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের নিকট থাকিতেই ইনি অভিলাষী। সম্প্রতি এখন বন্ধু বান্ধবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য ইনি একবার ডিটরয়েটে আসিয়াছেন। ইঁহার সমগ্র ব্যক্তিত্ব এখন প্রাচ্যভাবের মাধুর্য্যে মণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি ইঁহার কণ্ঠস্বর ও বদনমণ্ডলই অসাধারণ সহানুভূতির পরিচায়ক ও ধর্ম্মভাবের উদ্বোধক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান খুব ব্যাপক ও তাহার বর্ণনাগুলিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। যদিও সিষ্টার খৃষ্টীন অত্যন্ত বিনয় সহকারে তাহার নিজের কার্য্য সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলেন তাহা হইলেও তাহাতেই ইঁহার পরদুঃখপ্রবণ হৃদয়ের মহৎ ও উচ্চ-ভাব স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিঃস্বার্থতা, নিস্পৃহতা, ও পরোপ-কারৈষণাই তাঁহাকে আপন গৃহ, কর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের কার্য্যে জীবন নিবেদিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ডিটরয়েটে আগমন ও ধর্ম্মব্যাখ্যানাদি করেন সেই সময়ে কয়েকটী গুরু সন্দেহভাবে প্রপীড়িতা খৃষ্টীনের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দের সাধকজীবনের বিশালত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের মহান্ জ্ঞান গভ অভিনবত্বের উত্তেজনা মিস্ গ্রীনষ্টিডল খৃষ্টীনের হৃদয় স্পর্শ করিল। বিবেকানন্দ কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই—ব্যষ্টি-জীবনে ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিই

তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ডিট্রয়েট্ ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে খৃষ্টীন ইঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হন ও পরে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের দুই বৎসর পরে খৃষ্টীন যতই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার মহত্ব ও গুরুত্বের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি ভারত-পর্য্যটন-নিযুক্তা একটি বন্ধুর চিঠি পাইলেন—বন্ধু তাঁহাকে একবার ভারতে আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। খৃষ্টীন বুঝিলেন, ইহাই অবসর। তিনি ভারতে আসিলেন। বন্ধুর দেশে ফিরিবার সময় আসিল কিন্তু খৃষ্টীন ভারতেই থাকিয়া গেলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে যোগদান করিয়াছিলেন, তৎসূত্রে ভারতে কার্য্য করিবেন, ইহাই ইচ্ছা।

ইউরোপীয় পল্লী পরিত্যাগ করিয়া মার্গারেট, ই, নোবলের সহিত গঙ্গাতীর হইতে অনতিদূরে একটি অর্দ্ধভগ্ন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিস্ নোব্‌ল্ এই সময়ে নিবেদিতা নামে ভারত সংক্রান্ত পুস্তকাদি রচনার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞগণের নিকট সমাদৃতা হইয়াছিলেন। এই কুটীরে অবস্থানকালেই সিষ্টার খৃষ্টীন ও তাঁহার এই সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সহযোগীটি তৎকালীন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সমাধানে অগ্রসর হয়েন।

বিবেকানন্দ ভারতের অতীত প্রশস্তি ও প্রাচীনযুগে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতের দান সম্বন্ধে যেরূপ অবহিত ছিলেন তদ্রূপ তিনি আধুনিকদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ভারতের সমাজোন্নতি বিষয়ী নানারূপ পন্থার উদ্ভাবনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তৎ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় যে কেবল ধ্যান-ধারণা লইয়াই কালযাপন করিবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, সমাজসেবাও তাঁহাদের কর্ম্ম ও সাধনার অঙ্গীভূত হউক, ইহাও তাঁহার শিক্ষা ছিল। কোনও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা

ভারতবর্ষের স্ত্রী-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করাইয়া দিয়া যাইতে ইঁহার আগ্রহ জন্মে। সিষ্টার খৃষ্টীন তন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর এই বিভাগকেই আপনার জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা 'গোঁড়া' হিন্দুগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, সিষ্টার খৃষ্টীনের পক্ষে হিন্দু বালিকা ও বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন কতটা কষ্ট-সঙ্কুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই আমেরিকান্ শিক্ষয়িত্রী ও তাঁহার ইংরাজ সহযোগী দৃঢসংকল্প হইয়াই আসরে নামিয়াছিলেন, ফলে শীঘ্রই ইঁহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মের পরিধির প্রসার করিতে হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীন এখন সত্য সত্যই বাগবাজার বোসপাড়া গলিতে শিক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজমানা। তাঁহাব আমেবিকালব্ধ বিদ্যাদান-প্রণালীব এখানে 'হাতে কলমে' ব্যবহাব করিবার সুযোগ উপস্থিত। যাহাতে আধুনিক শিক্ষা-প্রদাতার পদ্ধতি ও আদর্শ প্রাচ্য মহিলা ও বলিকাগণের "মঠবৎ" নিভৃত অন্তঃপুরের মধ্যেও কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যই ইঁহাদিগকে একজন ভারতবাসীর গৃহ-মধ্যেই এইরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর করিয়াছে। ফলেও তাহাই ঘটিল। ক্রীড়াপদ্ধতি ক্রমে শিক্ষাদান (Kindergarten) অবলম্বনে যে বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত তাহা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ছোট ছোট মেয়ে হইতে বিবাহযোগ্যা বয়সের হিন্দু বালিকা এবং এমন কি, অনেক সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোকগণের দ্বারাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সিষ্টার খ্রীষ্টীন ও সিষ্টার নিবেদিতার কার্য্যপ্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব যে, ইঁহারা দেশীয়গণের অনুকূল ও স্বাভাবিক অবস্থার কিছুমাত্র বিপর্য্যয় করেন নাই। তাহারা যে একটা বিদেশী আবহাওয়ায় বৰ্দ্ধিত হইতেছে, ছাত্রীদিগের এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ কখনও উপস্থিত হয় না। এই বিদ্যালয়ে কাহাকেও তাহার অভ্যস্ত সামাজিক আচার, ধর্ম্মের অনুশীলন অথবা তাহার সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে লওয়াইবার চেষ্টা করা হয় না। বরং তাহাদিগেরই বিভিন্ন

আচার ব্যবহার স্বীকার করিয়া লইয়া সনাতন ভারতীয় আদর্শে সকলকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই শিক্ষয়িত্রী-দ্বয়ও আপনাদিগের জীবনে যতদূর সম্ভব সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সমাজ-বিপ্লব ভারতের দেশীয় শিল্পকর্ম্মাদির প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া তথাকার স্ত্রীলোকগণের জীবন বড়ই অল্প পরিসর করিয়া তুলিয়াছে। এখন ভারতের সকল স্ত্রীলোকই রন্ধনকার্য্যে সুদক্ষা—কিন্তু তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় সীবন ও বয়নাদি কার্য্যে অভ্যস্তা নহেন। তাহাদের অবসর কালের কর্ম্মের অভাব। সিষ্টার খৃষ্টীন এই জন্য সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে নানারূপ সূচী-শিল্প শিখাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। এইরূপে তিলে তিলে এই বিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের অল্প সঙ্গতি নিবন্ধন এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে না পারিলেও ইহার ছোট ছোট ঘরগুলি ও উঠানে এইরূপে যে শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃতি ও প্রভাব শুধু এই প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহার ভাবষ্যত আরও উজ্জ্বল। খৃষ্টীন তাঁহার মধুর স্বভাবগুণেই অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর হইতে ইনি একাকীই এখন এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে এই বিদ্যালয়বাটী শুধু পাঠাগার বলিয়া নহে অপিচ সৌহৃদ্য ও সকল প্রকার সাহায্যের কেন্দ্ররূপে সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ বাগবাজার পল্লীর সকলের নিকট পরিচিত।

ভারতবাসীর সহিত সম্পূর্ণ মিলনের সূত্রে কার্য্য করিতে পারিলেই পাশ্চাত্য মহিলাগণের পক্ষে এদেশের যথার্থ উপকারে আসা সম্ভব, নচেৎ নহে—খৃষ্টীনের ইহাই বিশ্বাস এবং শুধু বিশ্বাস নহে এইরূপ আত্মত্যাগই তাঁহার সাধন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পাণিহাটির মহোৎসবে।

(স্বামী সারদানন্দ)

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট নিবারণের জন্য কিরূপে নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকিবে না'-রূপ বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার পর হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় দারুণ অভাব সংসারে আর কখনই হয় নাই। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরে কলিকাতার চাঁপাতলা নামক পল্লীতে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি মাস কাল তিনি ঐ স্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সাংসারিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতাচরণে নরেন্দ্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সুসময় বুঝিয়া তাহারা পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থানগুলি ছলে বলে কৌশলে দখল করিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে এখন কিছুকালের জন্য ঐ বাটি ত্যাগপূর্ব্বক রামতনু বসুর লেনস্থ তাঁহার মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়ন-

পূর্ব্বক সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃ-বন্ধু, এটর্ণি নিমাই চরণ বসু মহাশয় তাঁহাকে ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার তদ্বিরে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ওকালতি (বি, এল্) পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শিক্ষকতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের অন্য একটি গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল—ঠাকুর এখন রোহিনি (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেন্দ্র, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাতিশয্যে ঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বরফ খাইয়া তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া যাইতে লাগিল এবং সরবৎ পানীয়াদির সহিত উহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক মাস ঐরূপ করিবার পরে তাঁহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হইল। বোধ হয় চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে তিনি ঐরূপ বেদনা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন।

মাসাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন আকার ধারণ করিল—অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার কণ্ঠ-তালুদেশ ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে সামান্য প্রলেপের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কয়েক দিবস ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া গেল না দেখিয়া জনৈক ভক্ত বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারের ঐরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগনির্ণয় করিয়া গলার ভিতরে ঔষধ

বাহিরে লাগাইবার জন্য ঔষধ ও মালিসের বন্দোবস্ত করিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলেন ও বারম্বার সমাধিস্থ না হয়েন তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আগতপ্রায় হইল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্বলন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পরমা সুন্দরী স্ত্রী ও অতুল বৈভব ত্যাগ পূর্ব্বক পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়-মানসে যখন প্রথম শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি তাঁহাকে মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার প্রবল বাসনা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া ইতর সাধারণের ন্যায় বিষয়কার্য্যের পরিচালনা প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও পিতৃব্যকে সাহায্য করিতে থাকেন। ঐরূপে অবস্থান করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কখন কখন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস তাঁহাদিগের পূতসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন। ঐরূপে দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অন্বেষণ করিয়া রঘুনাথ সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে বাস করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামকে প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা বহু ব্যক্তিকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ঐরূপে এক সময়ে পাণিহাটি গ্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া দধি, দুগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলী সহ তাঁহাকে ভোজন করাইতে আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহা সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেই দিন ভাগীরথী তীরে ভোজনদানে পরিতৃপ্ত করেন। উৎসবান্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কাল পূর্ণ হইয়াছে, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন করিলে তিনি তোমাকে এখন আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং ধর্ম্ম-জীবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য সনাতন গোস্বামীর হস্তে তোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন।' নিত্যানন্দ প্রভুপাদের ঐরূপ আদেশে রঘুনাথের উল্লাসের অবধি রহিল না এবং বাটীতে ফিরিবার অনতিকাল পরে তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ চলিয়া যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণ রাখিয়া তদবধি প্রতি বৎসর ঐ দিবস পাণিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া তাঁহার ন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে ঐরূপ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির চিঁড়ার মহোৎসব নামে ভক্তসমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল,' কখন ঐরূপ দেখিস নাই,

চল দেখিয়া আসিবি।" রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদিগের মধ্যে এক-দল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদিগের সন্তোষের জন্য তিনি বলিলেন, "এখান হইতে সকাল সকাল দুইটি খাইয়া যাইব এবং দুই এক ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বলে ঐ বিষয়ে একটু সামলাইয়া চলিলেই হইবে।" তাঁহার ঐরূপ কথায় সকল ওজর আপত্তি ভাসিয়া গেল এবং ভক্তগণ তাঁহার পাণিহাটি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী—আজ পাণিহাটির মহোৎসব। প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয় ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি পৃথক নৌকা ভাড়া হইয়া ঘাটে বাধা রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েক জন স্ত্রীভক্ত অতি প্রত্যূষে আসিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিতা হইয়া তাঁহারা ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ঠাকুরের ভোজনান্তে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জনৈকা স্ত্রীভক্তের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি (মা) যাইবেন কি না। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, 'তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর (মার) ইচ্ছা হয় ত চলুক্।' শ্রীশ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।" শ্রীশ্রীমা যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং দুই তিন জন স্ত্রীভক্ত, যাঁহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর আন্দাজ পাণিহাটিতে পৌঁছিয়া দেখা গেল, গঙ্গাতীরে প্রাচীন অশ্বত্থগাছের চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক সমাগত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থানে স্থানে সংকীর্ত্তনে আনন্দলাভের চেষ্টা করিতেছেন। ঐরূপ করিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবৎ নামগানে যথার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্ব্বত্র একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল। নৌকায় যাইবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরীশ-চন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তসকলে ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কোনও কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি না করেন কারণ, কীর্ত্তনে মাতিলে তাঁহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্য্য হইবে এবং উহাতে গলদেশের বেদনা বৃদ্ধি পাইবে।

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণি বাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর বৈঠকখানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, সোফা, কার্পেটাদি দ্বারা ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত। এখানে দশ পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইঁহাদিগের ঠাকুরবাটিতে ৺রাধাকান্তজীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

বৈঠকখানা গৃহের পার্শ্বেই ঠাকুরবাটী। পার্শ্বের দরজা দিয়া আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ-মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলাম। মূর্ত্তি দুইটি সুন্দর। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। নাট-মন্দিরের মধ্যভাগ হইতে পাঁচ সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চকমিলান প্রশস্ত উঠান ও সদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিদ্যমান যে ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ মাত্রে বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। ঠাকুর যখন প্রণাম করিতেছিলেন তখন এক দল কীর্ত্তন উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্ব্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলা-

স্থলে যত কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিতেছে তাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে এখানে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরে গঙ্গাতীরে আনন্দ করিতে যাইতেছে। শিখা-সূত্রধারী, তিলক-চক্রাঙ্কিত দীর্ঘ স্থূলবপুঃ গৌরবর্ণ প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষ থলিতে মালা জপিতে জপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদস্ত রেলির ঊনপঞ্চাশের থান ধুতি, সুন্দরভাবে গুছাইয়া পরা, এবং ট্যাঁকে একগোছা পয়সা—দেখিলেই মনে হয়, কোন গোস্বামী-পুঙ্গব মেলার সুযোগে দুই পয়সা আদায়ের জন্য সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার জন্য এবং বোধ হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিজ মহত্ত্বে মুগ্ধ করিতে তিনি আসিয়াই কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি নরেন্দ্রপ্রমুখ পার্শ্বস্থ ভক্তগণকে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ঢং ত্যাখ।" তাঁহার ঐরূপ পরিহাসে সকলের মুখে হাস্যের রেখা দেখা দিল এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্ব্বে চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক লম্ফে কীর্ত্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যস্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তিনি কখন অর্দ্ধ বাহ্যদশা লাভপূর্ব্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল

তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটা-ছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রৌদ্র-মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত তাহার আংশিক ছায়াপাতও ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্ম্মিত নহে—বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইয়াছে—এখনি আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না, কীর্ত্তন সম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক শতগুণ উৎসাহ আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির হইল, এখান হইতে কিঞ্চিদধিক এক মাইল দূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া তিনি যে যুগল-বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলার নিত্য সেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্ব্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মণিসেনের ঠাকুরবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তন সম্প্রদায় কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নাম গান করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল, তিনিও দুই চারি পদ চলিয়া

পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি সেরূপ আর কখন নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেব-দেহের সেই অপূর্ব্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের অতদূর পরিবর্ত্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্রে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা-পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।

মণিবাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে আসিবামাত্র কীর্ত্তনসম্প্রদায় তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল শ্রী, মনোহর নৃত্য, ও পুনঃ পুনঃ গম্ভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গান ধরিল—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কে রে
জয় রাধে বলে কে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক বারম্বার 'এই আমাদের প্রেমদাতা' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং যাহারা আসিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা মোহিত হইয়া মহোল্লাসে কীর্ত্তনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবোদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্য কয়েকটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের সহিত যোগদান করিল। ঐরূপে এক বিরাট জনসংঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের কুটীর দিকে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইবার কিছু পূর্ব্বে, একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈক স্ত্রীভক্তের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে প্রেমে গদগদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে প্রদান করিল। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাবাজী স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভঙ্গ হইল এবং মুখে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য থু থু করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক মুখ ধৌত করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তি ও বিদ্রূপের সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে দূরে পলায়ন করিল। ঠাকুর তখন অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

ঐরূপে এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে পৌঁছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসংঘ ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে নৌকায় লইয়া আসিল। কিন্তু এখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোন্নগরনিবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসব স্থলে ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিল। এখন নৌকা মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং কৃপা করুন বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপূর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে স্তব স্তুতিপূর্ব্বক বারম্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! ঐরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য ইতিপূর্ব্বে অনেক বার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এত দিন তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে নাই, অদ্য তল্লাভে কৃতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্ব্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের ন্যায় সাধন ভজন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ত্তনকালে বৃদ্ধ নবচৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। ঐরূপে নবচৈতন্য ঠাকুরের কৃপায় পরজীবনে বহুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিল।

নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদূর আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে নৌকারোহণ করিতেছে এমন সময়ে একব্যক্তির মনে হইল জুতা ভুলিয়া আসিয়াছে এবং উহা আনিবার জন্য সে পুনরায় ঠাকুরের গৃহাভিমুখে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে ঐকথা নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে মনে হইল, নতুবা আজিকার সমস্ত আনন্দটা ঐ ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত!" যুবক ঐ কথায় হাসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন দেখিলি বল দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে—না?" সে ঐ কথায় সায় দিলে তিনি নিজ ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ের উল্লেখ-পূর্ব্বক ছোট নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কেলে ছোঁড়াটা অল্পদিন হইল এখানে আসা যাওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না—এক ঘণ্টার উপর বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না! সে বলে তাহার মন আজ কাল নিরাকারে লীন হইয়া যায়! ছোট নরেন বেশ ছেলে—না? তুই একদিন তাহার বাটীতে যাইয়া আলাপ করিয়া আসিবি—কেমন?" যুবক তাঁহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, 'কিন্তু মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।' ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া ত ভারি একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াটা হীন বুদ্ধির কাজ, ভগবানের পাঁচ ফুলে সাজি—নানা প্রকারের ভক্ত, তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা

বিষম হীনবুদ্ধির কাজ, তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি - কেমন যাইবি ত?" সে অগত্যা সম্মত হইয়া তাহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি কয়েক দিন পরে ঠাকুরের কথা মত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্যার সমাধান লাভপূর্ব্বক ধন্য হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাতায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল।

স্ত্রী-ভক্তেরা সেই রাত্রি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান করিলেন এবং স্নানযাত্রার দিবসে ৺দেবী প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালী-বাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া ঐ পর্ব্ব দর্শনান্তে কলিকাতায় ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের একজনকে বলিলেন, "অত ভিড়—তাহার উপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল—ও (শ্রীশ্রীমা) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত 'হংস, হংসী এসেছে।' ও খুব বুদ্ধিমতী।" শ্রীশ্রীমার অসামান্য বুদ্ধির দৃষ্টান্তস্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'মাড়োয়ারী ভক্ত* যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি! সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, 'ওগো এই টাকা দিতে চাহিছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিছে, তুমি উহা লও না কেন—কি বল?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না, আমি লইলে ও টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না, সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে

* ইহার নাম লছমী নারায়ণ ছিল।

তোমার ত্যাগের জন্য—অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' —ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ্ ফেলিয়া বাচি!"

ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর নিকটে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহা শুনাইলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "প্রাতে উনি (ঠাকুর) আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম উনি মন খুলিয়া ঐ বিষয়ে অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন —হাঁ যাবে বৈ কি। ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক্' তখন স্থির করিলাম যাইবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া সে রাত্রে ঠাকুরের নিদ্রা হইল না। উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চরিত্রের লোক তাঁহার দেব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইত, অপবিত্র অশুদ্ধমনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যপ্রকার সকামভাবে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ-পূর্ব্বক পদধূলী গ্রহণ করিলে ঐরূপ দাহে তিনি অনেক সময়ে প্রপীড়িত হইতেন। পাণিহাটি উৎসবের এক দিন পরে স্নানযাত্রার পর্ব্ব উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আমরা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে পারি নাই। স্ত্রী ভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াছি ঐ দিবস অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে অ—র মা নাম্নী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া তাঁহার আনন্দের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহেন নাই এবং অন্যদিবসের ন্যায় খাইতেও পারেন নাই। পরে, ভোজনান্তে আমাদের পরিচিতা জনৈকা তাহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "এখানে লোক

আসে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া—এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি? মাগি কামনা করিয়া আঁব সন্দেশাদি আনিয়াছে—উহার একটুও মুখে তুলিতে পারিলাম না। আজ স্নান-যাত্রার দিন, অন্য বৎসর এই দিনে কত ভাবসমাধি হইত, দুই তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিত, আজ কিছুই হইল না—নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া উচ্চভাব আসিতে পারিল না।" অ—র মা সেই রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল না। রাত্রিতে আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, এখানে স্ত্রীলোকদিগের এত ভিড় ভাল নয়, মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু এখানে রহিয়াছে—কি মনে করিবে বল দেখি? দুই একজন মধ্যে মধ্যে আসিলে, এক আধ দিন থাকিয়া চলিয়া যাইলে,—তাহা নহে একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক-দিগের অত হাওয়া আমি সহিতে পারি না।" ঠাকুরের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন এবং রজনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। স্নানযাত্রা উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহে পূজা এবং যাত্রাদি হইয়াছিল, তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সে দিন কিছু-মাত্র আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। নিরন্তর উচ্চ ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে কতদূর লক্ষ্য ছিল এবং ভক্তদিগের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদিগকে কিরূপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিষ্টার নিবেদিতা) সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য।

স্বামিজীর চক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যার পর নাই মূল্যবান্ ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষেও বিবাহ বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। ঐ বিষয়ক প্রবৃত্তির স্মৃতি পর্য্যন্ত যাহাতে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল, এবং তিনি কায়মনোবাক্যে আপনাকে এবং নিজ শিষ্যবর্গকে উহার লেশমাত্র আশঙ্কা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিকট অবিবাহিত থাকাটাই একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা লাভের জন্যই সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন না, কিন্তু তৎসঙ্গে পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়েও সদা আকুল থাকিতেন। এই ভয় তাঁহার নিজের আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে যতই সহায়ক বা আবশ্যক হইয়া থাকুক না কেন, উহা অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় নাই।

কিন্তু ইহা যেন সকলে বুঝেন যে, তিনি স্ত্রীলোক হইতে ভয় পাইতেন না, তিনি ভয় করিতেন প্রলোভনকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাকে স্ত্রীলোকদিগের সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার শিষ্য, কার্য্যের সহায়ক, এমন কি, বন্ধু ও খেলার সাথীও ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের এই সকল বন্ধুদিগের সহিত ব্যবহারে তিনি প্রায় সকল সময়েই ভারতের পল্লীগ্রামসমূহের প্রথা অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কোন একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লইতেন। কোন স্থানের মেয়েরা তাঁহার ভগিনী হইল,

কোথাও বা মাতা, কোথাও বা কন্যা, এইরূপ সর্ব্বত্র। ইঁহাদিগের মহত্ত্ব এবং মিথ্যা বা তুচ্ছ ভাবরাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কখনও কখনও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন; কারণ তাঁহার মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠজনোচিত বিশেষত্বটী খুব বেশী পরিমাণে ছিল তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে মহত্ত্ব ও চরিত্রবলেরই অন্বেষণ করিতেন। যেমন তিনি আমেরিকায় দেখিয়াছিলেন, মেযেরা নৌকা চালাইতেছে, সাঁতার দিতেছে, এবং নানাপ্রকার খেলা করিতেছে, অথচ "তাহাদের একবারও মনে পড়িতেছে না যে তাহারা বেটাছেলে নহে" (এগুলি তাঁহার নিজ মুখের কথা)—এ সকলে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। ঐরূপে তাহারা যে পবিত্রতার আদর্শের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইয়াছিল, তিনি সেই আদর্শটীকে পূজা করিতেন।

সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষায় তিনি সর্ব্বদা বিশেষ করিয়া বলিতেন যে, সন্ন্যাসী নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই ভাবিবেন না, কারণ তিনি ঐ দুয়ের পারে গিয়াছেন। যাহা কিছু—এমন কি শিষ্টাচারও—লিঙ্গ-ভেদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়াইয়া দেয়, তাহাই তাঁহার নিকট অতি ঘৃণার্হ বলিয়া মনে হইত। পাশ্চাত্যে যাহা chivalry (মেয়ে-দের প্রতি একটু বেশী সৌজন্য প্রকাশ) নামে অভিহিত, তাহা তাঁহার নিকট স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করা বলিয়া মনে হইত। কোন কোন লেখক যে বলিয়া থাকেন,—মেয়েদের জ্ঞান মোটামুটী রকমের হইলেই হইল, তাহাদিগকে সকল জিনিস ঠিক যেমনটী তেমনি করিয়া জানিতে হইবে না, এবং পুরুষদের জ্ঞানে সহানুভূতির যেন ছড়াছড়ি না থাকে, তাঁহাদের এই মত স্বামিজীর নিকট অতি নীচ এবং উপেক্ষার বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। মানবের অন্তরাত্মা চায় স্বাধীনতা, আমাদের দৈহিক গঠন তাহার উপর যে সকল বন্ধন জোর করিয়া আনিয়া দিয়াছে, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই উচিত উহাদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করা।

নির্জ্জন বাস, সংযম এবং গভীর চিত্তৈকাগ্রতা, এই সকলের

৩

সমবায়ে গঠিত ছাত্রজীবনের আদর্শই ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য শিরায় শিরায় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রবাহিত থাকা চাই!" ছাত্রজীবনের আনুষঙ্গিক যে পাঠ্যবিষয়ের উপর মনঃসংযোগ তাহা তাঁহার চক্ষে, সান্তকে অনন্তের মধ্যে মিলাইয়া দিবার অন্যতম পন্থা মাত্র; এই অনন্তের মধ্যে সান্তকে লয় করাকে তিনি সকল মহৎ জীবনের এরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন যে, উহার জন্য তিনি রোবস্‌পীয়ারকে পর্য্যন্ত তাঁহার গোঁড়ামি দ্বারা বিভীষিকার রাজত্বের (The Terror) সৃষ্টি করা সত্ত্বেও প্রশংসা করিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন। যে কোন কার্য্যে হৃদয়, মন বা শরীরের উচ্চতম শক্তি বিকাশের প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে সরস্বতী পূজা একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন; অবশ্য, সরস্বতীপূজা বলিতে তিনি ভাবরাজ্যে ঠিক ঠিক 'আপনাতে আপনি থাকা' এবং পূর্ণ সংযমকেই লক্ষ্য করিতেন। এরূপ পূজা কুস্তীগীরদিগের উপযুক্ত শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং এই ব্যাপারটীর অর্থই এই যে, যদি কেহ মধ্যে মধ্যে সেই সমাধিলভ্য অন্তর্দৃষ্টির শিখরদেশে আরোহণ করিতে চান, যাহাকে অপরে দিব্য-জ্ঞান, ঐশীপ্রেরণা বা অনন্যসাধারণ দক্ষতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ধর্ম্মের ন্যায়, সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির জন্যও ঐরূপ দিব্যজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। যে লোক এরূপ না করিয়া স্বার্থপর বা নীচ উপায়ে আপনার শক্তি ক্ষয় করিতেছে, সে কখনও রাফেলের ন্যায় অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী আবিষ্কার করিতে পারে না। ধর্ম্মাদর্শের ন্যায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আদর্শ সিদ্ধির জন্যও সন্ন্যাসি-সুলভ নিষ্ঠাভক্তির একান্ত প্রয়োজন। কৌমারব্রত গ্রহণের অর্থই দশের হিতের জন্য নিজের হিত বিসর্জ্জন দেওয়া। এইরূপে স্বামিজী দেখিয়াছিলেন যে, প্রকৃত

মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে সংযম চাই; দেখিযাছিলেন যে, যে কোন পথ দিয়াই হউক, প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে আত্মাকে দেহের প্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করিতেই হইবে, আরও দেখিয়াছিলেন যে, একজন বড় সাধুর ভিতর বড় কর্ম্মী বা রাজ্যের গুণশালী প্রজা হইবারও সামর্থ্য রহিয়াছে। ইহার বিপরীত পক্ষটীর সম্বন্ধে অর্থাৎ উন্নতচরিত্রা পত্নী বা রাজ্যের গুণান্বিত প্রজা কেবল সেইখানেই জন্মান সম্ভবপর, যেখানে ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসীসকল জন্মিতে পারিত—এবিষয়ে তাঁহার ঐরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল কি না বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি নিজে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসকামীদিগের গুরু ছিলেন বলিয়া, একটু আধটু আভাস ছাড়া এই মহাসত্যটীকে ধরিতেই পারেন নাই, অবশেষে মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি ঐবিষয়ের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি একবার বলিযাছিলেন, "একথা সত্য যে, এমন সব স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহাদের দর্শনমাত্র মানব অনুভব করে যে, কে যেন তাহাকে ঈশ্বরাভিমুখে ঠেলিয়া দিতেছে, কিন্তু আবার এমনও স্ত্রীলোক আছে যাহারা তাহাকে নরকের দিকে টানিয়া লইযা যায়।"

তাঁহার নিকটে থাকিলে, যে ভালবাসায় প্রেমাস্পদের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার ইচ্ছাধীন রাখিতে চায়, অথবা নিজের সুখ বা কল্যাণের সাধনমাত্র করিয়া ফেলিতে চায়, সে ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা অসম্ভব ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে, প্রেমকে প্রেমপদবাচ্য হইতে হইলে চিরন্তন কল্যাণের প্রস্রবণস্বরূপ হইতে হইবে। উহা আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দেয়, উহা অহেতুক, এবং প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষারহিত। তিনি যে সর্ব্বদা "অনাসক্তভাবে ভালবাসার" কথা বলিতেন, তাহার অর্থই এই। একবার কোন স্থান দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আমাদের কয়েকজনকে বলিয়াও ছিলেন যে, তিনি এইবার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোন কিছু হইতে মন উঠাইয়া লইবার শক্তিও

যেমন প্রয়োজনীয়, কোন কিছুতে মন লাগাইবার শক্তিও ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়। উভয়ই তৎক্ষণাৎ, পূর্ণমাত্রায়, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্পন্ন হওয়া চাই। আর এদুয়ের প্রত্যেকটী অপরটীর পূর্ণতা সম্পাদন করে। তিনি ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন, "প্রেম সর্ব্বদা আনন্দেরই বিকাশ মাত্র, যখনি উহার উপর দুঃখের এতটুকু ছায়া আসিয়া পড়ে, তখনি জানিতে হইবে, উহা দেহসুখ ও স্বার্থপরতা দুষ্ট হইয়াছে।"

যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য ও হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলায় মানবকে মুখ্যভাবে শরীর বলিয়া মনে করে—যাহা আমরা দখল করিয়া রাখিতে পারি—এবং মাত্র গৌণভাবে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি, মন ও আত্মা বলিয়া মনে করে, সে সাহিত্য ও ললিতকলাকে তিনি স্বপ্নেও কখনও প্রশংসা করিতেন না। আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বাদের (Idealism) সবটা না হইলেও, অনেকটাই তাঁহার নিকট এই ভাব দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত বলিয়া বোধ হইত, এবং উহাকে তিনি "ফুলের আচ্ছাদনে প্রাণহীন শবদেহ লুকাইয়া রাখা" বলিতেন।

প্রাচ্যদিগের ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে, আদর্শ পত্নী হইতে হইলে একমাত্র স্বামীর প্রতি জ্বলন্ত, হ্রাসবৃদ্ধিহীন নিষ্ঠা থাকা চাই। পাশ্চাত্য প্রথাসকলকে তিনি সম্ভবতঃ বহুপতিক (Polyandrous) পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকিবেন, কারণ এতদ্ব্যতীত আমি তাঁহার এই উক্তির কোনই হেতু খুঁজিয়া পাই না যে, তিনি বহুপতিক জাতিসমূহের ভিতরও স্বদেশের ন্যায় মহানুভাবা এবং পূতচরিত্রা রমণী সকল দেখিয়াছেন। তিনি মালবারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিব্বতে নহে; এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে, মালবারে তথা-কথিত বহুপতিক প্রথা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীপ্রাধান্যযুক্ত বিবাহ মাত্র। স্বামী পত্নীর পিত্রালয়ে যাইয়াই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, এবং বিবাহও যে ভারতের অন্য সকল স্থানের ন্যায় আজীবন স্থায়ী হইবেই, তাহার কোন মানে নাই; কিন্তু দুইজন পুরুষ একই

সময়ে সমপদস্থরূপে পরিগৃহীত হয় না। যাহাই হউক না কেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, "দেশাচার কিছুই নহে",—আচার ব্যবহার কোনকালে মানবের বিকাশকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না। তিনি জানিতেন যে, যে কোন দেশে, যে কোন জাতির মধ্যে আদর্শটী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া পূর্ণভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে।

তিনি কখনও কোন সামাজিক আদর্শকে আক্রমণ করিতেন না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড প্রত্যাগমনকালে, তথায় নামিবার দুই এক দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে আমি যেন ইউরোপের সামাজিক আদর্শগুলিকে পুনরায় গ্রহণ করি—যেন আমি উহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করি নাই, এমন ভাবে। *ইউরোপ বা আমেরিকায় বিবাহিতা রমণীগণ তাঁহার নিকট অবি-*বাহিতা রমণীগণ অপেক্ষা কম সম্মান পাইতেন না। ঐ সমুদ্রযাত্রা-কালে, জাহাজে, কতকগুলি পাদ্রি কয়েকগাছি রৌপ্যনির্ম্মিত বিবাহ-বলয় সকলকে দেখাইতেছিল, ঐগুলি দুর্ভিক্ষের দারুণ সঙ্কটকালে তাহারা তামিল রমণীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। কথায় কথায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কুসংস্কারবশতঃ অঙ্গুলি বা মণিবন্ধ হইতে বিবাহ-অঙ্গুরী বা বিবাহ-বলয় খুলিয়া দিতে আপত্তি করিয়া থাকে, এই কথা উঠিল। শুনিয়াই স্বামিজী সবিস্ময়ে খেদপূর্ণ অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'তোমরা উহাকে কুসংস্কার বলিতেছ? উহার পশ্চাতে যে মহান্ সতীত্বের আদর্শ রহিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?"*

কিন্তু বিবাহ দ্বারা আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের

* সতীত্ব বলিতে হিন্দুগণ ইহাই বুঝেন যে পত্নীর স্বামীতে শুধু নিষ্ঠা থাকিবে তাহাই নহে, সে নিষ্ঠার কখনও এতটুকু ইতর বিশেষ হইবে না। এই আদর্শ আমার ভাল লাগিতেছে না বলিয়া ঐ নিষ্ঠাকে এতটুকু এদিক ওদিক করিবার যো নাই।

কতকটা সহায়তা হয়, তাহা দেখিয়াই তিনি উক্ত সংস্কারটীর গুণাগুণ বিচার করিতেন। এখানে স্বাধীনতা শব্দটী প্রাচ্যদেশীয় অর্থে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উহাতে কোন কিছু করিবার অধিকার বুঝাইতেছে না, কোন কিছু করিবার ইচ্ছাটাকে দমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকার অধিকারই বুঝাইতেছে—যে নৈষ্কর্ম্ম্য সকল কর্ম্মের পারের অবস্থা তাহাই উহার লক্ষ্য। তিনি একদিন তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াছিলেন, "বিবাহের পারে যাইবার জন্য বিবাহ করা—ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।" তাঁহার গুরুদেবের, তাঁহার ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দের এবং তাঁহার শিষ্য স্বরূপানন্দের যে প্রকার বিবাহ হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার বিবেচনায় আদর্শ বিবাহ। এইরূপ বিবাহ অন্য দেশে হইলে নামমাত্র বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "দেখিতেছ, এই বিষয়ে ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের কি পার্থক্য রহিয়াছে? পাশ্চাত্যে বিবাহ বলিতে আইনের বন্ধনের পরের যাহা কিছু শুধু তাহাই বুঝায়, কিন্তু ভারতে লোকে বিবাহ বলিতে ইহাই বুঝিয়া থাকে যে, সমাজ দুইটী প্রাণীকে অনন্তকালের জন্য একটী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিল। ঐ দুইটী প্রাণীকে তাহাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জন্মে জন্মে পরস্পরকে বিবাহ করিতেই হইবে। উভয়ের প্রত্যেকেই অপরের কৃত শুভাশুভের অর্দ্ধাংশের ভাগী হয়। আর যদি এক জন এ জীবনে অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অপরকে, যত দিন না সে পুনরায় তাহার নাগাল ধরিতে পারে, ততদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।"

শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহকে মাত্র কয়েক জনের সেবা এবং সন্ন্যাসকে জগতের সেবা বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন। এরূপ স্থলে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকারের বিবাহের কথাই বলিতেন বলিয়া বোধ হয়। স্বামিজীর নিজের মনেও যে, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের মূল ধারণা ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি লোককে এমন ভাবে ঐ ব্রত

গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেন, যেন তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্কর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে আচার্য্যের পশ্চাতে যেন "একদল সৈন্য" বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং যে আচার্য্যের শিষ্যগণ সকলেই গৃহস্থ ও সংসারী, তাঁহার সৈন্য নাই, এই কথা বলিতেন। যে পক্ষে এই সহায় বর্ত্তমান, আর যাহাদের মধ্যে ইহার অভাব, এই দুইয়ের মধ্যে বল সম্বন্ধে তুলনাই হয় না, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল।

তথাপি বিবাহ যে অনেকের পক্ষে একটী পথ, একথা তিনি যে মোটে বুঝিতেন না, তাহা নহে। তিনি এক বৃদ্ধ দম্পতির যে গল্প বলিয়াছিলেন তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। পঞ্চাশ বৎসর একত্র বাসের পর তাহারা দরিদ্র-নিবাসের (Work house) দরজায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথম দিনের অবসানে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কি! মেরী নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার আমি তাঁহাকে দেখিতে ও চুম্বন করিতে পাইব না? আমি যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে ঐরূপ করিয়া আসিয়াছি।" তাহার ঐ মহৎ কার্য্যের কথা ভাবিয়া স্বামিজী অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন "একবার ভাবিয়া দেখ! একবার ভাবিয়া দেখ! এরূপ সংযম ও নিষ্ঠার নামই মুক্তি। ঐ দুইটী প্রাণীর পক্ষে বিবাহই প্রশস্ত পথ হইয়াছিল।"

তিনি বরাবর সমান দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। একবার একটী বালিকা, যাহার ধর্ম্মজীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগ দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার বাটীর লোকদিগের বিবাহ-প্রস্তাবসমূহের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনিও তাঁহার পিতাকে এ বিষয়ে রাজী করিয়া, এবং ঐরূপ করিলে তিনি কনিষ্ঠ কন্যাদিগের জন্য অধিক যৌতুকের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এইরূপ বুঝাইয়া বালিকাকে এবিষয়ে সাহায্য

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর অনেক বৎসর চলিযা গিয়াছে, কিন্তু সে যে জীবন অবলম্বন করিয়াছিল, তৎপ্রতি তাহার এখনও তেমনি নিষ্ঠা রহিয়াছে,—প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা ঐ জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীরাও এক্ষণে সকলে বিবাহিতা। এরূপ উচ্চভাবসম্পন্ন স্ত্রীলোকের জোর করিযা বিবাহ দেওয়া তাঁহার চক্ষে মহা গর্হিত আচরণ বলিয়া বোধ হইত। তিনি গর্ব্বসহকারে, হিন্দুসমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগেরই স্থানীয, তাঁহাদিগকে এইরূপে গণনা করিতেন—যাঁহারা বালবিধবা, যাঁহাবা কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী, যাঁহাদের বিবাহকালে পিতা মাতা কোনরূপ যৌতুক দিতে পারেন নাই. এমন দুই চারি জন, ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন যে, বিধবাগণের সতীত্বরূপ স্তম্ভের উপরই সামাজিক অনুষ্ঠানসকল দণ্ডায়মান। কেবল তিনি ইহাই ঘোষণা করিতে চাহিতেন যে, এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগেব ন্যায় পুরুষদিগের জন্যও ঠিক সমান উচ্চাদর্শ থাকা উচিত। প্রাচীন আর্য্যদিগের এরূপ প্রথা চলিবে, বিবাহকালে একটী অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্র ঐ অগ্নির পূজা করিতেন। এই অনুষ্ঠানটী হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও দাযিত্ব সমান। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে সীতারও যেমন রামের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, রামেরও সীতার প্রতি তেমনি নিষ্ঠা বর্ণিত আছে।

বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী)

(কর্ম্মকাণ্ড)

ব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতাই, বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ। তবে কেবল মায়াবিলসিত জগতের জন্যই উপদিষ্ট হওয়ায়, সমাজের কল্যাণার্থে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ—"শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই; অগ্নিষ্টোম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই করিবেন; ক্ষত্রিয়ই রাজসূয়ের অধিকারী" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বর্ণ-ভেদে অধিকারী স্থির করায় সেই সেই স্থিরীকৃত বর্ণ ব্যতীত অন্যের অধিকার না থাকিলেও, যখন গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন অবশ্য বর্ণোচিত গুণলাভ করিতে পারিলেও অধিকার আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টংগুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" অর্থাৎ আমি যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তখনকার ব্যক্তি-গত গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে—চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দৃষ্টে নহে; যেহেতু, তখন অর্থাৎ "আদিতে বর্ণও একমাত্র ছিল।" (ভাগবত, ৯ম স্কঃ, ১৪শ অঃ) গৌতম সংহিতাতেও দেখা যায়—"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ"॥ অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্। উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥ ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ জিতাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র; যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাস রত ও দান্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন; হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে—গুণই কল্যাণকারক, চণ্ডালও সচ্চরিত্র

হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। আবার মহাভারতে বনপর্ব্বের চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে আছে—"পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াষক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়; আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। সুতরাং গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে—বর্ণানুসারে নহে। পূর্ব্বে সেই জন্যই উচ্চবর্ণস্থ হীনগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা নীচ বর্ণে নিক্ষিপ্ত, এবং নীচবর্ণস্থ সদ্‌গুণশালী পুরুষেরা উচ্চবর্ণে উন্নীত হইত। শূদ্র কুলোৎপন্ন বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, ব্যাস; ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র, বিশ্বামিত্র ঋষ্যাদি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব এবং অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ. কর্ণাদি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা শূদ্র-মধ্যে পরিগণিত হইত—"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" অতএব বর্ণভেদ সত্ত্বেও যখন গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন আর বর্ণভেদকে গুণভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলে শাস্ত্র, যুক্তি—এমন কি, প্রত্যক্ষেরও অপলাপ করা হয়। বর্ণভেদ সত্ত্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার হয় দেখিয়াই, মহাভারতের বনপর্ব্বে একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন—

"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে; যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশীয় হইলে যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে উহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" বাস্তবিক বর্ণভেদ দ্বারা কোন মতেই গুণকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করা যায় না বলিয়াই, অর্থাৎ

একবর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া, মনু মহাশয় বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়; ক্ষত্রিয় শূদ্র, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়; বৈশ্য শূদ্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়।—"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াত্তজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥" কারণ, বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ-ব্যভিচার না হওয়া। কিন্তু যখন বর্ণভেদ সত্ত্বেও তাহার অসদ্ভাব নাই, তখন গুণানুসারে অধিকার দেওয়া না হইলে বর্ণভেদের কোন অর্থই থাকে না। তবে বর্ণভেদই উক্ত ব্যভিচার দোষ নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া, গুণলাভ সত্ত্বেও গুণোচিত বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার দিলে ঐ একই দোষ রহিয়া যায় দেখিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ কেবল বর্ণভেদেই অধিকারী স্থির করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা এরূপ বলা হয় নাই যে, গুণানুসারে বর্ণাধিকার নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে "সত্যকামের আত্মবিদ্যা" হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণানুসারে বর্ণাধিকার নিষেধ করেন নাই; কেবল বর্ণানুসারে কর্ম্মাধিকারই নিষেধ করিয়াছেন। যথা—"জবালা-তনয় সত্যকাম বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরুগৃহে বাসেচ্ছায় জননীকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে জবালা বলেন, আমি যৌবনাবস্থায় অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি; সে কারণ আমি তোমার গোত্র জানিনা। তবে এইমাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম। অনন্তর সত্যকাম হরিদ্রুমানের তনয় গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করায়, গৌতম গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। অজ্ঞাতগোত্র সত্যকাম জননীপ্রমুখাৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন অকপটে তাহাই বলায়, গৌতম প্রীত হইয়া বলেন—বৎস, তুমি যখন সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব—তুমি সমিধ আহরণ কর। এই বলিয়া গৌতম ঋষি সত্যকামকে উপনীত করিয়া তদনন্তর অধিকার প্রদান করেন।" অর্থাৎ দ্বিজবর্ণত্রয়

কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে ;—"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥" সুতরাং দাসীপুত্র সত্যকামও শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকায় গুণোচিত বর্ণে অধিকার থাকিলেও, উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত করতঃ সেই বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার নাই দেখিয়া গৌতম ঋষি উপনীত করিয়াছিলেন। অনেকে শ্রুতির "নৈতদব্রাহ্মণো"—অব্রাহ্মণ কখনই এরূপ সত্য কথা বলিতে পারে না—এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুই দুই দোষ হয়। অর্থাৎ শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিলে শ্রুতহানি দোষ এবং যে অর্থ শব্দের শক্তিতে লভ্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুতকল্পনা দোষ হয়। বাস্তবিক সত্যকামের যখন গোত্রসম্বন্ধে কিছুই শুনা যায় না, কেবল সদ্‌গুণের পরিচয়েই উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আর শ্রুতবিষয় অর্থাৎ সদ্‌গুণ ছাড়িয়া অশ্রুতবিষয় অর্থাৎ গোত্র কল্পনা করা উচিত হয় না। আর গৌতম ঋষিও যখন সত্যকামকে "কিং গোত্রোন্থ সৌম্যাসীতি"—সৌম্য! তোমার গোত্র কি? এই বাক্য দ্বারা সত্যকামকে গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য তিনিও সত্যকামের গোত্র জানিতেন না। ফলকথা যখন আদিতে বর্ণভেদ ছিল না, পরে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে, তখন আর সত্যকাম স্বীয় সদ্‌গুণের পরিচয়ে ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত না হইবেন কেন? অর্থাৎ যখন গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণবংশ না হইলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যার্থী সত্যকামকে যখন ব্রহ্মবিদ্যার্থই উপনীত করা হইয়াছিল এবং সত্যকামও ব্রহ্মবিদ্যারই অনুশীলন করিয়া-

ছিলেন, তখন জ্ঞানাধিকারের কথা কর্ম্মাধিকারে কেন। সুতরাং তদুত্তরে বলা যায়—কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে, উপনয়ন-সংস্কার ও বর্ণভেদের অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যেমন যজ্ঞোপবীত ভিন্ন যজ্ঞে এবং স্ববর্ণোচিত যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্য বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে সেরূপ নহে। জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যে, উপনয়ন-সংস্কার এবং বর্ণভেদের আদৌ অপেক্ষা নাই, তাহা আমরা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর আলোচনায় দেখিতে পাইব। তবে গৌতম ঋষি যে সত্যকামকে উপনীত করিয়াছিলেন তাহা কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণে ও ব্রাহ্মণবর্ণোচিত যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার দেওয়ার জন্য। তাই ছান্দোগ্যোপনিষদোক্ত "উপকোশলের আত্মবিদ্যা"য় দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যকাম, সাগ্নিক ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞাগ্নির পরিচর্য্যা এবং আচার্য্যের কার্য্যাদি করিতেছেন। আর পূর্ব্বেও এই জন্যই বলা হইয়াছে—সত্যকাম ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে অশক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যাগযজ্ঞাদির বিধান হওয়ায় এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতানুসারে প্রবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে প্রবৃত্ত্যনুসারে বর্ণভেদের এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়কে পরিচিত করিবার জন্য উপনয়নসংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে তাহা নাই। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—"একমেবাদ্বিতীয়ম্;" এবং তাহাও কেবল নিবৃত্তিমার্গীয় পথিকদের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিবৃত্তির ভাবও অদ্বৈত বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারীদের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় উপনয়ন এবং বর্ণভেদের প্রয়োজন নাই। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যে কেবল উপনয়ন-সংস্কার এবং বর্ণভেদেরই অপেক্ষা আছে, তাহা নহে; দেবতা ও গোত্র না থাকিলেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই দেবতাদের দেবতা ও উপনয়ন না থাকায়, এবং ঋষিদের ঋষি

অর্থাৎ গোত্র না থাকায় কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার নাই। ঐ স্থলে "অধিকার নাই" না বলিয়া, প্রয়োজন নাই বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ চিত্তশুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির আবশ্যক; কিন্তু দেবতা ও ঋষিদের যখন তাহার অভাব নাই তখন অবশ্য প্রয়োজনও নাই। তাই লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—জ্ঞানামৃত-পরিতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মে প্রয়োজন কি?—"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কর্ম্মণা প্রজয়া চ কিম্।" অতএব আমরা দেখিলাম যে গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হওয়ায় গুণলাভ করিতে পারিলে গুণোচিত বর্ণে অধিকার আছে বটে, কিন্তু উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। তাই "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" অর্থাৎ দুষ্কুল হইতে গুণবতী স্ত্রী গ্রহণযোগ্য হইলেও স্ত্রীলোকের উপনয়ন-সংস্কার না থাকায় বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে আদৌ অধিকার নাই। এক্ষণে চিন্তার বিষয় এই যে, গুণলাভ করিতে পারিলে যখন গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইয়া থাকে, তখন অবশ্য "উপনয়ন ব্যতীত অধিকার নাই" বলিলে, তাহাকে সাহসোক্তিই বলিতে হয়। বাস্তবিক গুণলাভ হইলে, গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইয়া থাকে; কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তাই জমদগ্নি, জামদগ্ন্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী। আবার ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণলাভ করিয়াছিলেন। ফল কথা—গুণভেদেই অধিকারী ভেদের পরমার্থতঃ কারণ; তবে ব্যবহারিক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়ায় বর্ণাদি ব্যবহারিক মাত্র।

(জ্ঞানকাণ্ড)

আমরা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তত্ত্বতঃ গুণভেদই অধিকারী ভেদের কারণ—আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে কেবল ব্যবহারিক কল্যাণোদ্দেশ্যেই আদিষ্ট হওয়ায় সত্যতঃ কারণ না হইলেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ব্যবহারিকভাবে উপনয়ন ও বর্ণাদিকে কারণ বলিয়াছেন;

এবং তাত্ত্বিক-কারণ সত্ত্বেও ব্যবহারিক-কারণ ব্যতীত অধিকার না দেওয়ায় ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে মুখ্য এবং পারমার্থিক কারণ গৌণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ-ব্যভিচার না হওয়া। সুতরাং সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তমঃ ও তমোঃগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না রাখিলে, এবং বর্ণভেদ সত্ত্বেও এক বর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা আছে দেখিয়া, অর্থাৎ উক্ত বর্ণাদিও তত্ত্বতঃ গুণভেদের কারণ নহে বলিয়া, গুণানুসারে বর্ণাধিকার দেওয়া না হইলেও উক্ত ব্যভিচার দোষ রক্ষিত হয় না। কাযেই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ উভয়কেই কারণ বলিয়াছেন; এবং গুণানুসারে বর্ণাধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার দেওয়া হইলে বর্ণভেদের অভাব হেতু সেই পূর্ব্ব দোষই থাকিয়া যায় দেখিয়া বর্ণভেদকেই মুখ্য কারণ বলিয়াছেন। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ওরূপ বলিবার শক্তিও আছে। কারণ গুণলাভ হইলে গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইতে থাকিলেও তদ্দারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; যেহেতু, যজ্ঞাদি একমাত্র বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে ওরূপ নিষেধ সঙ্গত হয়; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণ ব্যতীত বর্ণ, উপনয়ন, দেবতা ও গোত্রকে অধিকারী ভেদের কারণ বলা যায় না—বলিলেও তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি, একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ; এবং উক্ত বেদাধ্যয়নও উপনয়ন সাপেক্ষ। সুতরাং গুণ সত্ত্বেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন ব্যতীত যজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই আদৌ উপনয়ন-সংস্কার না থাকায়, গুণ সত্ত্বেও স্ত্রীজাতির কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে অনধিকার প্রযুক্ত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র বৈরাগ্য-সাপেক্ষ—বৈরাগ্য ব্যতীত শত অধ্যয়নেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ-সনৎকুমার-সম্বাদে দেখা যায়—দেবর্ষি নারদ চারি বেদ প্রভৃতি সমুদয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারিয়া ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বাস্তবিক বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের একমাত্র কারণ। তবে বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে শুভ প্রাক্তন বশতঃ দৈবাৎ কোন সৌভাগ্যযুক্ত পুরুষের সংসারের অনিত্যতা অনুভব হইয়া আসিলে তদনন্তর শম দমাদির সাধন দ্বারা বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদাধ্যয়নকেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের কারণ বলা যায় বটে; কিন্তু যাবৎ না বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাবৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। আবার, কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত শমদমাদির সাধন দ্বারাও বৈরাগ্য লাভ করিবার উপায় নাই; কারণ সংসারে জন্ম কর্ম্মক্ষয়ের জন্য; সে কারণ কর্ম্মক্ষয় না হইলেও বলপূর্ব্বক শমদমাদির সাধন করিতে যাইলে সঞ্চিত-কর্ম্ম ক্ষয়িত না হওয়ায় মুক্তিলাভ ত দূরের কথা, পরন্তু ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদিরূপ কঠোর কার্য্যে মৃত্যু হওয়াই সম্ভব। তাই আচার্য্য শঙ্কর তদীয় বিবেক-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ। মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণমাত্রতা" —বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে শমাদি সম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা কল্পনা মাত্র হইয়া থাকে। অতএব, যাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনার ফলে স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম বিদ্যালাভের যথার্থ অধিকারী বলিয়া, বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যালাভের একমাত্র কারণ। আরও আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রটীর ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন—বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই মানুষের ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় এবং কৃতকার্য্যও হয়। বাস্তবিক, মনোবৃত্তির পরমোপশান্তির নামই মুক্তি বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য। তাই পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

সুতরাং বৈরাগ্যোদয়ে স্বতঃই সাধন চতুষ্টয় আয়ত্তীকৃত হইতে থাকিলে ক্রমে যখন "বশীকার" অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকে না, তখন স্বতঃসিদ্ধ মনোলয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া একমাত্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারী; এবং বৈরাগ্যের চরম অবস্থায়, অর্থাৎ "পর বৈরাগ্য" উপস্থিত হইলে স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে

* কোন্ বস্তু নিত্য, কোন বস্তু অনিত্য, তাহা বিবেচনা করা; ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য উৎপাদন করা; আত্মাতে শমদমাদি ছয় প্রকার গুণের উদ্রেক করা; এবং মুমুক্ষা। এই চারি প্রকার আত্মব্যাপারের নাম সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারী।

নিত্যানিত্য বিচার—একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত যাহা কিছু আছে সমুদয়ই অনিত্য—এই জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করা।

বৈরাগ্য—বৈরাগ্য সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মতটী সমীচীন বোধ হওয়ায়, এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল "দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিঃস্পৃহ হইতে পারিলে, 'বশীকার' নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়। ইহা আবার অবস্থাভেদে চারি প্রকার। যথা - প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয় ও চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান; অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন অনুরাগই বা সজীব থাকিল তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টার নাম ব্যতিরেক; ক্রমে যখন চিত্ত আর কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্যমাত্র জন্মে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয়; এবং যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না, তখন তাহাকে বশীকার কহে; আর যখন বশীকার দৃঢ় হয়, তখন তাহা পরবৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যই নির্ম্মল জ্ঞানের চরম সীমা বা মুক্তি। তাই পতঞ্জলি বৈরাগ্য বলিতে বশীকারকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

শম—অন্তরেন্দ্রিয় যে মন তাহাকে বশীভূত করা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয়ে মনের গতিরোধ করা।

দম—চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গণকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয়রাশি হইতে নিবৃত্ত করা।

উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্র অধিকারী ভেদের কারণ নহে। কারণ, 'যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্।" অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করে না, সে তাহার কারণ। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে যখন স্বতঃই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে—কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তখন আর গুণ অর্থাৎ বৈরাগ্য ভিন্ন অন্য কোন কিছু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম ও উপকোশলের আত্মবিদ্যায় দেখা যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিলে সত্যকাম ও উপ-কোশলের আপনা হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল। আর বাস্তবপক্ষে কথাও তাই। কারণ, জীবই ব্রহ্ম, কেবল চিত্ত-মালিন্য হেতু তাহা জানিতে পারা যায় না, সুতরাং পরবৈরাগ্যের উদয় হইলে উক্ত মালিন্য একেবারে দূর হওয়ায় তখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এক্ষণে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যখন ব্রহ্মকে "ঔপনিষদং পুরুষং"—উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ বলিয়াছেন, তখন উপনিষদ্ ব্যতিরেকে স্বতঃই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় বলিলে তাহাও শ্রুতিবিরোধী হয়। বাস্তবিক উহা শ্রুতি-বিরোধী নহে। কারণ, উপনিষদ্ শব্দের অর্থ—আত্মবাণী। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং

উপরতি—বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়া; অথবা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করা। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ অর্থে—বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কর্ম্মত্যাগ হয়; নচেৎ বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কখনই বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ নহে।

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, মানাপমান ও শোক হর্ষ প্রভৃতি দ্বন্দসহিষ্ণুতা; অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া।

সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তের একতানতা উৎপাদন।

শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

মুমুক্ষা—মুক্ত হইবার ইচ্ছা। ইহাই সাধন-চতুষ্টয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য।

স্বাম্” এই আত্মাকে উপনিষদাদি অধ্যয়ন দ্বারা, সুতীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না; কিন্তু এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন আত্মা তাঁহারই নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিবার ঐকান্তিক বাসনা জন্মিলে স্বীয় আত্মা হইতেই আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় নিগূঢ় রহস্যসকল জানিতে পারা যায় সুতরাং তখন স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মা-কর্তৃক বরিত না হওয়ায় উপনিষদ্ প্রভৃতি বহুবিধ অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াও নারদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নাই, কিন্তু সত্যকাম ও উপকোশল উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলেও, আত্মাকর্তৃক বরিত হওয়ায় স্বয়ংই তত্ত্বদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদ্বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় দেববাণীতে বলিয়াছেন—“নিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্তখনিস্বরূপ—ভূত ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা।” অতএব, গুণলাভ হইলে যাহা স্বতঃই আসিয়া থাকে, সে বিষয়ে আর উপনয়ন বর্ণ, দেবতা ও গোত্রের অপেক্ষা আছে বলা যায় না,—বিশেষতঃ যখন স্ত্রীলোক হইয়াও মৈত্রী ও গার্গী, শূদ্র হইয়াও বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ, দেবতা হইয়াও ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ঋষি হইয়াও গৌতম ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আবার কঠোপনিষদে দেখা যায় যম নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণই অধিকারী ভেদের কারণ, আদৌ উপনয়নাদি কারণ নহে। তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—“সখে উদ্ধব! তুমি এই ব্রহ্মরাজ্য দাম্ভিক, নাস্তিক ও শঠকে, কিম্বা শ্রবণ করিতে

অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্ব্বিনীতকে দান করিও [illegible]; পরন্তু শ্রদ্ধালু শূদ্র এবং স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে।"

কেহ কেহ বলেন, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই হেতু শূদ্র হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণজন্মের জ্ঞান অনিবার্য্য বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ শূদ্রজন্মে ওরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে এটী কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, বেদান্তের "তদন্তরপ্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" সূত্রটীর শাঙ্করভাষ্যে দেখা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষদের "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি"—অর্থাৎ যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে তদ্রূপ জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে—এই বাক্যটীর সহিত স্বীয় ভাষ্যের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"জীব মরণকালে এতদ্দেহেই ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক জ্ঞান লাভ করতঃ প্রয়াণ করে, মরণযন্ত্রণা তাহার এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়।" তাই ভগবান্‌ও বলিয়াছেন "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" অর্থাৎ জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সুতরাং বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধের ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অবিচ্ছিন্নভাবে শূদ্রজন্মে হওয়া শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক। অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও মৃত্যুকালে শূদ্রোচিত কর্ম্মাশয়ের প্রাবল্য হেতু শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় তখন আর ব্রাহ্মণ্যভাবের সম্পর্ক বা লেশমাত্র ছিল না; আবার যখন সম্পূর্ণরূপে শূদ্রভাবাপন্ন হইলেও তজ্জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য শূদ্রজন্মেই ব্রহ্মণ্যভাবের কর্ম্মাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া মুক্তি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল

বুঝিতে হইবে। অতএব, কর্ম্মাশয় যখন আদৌ সামাজিক জাতিভেদের অপেক্ষা করে না, তখন অবশ্য "শূদ্রজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা ব্রাহ্মণজন্মে করা যায়," এরূপ বলিলে তাহা ভুলই। আরও, জীবের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥" হে ভারত, ভূত সকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়া তাহা জানা যায় না, কেবল মধ্য ব্যক্ত বলিয়া জানা যায়; অতএব, তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি? সুতরাং "বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন" বলিলে, তাহা সাহস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ফল কথা, যখন দেবতা হইতে কীট পতঙ্গ—এমন কি, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সদসৎ কর্ম্মগুণে উচ্চ নীচ যোনিতে গমন করিয়া থাকে, তখন আর শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নহে; কাজেই শূদ্রজন্মের জ্ঞান ব্রাহ্মণজন্মে ঐরূপ অনিবার্য্য হইলে আর উপরোক্ত আপত্তির প্রামাণ্য থাকে না। বাস্তবিক কর্ম্মাশয় অর্থাৎ গুণকর্ম্ম আদৌ দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে না—তাহা কোন্ সময়, কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় কোন্ ফল দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"—কর্ম্মের গতি বা প্রভাব অতীব গহন। আমরা যে এইমাত্র অতি উচ্চবর্ণের মধ্যেও অসদ্ভাবাপন্ন এবং অতি নীচবর্ণের মধ্যেও সদ্‌গুণশালী ব্যক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহার কারণ কি? তাহার কারণই—কর্ম্মাশয়। কেহ কেহ ইহাকে দৈব বলেন। বস্তুতঃ দৈবও প্রাক্তন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিয়া কর্ম্মাশয়কেই দৈব, অপূর্ব্ব এবং অদৃষ্ট প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তদ্দেহেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার কত শত সহস্র যোগী এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহার প্রভাব বা গতি

বাস্তবিকই অতীব গহন। অতএব শুভাশুভ কর্ম্মাশয় যখন আদৌ জাতিভেদের অপেক্ষা করে না, এবং বৈরাগ্য নামক পরম কল্যাণকর কর্ম্মাশয় উদিত হইলে যখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে জাত্যাদি অধিকারীভেদের কারণ নহে। বাস্তবিক উপনয়ন ও বর্ণভেদাদি কেবল কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের জন্য নহে। কারণ, পরমতত্ত্বদর্শী ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম দ্বারা মানবজীবন চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তদুপযোগী গ্রন্থ-চতুষ্টয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহীর জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থীর জন্য আরণ্যক ও সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই মূলভাব ভিন্ন জীবের অন্য ভাব না থাকায়—বেদকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুই কাণ্ডে বিভাগ করতঃ সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অর্পণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ব্যবহারিক হিত এবং জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা পারমার্থিক হিতসাধন করিয়াছেন। সুতরাং যাহা পারমার্থিক সৎ তাহাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া, কেবল পারমার্থিক-কারণ গুণই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে অধিকারীভেদের কারণ—আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে ব্যবহারিক হিতার্থ উপদিষ্ট হইলেও, গুণই বস্তুতঃ অধিকারী ভেদের কারণ বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ, গুণকেও কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মাদির বাহিরে অর্থাৎ অরণ্যে পঠিত এবং একমাত্র প্রবৃত্তিসম্বন্ধরহিত অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, পারমার্থিক হিতোপদেষ্টা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ তাহা বলিবেন কেন? আর সেই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ বক্ষ্যমাণরূপে অধিকারী স্থির করিয়াছেন;—"শান্ত, দান্ত, বিষয় হইতে উপরত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করিবে।" অপিচ "যে ব্যক্তির চিত্ত শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, বহিরিন্দ্রিয়সকল বশীভূত

হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনোদোষসকল দূরীভূত হইয়াছে, যে আপনাতে সদ্‌গুণচতুষ্টয় আধান করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, তবে তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবে।" বাস্তবিক জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যদি উপনয়ন ও বর্ণাদি অধিকারী ভেদের কারণ হইত, তাহা হইলে জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণোল্লেখ করতঃ উক্ত বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তির কথা না বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় বর্ণোল্লেখই করিতেন। অতএব, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে গুণই অধিকারী ভেদের একমাত্র কারণ; উপনয়ন ও বর্ণাদি গৌণ-ভাবেও কারণ নহে।

আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের আরণ্যক বান-প্রস্থীর জন্য এবং উপনিষদ্ সন্ন্যাসীর জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ কেবল সংসারত্যাগী অরণ্যাশ্রয়ীদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া একমাত্র অরণ্যাশ্রমেই পাঠ্য। আর সেই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের একটী সার্থক নাম আছে আরণ্যক। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।"—ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গার্হস্থ্যান্তে বানপ্রস্থী হইবে, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা করিবে; যদি ব্রহ্মচর্য্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবে; অথবা গার্হস্থ্য হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবে।" যদিও শ্রুতি ক্রমান্বয় আশ্রমত্রয়ের কার্য্য শেষে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন বটে, তথাপি বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকার নাই। তাই শ্রুতি "বনাদ্বা" বাক্যে বানপ্রস্থীকেও বৈরাগ্য জন্মিলে তবে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক বৈরাগ্য জন্মিলে "উপরতি"র প্রাবল্যে স্বতঃই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা আসিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা আর অপরাশ্রমের কার্য্যাদি যথাবিধি সম্পাদিত না হওয়ায় প্রত্যবায় আছে বলিয়া শ্রুতি বৈরাগ্যবানকেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, সন্ন্যাসাশ্রমে বিধিপূর্ব্বক

কর্ম্মানুষ্ঠান নাই; বরং বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে আর তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা যথাবিধি কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি একমাত্র বৈরাগ্যবান্‌কেই প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। যথা -"অথ পুনরেব ব্রতী বাঽব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিবনগ্নিকোবা।"—অনন্তর ব্রতাচারী হউক, অব্রতাচারী হউক, স্নাতক হউক, অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক, অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবে। "অথ পরিব্রাট্‌ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি।" অনন্তর প্রব্রজ্যা গ্রহণ, বিবর্ণ বস্ত্র পরিধান মস্তক মুণ্ডন, বিত্তাদি স্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধস্বভাব থাকা, পরাপকার বর্জ্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। যদিও বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখানে শ্রুতি "অনন্তর" শব্দে বৈরাগ্যের অনন্তরই বলিয়াছেন। কারণ, বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে না এবং বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে বৈরাগ্যোদয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা। সুতরাং বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বানপ্রস্থীরও স্বাশ্রমবিহিত প্রতীকোপাসনা ও শমদমাদির সাধন করিতে হয় বলিয়া, এখানে বৈরাগ্যের অনন্তরই বুঝিতে হইবে। তাই এ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মত এই যে, "যাবৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহামুত্রফলভোগবিরাগো যোগারূঢ়ো ভবতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি" —যতদিন না বিশুদ্ধসত্ত্ব, ঐহিক পারত্রিক ভোগবিলাসে নিঃস্পৃহ এবং যোগারূঢ় হইতে পারিবেন, ততদিন স্বাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। আবার শ্রুতিও বলিয়াছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥"—দেহাভিমানী নর স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মে রত থাকিয়া শত বর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে; মনুষ্যাভিমানীর ঐ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যাহাতে তদীয় আত্মা কর্ম্মলিপ্ত না হয়। অতএব আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা যখন জাতিনির্ব্বিশেষে স্বতঃই আসিয়া থাকে, এবং ক্রমান্বয় গার্হস্থ্য

শেষ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে ইন্দ্রিয়নিরোধক শমদমাদির সাধন দ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে অথবা ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা গার্হস্থ্যকালে স্বতঃই বৈরাগ্য জন্মিলে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে যখন সমাজত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, তখন অবশ্য উপনয়ন ও বর্ণাদি তত্ত্বতঃ কারণ নহে বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তাই গুণের পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ জানিয়াও যম নচিকেতাকে ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় এক ও অদ্বিতীয়, এবং অধিকারীরাও সকলে সমভাবাপন্ন। তাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের সার সিদ্ধান্ত "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" —এখানে ভেদ নাই, সবই এক। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের অদ্বৈততত্ত্বানুসন্ধিৎসাই সকল রকম ভেদজ্ঞানের নিবারক বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদাধিকারীরা সকলেই "একবর্ণ।" বাস্তবিক গুণই পরমার্থ; সুতরাং গুণবানের পক্ষে জাত্যাদি কোনরূপ বিধিনিষেধ নাই। তাই মহাবাক্য রত্নাবলীর সাদ্ধ্যাত্মিক বাক্যে উক্ত হইয়াছে— "আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা সুনিশ্চলম। দেহ জাত্যাদি সম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রমসমন্বিতান্। বেদ শাস্ত্র পুরাণানি পদপাংশুমিব ত্যজেৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে, বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত যে দেহ জাত্যাদির সম্বন্ধ তাহা এবং বেদশাস্ত্র ও পুরাণসকল পদধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব আমরা বেদোক্ত অধিকারীর অলোচনায় দেখিলাম যে গুণই পরমার্থ বলিয়া গুণেরই পূজা বা আদর হইয়া থাকে, জাত্যাদির পূজা বা আদর নাই—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

শঙ্কর-দর্শন।

মায়াবাদ *

(শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ)

(১)

শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি যে মায়াবাদের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন তাহার নামান্তর বিবর্ত্তবাদ বা অদ্বৈতবাদ। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। যেমন মৃন্ময় ঘটাদি বস্তুতঃ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়—"বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ম্" [ছান্দোগ্য—৬।১।৪]; সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মমাত্র, ব্রহ্ম ব্যতিরেক ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই—"নহি নানাস্তি কিঞ্চন" [বৃহদারণক, ৪।৪।১৯]।

এইখানে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইল। আমরা যাহাকে নামরূপ প্রপঞ্চ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত রূপভেদ দেখিতে পাই, এইগুলি সমস্তই পরমার্থ অবস্থায় অবিদ্যা কল্পিত—অবিদ্যপ্রত্যুপস্থাপিত বা অবিদ্যা অধ্যারোপিত। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এ গুলি মিথ্যা অভিমান ভিন্ন আর কিছুই নয়—আমাদের জগতের যা কিছু সমস্তই 'মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত'। এই মিথ্যা অভিমান আবার সম্যক জ্ঞানদ্বারা খণ্ডিত হইয়া যায়। আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রকৃত জ্ঞান হয় তখনিই সমস্ত ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। বলিতে গেলে, সমগ্র জগৎ মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়; ব্রহ্ম যিনি, তিনি স্বয়ং মায়াবীরূপে আপনা হইতে জগৎকে প্রসারণ করিতেছেন। অথবা "অবিদ্যয়া ব্রহ্ম

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাধারণ সভায় পঠিত।

বিভাব্যতে"। তিনি পুনরায় স্বীয় আত্মায় যাহা কিছু সমস্তই উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্ম উপসংহার কারণ-স্বরূপ—"স্বাত্মনি এব উপসংহারকারণম্"।

ব্রহ্ম বুঝিতে আমরা সৎ, চিৎ, আনন্দ বুঝিয়া থাকি। সৎ কাহাকে বলি? ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তাই তাঁহাকে সৎ বলা হয়। যখন তাঁহাকে চিৎ বলি, তখন বুঝি, ব্রহ্ম চৈতন্যপদবাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ। তাঁহাকে পরমানন্দ-স্বরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে, তিনি অখণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নির্ধর্ম্মক্ ; ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্মই নাই—তিনি স্বয়ং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। আমরা যখন ঘট দেখি তখন আমাদের ঘটজ্ঞান হয়, আর আমরা যখন পট দেখি তখন আমাদের পটের জ্ঞান হয়। এই ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞানের প্রভেদ আছে। যাহা ঘটজ্ঞান তাহা পটজ্ঞান নয় ; আপনার যে জ্ঞান এবং আমার যে জ্ঞান তাহা সমান নয় ; আপনার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান স্বতন্ত্র। আমাদের কাছে জ্ঞানের যে নানাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ ভেদব্যবহার দেখিয়াই হইয়া থাকে। জ্ঞান যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা, কিংবা যাহা সমস্ত জ্ঞানের ঐক্য সাধন করে এরূপ কোন যুক্তি এখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা বিষয়রূপ উপাধি লইয়াই জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। বস্তুতঃ জ্ঞান একমাত্র, বিষয়রূপ উপাধির ন্যায় কখনও ভিন্ন ভিন্ন নহে। যেমন একজনের মুখের প্রতিবিম্ব তৈলে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইবে, জলে সেরূপ হইবে না, পরন্তু অন্য আকার ধারণ করিবে। কিন্তু মুখ একই, কেবল জল ও তৈলের ভেদবশতঃই মুখের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই তৈল প্রভৃতি উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদব্যবহার হয়। সেইরূপ জ্ঞান যদিও এক, যদিও তাহার নানাত্ব নাই, তথাপি ঘটপটাদির বিষয়স্বরূপ উপাধিতে যখন আমরা আমাদের জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে সন্নিবেশ করি তখনই জ্ঞানের বিভিন্নতা বুঝা যায়।

যখন আমরা দেখি কোন লোক কোন দেশ জয় করিয়া হউক বা উত্তরাধিকারসূত্রেই হউক, কোন দেশের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন আমরা কি বলিব? আমরা তাঁহাকে সেই দেশের রাজা বলিয়াই অভিহিত করিব। কিন্তু যদি কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া তাঁহাকে দেশান্তরের রাজাসন গ্রহণ করিতে হয়, তখন আমরা তাঁহাকে সেই দেশান্তরের রাজাই বলিব পূর্ব্বদেশের রাজা বলিয়া আর তাঁহাকে অভিহিত করিব না। তেমনই অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল যখন বিষয়ের আবরণরূপ অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সকল প্রকাশ করে, তখনই তাহার জ্ঞান এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। আর উহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ যদি ঐরূপ না হয়, তাহা হইলে তখন জ্ঞান বলিয়াও প্রয়োগ হয় না। জ্ঞান যদিও এক, 'তোমার জ্ঞান, আমার জ্ঞান' প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা কি? বরং জ্ঞান যে এক সেই সম্বন্ধেই বহুল প্রমাণই দৃষ্ট হয়। একটা প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। বাস্তবিক বিভিন্ন দুই বস্তুর উপাধি ত্যাগ করিলেও আপনা আপনি আমাদের মনে ভেদ জ্ঞান আসিয়া থাকে, যেমন ঘট ও পট এই দুই বস্তুর মধ্যে কোনরূপই ঐক্য নাই—দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; কিন্তু যদি ইহাদের ঘট ও পটাদিরূপ উপাধি বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলেই কি ইহাদের অভিন্নতা প্রতীত হয়? সুতরাং ঘট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায় এবং পট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক যদি কোন ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধি উঠাইয়া দিলেও নিঃসন্দেহ ভেদব্যবহার হইত, কিন্তু যখন ঘট ও পটজ্ঞানের শুদ্ধ ঘট পটাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ স্বাতন্ত্র্য কেহই অঙ্গীকার করেন না, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের প্রকৃত ভেদ কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? ঐ ঐ জ্ঞানের ঘট ও পটরূপ উপাধির দ্বারাই, "যেহেতু ঘটই ঘটজ্ঞানের বিষয়, আর পটই পটজ্ঞানের বিষয়; অর্থাৎ ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদ ব্যবহার হয়, ইহাতে ঐ ঐ জ্ঞানের কেবলমাত্র

ঔপাধিক ভেদ আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। ইহা ভিন্ন জ্ঞান সমূহের স্বাতন্ত্র্য সাধনসূচক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। ববং একতা প্রতিপাদন পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বহু প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয। অধিকন্তু যখন সহজভাবে জানা যাইতেছে যে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান উভয়ই জ্ঞান, তখন ঐ দুই জ্ঞানের প্রভেদ স্বীকার কিরূপে করিতে পারা যায়? অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল লোকের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান বিভিন্ন নয়, এক। এই জ্ঞানেরই অপর নাম চৈতন্য। চৈতন্য ও জ্ঞান পৃথক্ নহে। এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই আত্মার, আবার আত্মাও চৈতন্য ছাড়া কিছুই নয। অতএব উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে যখন জ্ঞানের একত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তখন আত্মা সকল যে এক এবং পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য আছে তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রযোজন নাই। এই জীব ও ব্রহ্ম যে এক তাহা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে; জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপায় ও তিন রূপ—ছয প্রকার বিকারের মধ্যে—আত্মার কোন বিকারই নাই। আত্মা সকল সময সকল স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই আত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ, কেন না আত্মাই সকলের একান্ত স্নেহের অদ্বিতীয পাত্র। আমাদের যে স্ত্রী পুত্রাদিতে স্নেহাদি জন্মে তাহা এই আত্মার প্রীতির জন্যই হইযা থাকে। অন্যের প্রীতির জন্য কেহ কখনও আত্মাতে স্নেহ করে ন।

এখন একটা আপত্তি হইতে পারে—"যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত না হয় তাহা হইলে আত্মার আনন্দরূপত অজ্ঞাত রহিল; সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি? এই দোষ পরিহারের জন্য যদি আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্ম-স্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার ইচ্ছায় কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইত? সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি কাহারও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে।"

কিন্তু এই আপত্তি অঙ্গীকার করা যাইত, যদি আত্মার আনন্দ

রূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধকতা হেতু প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে ; অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত হইতেছে, অধ্যয়নশীল কতকগুলি ছাত্রের মধ্যস্থিত দেবদত্ত নামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এখানে অন্যান্য বালকের অধ্যয়নের জন্য প্রতিবন্ধক হইতেছে। সুতরাং দেবদত্তের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ তাহা বিশেষ জানিতে পারা যায় না। তবে সামান্যতঃ এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যে দেবদত্তের অধ্যযন শব্দ আছে। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্বঃ রজঃ, ও তমোগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্ণেয় পদার্থবিশেষকে অজ্ঞান বলে, এই অজ্ঞান জগতের কার্য্য বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে দুইটি শক্তি আছে। যেমন মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজন বিস্তৃত সূর্য্য-মণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বলিযা বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি বলে। আর যে শক্তির সহিত অজ্ঞান উপা-দান কারণরূপে জগৎ সৃষ্টি করে সেই শক্তিকে বিক্ষেপশক্তি বলে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ—মায়া এবং অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ অথবা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে মায়া নামে অভিহিত করা হয় ; আর মলিন অর্থাৎ রজোগুণ বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। উল্লিখিত মায়াতে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় সেই প্রতিবিম্বই এ মায়াকে স্বায়ত্ত করিযা জগৎ সৃষ্টি করেন।

এই জন্য ঐ প্রতিবিম্বহ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা, ও অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য। আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেই প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া

মনুষ্যাদি যাবৎ জীবপদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপ্রতিবিম্বও নানা; কাজেই জীবও নানা, মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর বলে; এইজন্য শরীরের অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়াসহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমে বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এইরূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বলে।

অনেকে শঙ্করকে মায়াবাদের উদ্ভাবনকর্ত্তা মনে করেন, কিন্তু মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে আচার্য্য শঙ্করের বহু পূর্ব্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে নাসদীয়সূক্তে এই মায়াবাদের কয়েকটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥'

ইত্যাদি। ১০।১২৯

এই সূক্তের সায়ন যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অনুরূপ অর্থ অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামতীর্থের পদযোজনিকা অথবা আচার্য্য শঙ্করের উপদেশসহস্রীর ভাষ্য এবং আত্মপুরাণে একইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সায়ন প্রলয়াবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। জগতের প্রাগবস্থা মায়ার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যাবস্থার সত্তা এখনও আসে নাই। মায়া সৎও নয় অসৎও নয়, ইহা অনির্ব্বচনীয়।

উপনিষদে স্পষ্টতরভাবে মায়াবাদের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে মায়া নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ভাষ্যে (১।৩) মায়ার নিম্নলিখিত কয়টী ঔপনিষদিক নামের উল্লেখ করিয়াছেন, —

"অব্যাকৃতং, আকাশং, পরমব্যোম, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, অবিদ্যা ছায়া, অজ্ঞানম্, অনৃতং, অব্যক্তম্।"

মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদের কয়েক স্থানে মায়াব্যাপারের উল্লেখ আছে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে মায়াবাদ ছিল। কিন্তু কর্ম্মবহুল বৈদিক যুগে দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। কাজেই বৈদিকযুগে মায়াবাদ আর্য্যদিগের মনোরাজ্যে তাদৃশ ভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে কর্ম্মপ্রবণতা হ্রাস পায়, দার্শনিকতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড লোপ পাইতে আরম্ভ হয়। এই সময় মায়াবাদের আবার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ও চৈনিক পর্য্যাটকগণের কৃপায় ইহা দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অতঃপর গৌড়পাদ আবার নূতন করিয়া ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত বেদান্ত দর্শনের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ হইতেছে —গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকা। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় গৌড়পাদই এই যুগে সর্ব্বপ্রথম মায়াবাদের অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত সমস্তই অলীক এই মতের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও এই মতবাদ ছিল, তবে তিনিই প্রথমে ইহার বিহিত প্রচার করেন। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞানের বৈতথ্য বা অসত্যত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনিও ঠিক সেই যুক্তিগুলিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইঁহার পর আচার্য্য শঙ্কর নানা উপায়ে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। মায়াবাদ ত প্রচারিত হইল। এই মায়া বলিলে কি

বুঝায় দেখা যাউক। মায়াশব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। মায়া শব্দে শিল্প-চাতুর্য, সৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রজাল, রচনাকৌশল, অলীকপ্রপঞ্চ, ইত্যাদি কত অর্থ হয়। শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মায়াবাদ বলিয়া যে যে মত প্রসিদ্ধ সেই সেই মতই যে বস্তুতঃ একই তাহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার মায়াশব্দের যথার্থ অর্থ কি তাহা নিরূপিত না হইলে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। শঙ্কর কি অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও তৎপূর্ব্বে শাস্ত্রকারেরাই বা 'মায়া'কে কি অর্থে লইয়াছেন, ইহা লইয়া একটা বড় গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে।

যদি সর্ব্বত্র মায়া শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মায়াবাদ অর্থে যাহা বুঝি তাহা শঙ্করের সৃষ্টি নয়, তাহা যে কোন্ অতীত যুগে সৃষ্ট হইয়াছে, বলা বড় কঠিন। দেখা যাক, গীতায় মায়াসম্বন্ধে কি আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্ববারের আলোচনায় এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। আজ আর কয়েকটী কথা বলিব

ভগবান্ বলিতেছেন,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়াকে গুণময়ী বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী মায়ার গুণ। ভগবান্ বলিতেছেন 'মম মায়া' সুতরাং বুঝিতে হইবে 'মায়া' ভগবানের। এই ত্রিগুণময়ী মায়া আবার জগতের জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই জন্যই জীব ভগবানকে ভুলিয়া রহিয়াছে। ভগবান্ অব্যয়, দৃশ্য জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। একথাও আমরা গীতাতে পাই। ভগবান্ বলিতেছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

আবার একথাও তিনি বলিতেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমরা 'মায়া' শব্দ ও 'প্রকৃতি' শব্দ উভয়ই গীতাতে পাইলাম। আর বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মায়া ও প্রকৃতি একই। প্রকৃতিও গুণময়ী, মায়াও গুণময়ী। জীবের কর্ত্তৃত্বও গীতা স্বীকার করিতেছেন না।

জীবের কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণের দ্বারাই হয়, জীবের তাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। জীবের কর্ত্তৃত্ব একটা আরোপ মাত্র, আর এই আরোপের মূলে 'অহঙ্কার' আছে। তবে কি ভগবান্ নিজ মায়া দ্বারা জীবের কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির কারণ হইতেছেন। একথাই বা বলি কি প্রকারে? ভগবান্ ত একথাও বলিতেছেন,—

না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

তিনি জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতির জন্য দায়ী নন। জীবের জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, জীব মোহ প্রাপ্ত হয়। তবে কি মায়া তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ?

তিনি বলিতেছেন 'মায়া' আমার (মম মায়া)। আবার বলিতেছেন, এই মায়া জীবকে অভিভূত করে। জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ত্তৃত্ব মায়ার। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি যাহা জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজের উপর আরোপ করে, ভগবান্ তাহার জন্যও দায়ী নহেন। তাহা হইলে ভগবান্‌ও নিষ্ক্রিয়, জীবও নিষ্ক্রিয়, মাঝে হইতে মায়া আসিয়া সকল প্রকার গোল বাধায়। মায়া যদি ভগবানের হইল, তাহা হইলে অন্ততঃ গৌণভাবে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভগবানের একটী কথায় যেন সকল গোল মিটিয়া যাইতেছে। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন,—"তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥" তিনি কর্ত্তাও নহেন, অকর্ত্তাও নহেন। গীতাতে মায়া অর্থে প্রকৃতি বুঝায়, এ প্রকৃতি কাহার? না, ভগবানের। ভগবান্ পুরুষ,

মায়া প্রকৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। একথা ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি আবার একথাও বলিযাছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

আবাব বলিতেছেন,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে গেলে বলিতে হয়, গীতার মতে ভগবান্ সৃষ্টি ও প্রলয়কর্ত্তা। কারণ তিনিই বলিতেছেন,—'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥' কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে তিনি তাঁহারই প্রকৃতিব সহায়তা গ্রহণ করেন, একথা তিনিই বলিতেছেন,— "ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত থাকেন না। 'তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্' একথাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার ত্রিগুণময়ী মায়া বা প্রকৃতি একদিকে যেমন সৃষ্টি করে, অপর দিকে তেমনই জীবকে মুগ্ধ রাখে, তাহার প্রমাণ,' 'ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥' তিনি অব্যয় একথাও ইহাতে বুঝা গেল। জীব মায়া দ্বারা এরূপ মুগ্ধ হয় যে, কর্ম্ম না করিয়াও প্রকৃতিকৃত কর্ম্ম আপনার উপর আরোপ করিয়া ফেলে। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' এই ভগবদ্বাক্য তাহার প্রমাণ।

এখন মোটের মাথায় গীতাতে মাযা বলিতে কি বুঝায়? তাহার উত্তর নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পাবে ঃ—মায়া ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাঁহারই প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। এই প্রকৃতির মূল তত্ত্ব তিনটী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, অথবা উক্ত মূল তত্ত্ব তিনটী প্রকৃতি-সম্ভূত। 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।' ইহা ভগবদ্বাক্য। প্রকৃতি অনির্ব্বচনীয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, ভগবানের সহিত একীভূতা, গুণত্রয় তাহা হইতে উপজিত হইয়া বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপার সম্পন্ন করে।

জ্ঞানের যাহা আবরণ তাহাই মায়া শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানময়। জ্ঞানময় বলিতে কি বুঝি? এবিষয়ের কিছু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক। জ্ঞানময় বলিতে আমরা সাধারণতঃ জ্ঞাতাকেই বুঝি। কিন্তু জ্ঞাতা বুঝিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয়ও বুঝিতে হয়। জ্ঞাতার ধর্ম্ম জানা. সে শুধু থাকিতে পারে না, কিছু না কিছু জানিবে। সে যাহা জানিবে, তাহাই জ্ঞেয়। তাহার জানিবার কার্য্য জ্ঞান। আমি জানি, সুতরাং আমি জ্ঞাতা; আমি বহির্জগৎকে জানি, সুতরাং বহির্জগৎ জ্ঞেয়। আমার জানিবার কার্য্য জ্ঞান। আমি সকল সময়ে জানি, আমার জানা কখনও শেষ হয় না। জাগৎ অবস্থায় যে আমি জানি, নিদ্রিতাবস্থায় সেই আমি স্বপ্নের বিষয় জানি সুষুপ্তিকালেও না কি আমার জ্ঞান তিরোহিত হয় না, এবিষয়ে দার্শনিক যুক্তি আছে। আমার জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক ও অনুমানমূলক, এই দ্বিবিধ। আমার অনুমানমূলক জ্ঞানের কারণ, আমার প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান। আমার জ্ঞানের বিষয় যাহা, তাহা আমি আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি। তজ্জন্য অনেকের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূল জ্ঞান বা আদি জ্ঞান।

যদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূল বা আদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব কাল সসীম বুঝিতে হয়। কারণ সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিরহিত চৈতন্যময় আত্মা কল্পনায় আসে না। পঞ্চেন্দ্রিয় দেহের সহিত জন্মে ও দেহের বিলয়ে লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যদি আত্মা সৎ ও নিত্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। আমরা অনেক কারণে আত্মাকে সৎ ও নিত্য বলিতে বাধ্য

আমরা দেখি শরীরীর পক্ষে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূল বা আদি জ্ঞান, আর যত প্রকার জ্ঞান এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্মৃতি হইতে হয়।

দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক কষ্টের জ্ঞান হইতে জাত। দর্শন শ্রবণ আস্বাদন আঘ্রাণও আমাদের

এক একটী ইন্দ্রিয-জাত জ্ঞান। মনে করুন, যদি ইন্দ্রিয় সকল না থাকে, তাহা হইলে ত আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান সম্ভব হয না। এস্থলে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? আত্মা নিত্য ও সৎ, কিন্তু আমাদেব ইন্দ্রিয সকল অচিরকালস্থায়ী, সুতবাং আত্মার ইন্দ্রিযাতীত জ্ঞান যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা আমাদেব প্রত্যক্ষজান জ্ঞান নহে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিযাছে। আমাব একমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাহা 'আমি আছি' এই জ্ঞান। এই জ্ঞানই অন্য সকল জ্ঞানের কারণ। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয সকল আমাদিগকে প্রবঞ্চনাই করে। যাহাকে আমরা শ্বেতবর্ণ বলি তাহা একটীমাত্র বর্ণ নহে। বিজ্ঞান বলে, ইহা সাতটী মূল বর্ণের সমষ্টি। আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ আমরা চক্ষে ইহাকে নীলবর্ণযুক্ত দেখি। সূর্য্য পৃথিবী হইতে অতীব বৃহত্তর অথচ সূর্য্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি। সুতবাং ইন্দ্রিয়সাহায্যে আমরা এ জগৎ যেরূপ দেখি, জগৎ যে তদ্রূপই, এ কথা বলা যায না। বিশেষতঃ বস্তু (substance) সম্বন্ধে আমাদেব কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুর আকার phenomenon) সম্বন্ধে আমাদেব জ্ঞান হয, কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই হয না।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয এই উভয়েব মধ্যে একটী সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। জ্ঞাতা থাকিলেই যখন জ্ঞেয থাকা চাই, আবার জ্ঞেয থাকিলেই যখন জ্ঞাতা থাকা চাই তখন এ উভযের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অপরিহার্য্য। আত্মা চৈতন্যময়, সুতবাং আত্মা জ্ঞাতা। সুতরাং আত্মার জ্ঞানকার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য বিষয় থাকা অপরিহার্য্য। আত্মার জ্ঞানের বিষয কি আত্মার বাহিরেব বস্তু, না আত্মাব ভিতরের বস্তু? যাহার সহিত যাহাব অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাহা তাহার বাহিরের বিষয় হইতে পারে না। কোন বিষয়ের সহিত তাহার বাহিরের বিষযের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরিহার্য্য হইতে পারে না। চুম্বকের সহিত লৌহেব সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরি-

কার্য্য নহে, কারণ লৌহ ব্যতীত চুম্বক থাকিতে পারে। জ্ঞাতার সহিত তাহার জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, তাহা জ্ঞাতার সঙ্গে সঙ্গেই চিরকাল অবস্থিতি করে। আমার জ্ঞানের বিষয় সকল আমারই ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে আমি ছাড়া তাহারা থাকিতে পারে না। পুষ্পের গন্ধ, মধুর মিষ্টতা, আমার বাহিরের বিষয় নহে, আমারই ভিতরের বিষয়। গন্ধ পুষ্পে নাই, আমার মনেতেই আছে, পুষ্পের আকৃতি বাহিরে নাই আমারই মনোমধ্যে আছে আমি জানি বলিলেই, আমার আত্মার একটা বিক্ষিপ্ত অবস্থা বুঝায়। আত্মা যখন বিক্ষেপ শূন্য অবস্থায় থাকে, তখন বিষয় সকল (আত্মার জ্ঞানের বিষয় সকল) আত্মার মধ্যেই অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে। আত্মা বিক্ষেপযুক্ত হইলেই বিষয় সকল ব্যক্তভাব ধারণ করে। "বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগদ্রূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ চক্রের অন্য একটী নাম প্রকৃতি। যখন আত্মা এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন, তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বা জগদ্ধাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা হয়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরিত্যাগ করা যায়, তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা অথবা চিন্ময়ী শক্তি বিদ্যমান থাকেন, তখন আর ব্যাবহারিক দ্রষ্টা, দৃষ্টি, দৃশ্য, পূজ্য, পূজক এবং পূজা; জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সৃষ্ট, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং মায়া প্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে না। কেবলমাত্র সেই অদ্বয় আত্মা মাত্র থাকেন।"

শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্‌ভাষ্যে বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ এবং শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।২।২৮-৩২) তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের এসকল মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

* মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ কৃত ভামতীভাষাবিবৃতি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের মতবাদের প্রভাবে বিব্রত হইয়া ২য় অ, ২য় পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোক আকুলী ক্রিয়তে"—বৈনাশিক অর্থাৎ বৌদ্ধগণ সমস্ত লোককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। শঙ্কর বিজ্ঞান-বাদ (Idealism) খণ্ডন করিয়া তাঁহার মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেগুলি বিজ্ঞানবাদের দোষ বলিয়া পরিচিত সেইগুলি সমস্তই শঙ্করের মায়াবাদে সংক্রামিত হইয়াছে। এগুলি তাঁহার ত্রুটিতে প্রবিষ্ট যদি না হইয়া থাকে অন্ততঃ তাঁহার সাম্প্রদায়িকগণের ত্রুটিতে শঙ্করের মায়াবাদকে দুষ্ট করিয়াছে।

শঙ্কর বলিতেছেন—"অনুপপন্নোয়মভাবত্তোবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ" (২।২।২৭) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি—বৌদ্ধদিগের এই মত অযৌক্তিক। কিন্তু পঞ্চদশী উপদেশ করিলেন—"প্রাগভাবযুতং দ্বৈতম্" (৬।২৫৫)। দ্বৈত পূর্ব্বে অভাবমাত্র ছিল। পঞ্চদশীর এই মায়াবাদে বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। একদিকে বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন— "যাহা নিশ্চিত বলিয়া অনুভূত হয়, যথা এই বস্তুই 'এইরূপই', তাহা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। তাহার বিপরীত যাহা কিছু বলা হয়, তাহাতে বক্তার বহুপ্রলাপিত্ব মাত্রই প্রকাশ পায়" (২।২ ২৫)—কিন্তু পঞ্চদশীকার এই সত্যের অপলাপ করিয়া বলিতেছেন -"কোথায় বা বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মায়া বলিয়া জানিবে",—এইরূপে যদি শঙ্করের উক্তি এবং পঞ্চদশীর বচনাবলী তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাইবে যে পঞ্চদশীর মায়াবাদ বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের বৈদান্তিক সংস্করণ মাত্র। আর পঞ্চদশীকার যে অর্থে মায়াবাদী শঙ্কর কখনই সেই অর্থে মায়াবাদী নন।

আমাদের বোধ হয়, বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ তৎকালীন জনগণের হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, শঙ্কর তাহা বহু চেষ্টা করিয়াও নির্মূল

করিতে পারেন নাই। আপনারা সকলেই শঙ্করের নির্দ্দিষ্ট ব্যাবহারিক দ্বৈত ও পারমার্থিক অদ্বৈতমতের কথা অবগত আছেন। জর্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মধ্যে Kant ও Fichth এবং ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে Hamilton ও Mill এই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিকের ভেদ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্কর ব্যাবহারিক দ্বৈত কখনও অস্বীকার করেন না। তবে শঙ্করের সঙ্গে Kant প্রভৃতির পার্থক্য এই যে তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের প্রচলিত পৌরাণিক "মহাপ্রলয় মত" অঙ্গীকার ও সমর্থন করিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মাত্র থাকেন। বিশ্বপ্রপঞ্চের লয় হয়। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত ব্রহ্মের সগুণ বা সবিশেষ স্বরূপের বা ঈশ্বরের এক মহাবিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপরাপর প্রাণিগণের ন্যায় থাকেন না, অথবা শক্তিরূপে মাত্র অবস্থান করেন। এই জন্যই শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য, বিশ্ব প্রপঞ্চ এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। যাহা হউক ব্যাবহারিক জগৎ সম্বন্ধে ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ সকলই সত্য শঙ্করের মত। শঙ্করের মতে পারমার্থিককে সত্যের তুলাদণ্ড করিয়া কথা বলিতে গেলে, ব্যাবহারিককে মিথ্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে মিথ্যা আপেক্ষিক বা তুলনায় মিথ্যা মাত্র। তাই বলিয়া ব্যাবহারিকের নিজের মধ্যে কখনও কোন মিথ্যাত্ব নাই।

বস্তুতঃ শঙ্করের কথায় এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই শঙ্করের সাম্প্রদায়িকগণ অনেক স্থলে পারমার্থিক এবং ব্যাবহারিক মিশাইয়া, ইতরেতর অধ্যাস দ্বারা গোলমাল করিয়া, শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের এবং শূন্যবাদের দোষ সংক্রামিত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-নীতি—স্বাস্থ্যসমাচার পুস্তকাবলী। সংখ্যা ১ ও ২।

বাঙ্গালী দুর্ব্বল, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে রোগ, বঙ্গদেশে অকালমৃত্যুর সংখ্যা যত অধিক কোন সভ্যদেশে সেরূপ দেখা যায় না। এই কথাগুলি প্রমাণ করিবার জন্য তর্কবিচারের আবশ্যক করে না। এই জাতীয় দুর্ব্বলতার, এই রোগ ও মৃত্যু-বাহুল্যের কারণ কি? আজ কাল অনেক কৃতবিদ্য ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহীনতার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতেছেন এবং আপনাদিগের শিক্ষা ও ভূয়োদর্শনের ফল সংবাদপত্রে, পুস্তকে, সভাসমিতিতে সাধারণের মঙ্গলকল্পে প্রচার করিতেছেন। স্বাস্থ্যসমাচার পত্রিকা কিছুকাল যাবৎ এই দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ "স্বাস্থ্যনীতি" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইলে, অগ্রে স্বাস্থ্যের মূল তত্ত্বগুলি এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যাহাতে লোক সেই তত্ত্বগুলি আপন আপন প্রকৃতি ও অবস্থা উপযোগী করিয়া লইয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। সকল শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্যশিক্ষারও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহাতে শিক্ষিতের মানসিক শক্তিগুলির উন্মেষ হয়, ইচ্ছা ও বিচারশক্তি বলবতী হয়। কেবল রাশি রাশি নিয়মের অধীন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে যাইলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া জড়ত্ব লাভ করিবে—স্বাস্থ্যের মূল তত্ত্বগুলি ভুলিয়া নিয়মের বন্ধনে যন্ত্রবৎ বদ্ধ হইয়া স্বাস্থ্যলাভের পরিবর্ত্তে জীবনীশক্তিহীন হইতে থাকিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তক দুইখানিতে মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে নিয়মশিক্ষার বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বর্ণনাস্থলে লেখক লিখিয়াছেন, "ম্যালেরিয়ার সময় মশারির ভিতর ব্যতীত শয়ন করা উচিত

নয়। মশারি ছেঁড়া থাকিলে তাহা মেরামত করাইয়া লওয়া আবশ্যক। মশারির ধার বিছানার তলায় ভালরূপে গুঁজিয়া রাখা উচিত।" অশ্রুতপূর্ব্ব শিক্ষা বটে! কিন্তু গ্রন্থকার একটী শিক্ষা দিতে ভুলিযাছেন—যদি দুষ্ট মশক মশারি ফেলিবার পূর্ব্বাহ্নে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে কি উপায় হইবে? নিয়ম শিক্ষা দিবার আতিশয্য ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মানুষের নিজের ভাবিবার আর কি আছে? চিন্তাহীন ইচ্ছাশূন্য থাকিয়া তাহার প্রতি কেবল নিয়ম পালনের ভার—তাহার জড়ত্ব লাভের কি অধিক বিলম্ব হইবে! যদি মশকদংশনই ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইলে সমবেত চেষ্টা বা রাজশক্তির বলে এই রোগ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ রোগের প্রতীকার অসম্ভব ইহা ধারণা করিতে হইবে। নিয়মগুলির স্বাস্থ্যকারিতা বুঝাইতে যাইয়া অধিকাংশ স্থলে লেখক বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ফলে পুস্তক খানি ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় দূষিত হইয়াছে। কোন্ বিজ্ঞানমতে সরিষার তৈল ও লবণ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলে মুখের কীটানু বিনাশ হয়?

"দাঁতনে এক প্রকার কস্ আছে, তাহা সঙ্কোচক ও কীটানুনাশক"—এই অভিনব তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? "কুন্তলরাশি পরিশোভিত স্ত্রীলোকের মস্তকে নারিকেল তৈল দান সঙ্গত।" কেন?—সুদীর্ঘ কেশরাশিজনিত মস্তিষ্কের উষ্ণতা প্রশমনে নারিকেল তৈল বিশেষ উপযোগী। পাশ্চাত্য শারীরবিধান শাস্ত্রের কি ইহা নূতন আবিষ্কার? "সরিষার তৈল চর্ম্মরোগ নিবারণে বিশেষ উপযোগী" এবং "অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া জলপান করা অনেক সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।" যে চিকিৎসক রোগের বিশেষ অবস্থা না বুঝিয়া এইরূপ চিকিৎসার বিধান দেন তিনি আনাড়ী চিকিৎসক। পুস্তকের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, "শরীরে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য, তৈলের কিয়দংশ চর্ম্মমধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে।"

অপর স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—"তৈল মর্দ্দনে লোমকূপসমূহ বদ্ধ হইয়া যায়।" এক স্থানে লিখিয়াছেন—"দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাশ প্রভৃতি নানা রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা" কিন্তু পরেই দেখিতে পাই "যাঁহারা অজীর্ণরোগী, শ্বাস ও হিক্কারোগে পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর।" কোন্ নীতিটী গ্রহণ করিতে হইবে ?

পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, লেখক মহাশয় কলিকাতা-বাসী অর্থশালী ভদ্রপরিবার লক্ষ্য করিয়াই ইহা রচনা করিয়াছেন। পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্য ও পল্লিগ্রামবাসীদিগের আচারাদি সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান নাই। একারণ ইঁহাদিগের বিষয়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে ভ্রমপূর্ণ।

এদেশের কুসংস্কারপীড়িত অশিক্ষিত সাধারণের শিক্ষার জন্য অনেক স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। তাহাদের অধিকাংশই এই ছাঁচে ঢালা, এজন্য এতগুলি কথা বলিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

খাদ্য—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু, এম, বি, এফ, সি, এস্ প্রণীত। 'খাদ্যে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেকটা আমাদের আহারের উপর নির্ভর করে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা 'পেটুক' তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আহার্য্যের গুণাগুণ বা কি পরিমাণে আহার করা উচিত জানা না থাকায় নানারূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। আবার রুগ্ন অবস্থায় বা স্বাস্থ্যলাভের অনতিপূর্ব্বে কিরূপ খাদ্য ব্যবহার করা উচিত—যাহাতে রোগী শীঘ্র বল লাভ করে, তাহা না জানা থাকায় আমরা অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাই না। সেই জন্য প্রত্যেকেরই খাদ্য ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত চুণী বাবু 'খাদ্য' প্রণয়ন করিয়া উক্ত

অভাব দূর করিয়াছেন। তিনি যেরূপ সরল এবং সাদা সিদা ভাষায় তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে বিষয়টী সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণে দুইটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ম "উপবাসের উপকারিতা" চুণী বাবু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুই দেশেরই পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বিষয়েব আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মাঝে মাঝে উপবাস যেমন এক দিকে মানসিক সংযম আনয়ন করে অপর দিকে তেমনি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, লঘুতা এবং অনেক সময় বললাভেরও কারণ হয়। আমরা তাঁহার এই মতের সমর্থন করি। ২য়—"রোগীর পথ্য প্রস্তুতপ্রকরণ।" ইহাতে শুধু আজকাল এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ যে সকল পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাদের প্রস্তুত প্রণালীর উপদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু যদি কবিরাজগণও যে সকল পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাদেরও প্রস্তুত-প্রণালী প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রবন্ধটী সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত।

যাহা হউক, আমরা উক্ত পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি এবং আশা করি উহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বিরাজ করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-চরিত্র—পণ্ডিত ভাস্কব বিষ্ণু ফাডাক, বি, এ, মায়াবতী, অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষের অনুমত্যানুসারে ইংরাজীতে প্রকাশিত স্বামিজীর জীবনী মারহাট্টি ভাষায় অনুবাদ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি উহা দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবেন – প্রত্যেক খণ্ডে দুই শত করিয়া পৃষ্ঠা থাকিবে। আমরা "চরিত্রের" দুই খণ্ড পাইয়াছি। পণ্ডিতজী মারহাট্টি ভাষায় বিশেষাভিজ্ঞ, সেই জন্য আশা করা যায় তাঁহার ভাষান্তর অতি সুন্দরই হইয়াছে। মারহাট্টি সংবাদপত্র সমুদয়ও তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছেন। পুস্তকগুলির বাঁধাই ও ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। পণ্ডিতজীর এই সৎ উদ্যম সফল হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ইং ১৯১৬ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কোয়ালপাড়া বি. এন, রেলওয়ের বিষ্ণুপুর ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামস্থ এবং স্থানীয় লোকেরা সকলেই দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। স্বামী কেশবানন্দ এবং তাঁহার তিন চারিজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্থানীয় লোকদিগের সেবার্থ কোয়ালপাড়ায় একটী অনাথ আশ্রম, একটা বয়ন বিদ্যালয় ও একটী অবৈতনিক সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অনুষ্ঠান তিনটীই সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে।

অনাথ আশ্রম এখান হইতে দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও অবস্থানুযায়ী পীড়িতগণকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়; যাঁহাদের পথ্যের সংস্থান নাই তাঁহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য উভয়ই দান করা হয়; এতদ্ব্যতীত আশ্রম হইতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র, চাউল ও অর্থ সাহায্যও করা হইয়া থাকে। ইং ১৯১৬ সালে ঐরূপ বিবিধভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ৭৬০, তন্মধ্যে যাঁহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ৭৪০; ৬ জনকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়; ১০ জনকে ঔষধ ও পথ্য উভয়ই দান করা হইয়াছে; ১ জনকে বস্ত্র, ১ জনকে চাউল ও ২ জনকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আশ্রমের সেবকগণ একটী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যাইয়া ৪ জন কলেরা রোগীর সেবা করেন। ভগবানের কৃপায় এবং সেবকগণের যত্নে ৪ জনই আরোগ্য লাভ করেন।

অনাথ আশ্রমের মোট আয় ১৯৮৲ টাকা, তন্মধ্যে ইং ১৯১৫ সালের তহবিল মজুত ৪৸৵১০, মাসিক চাঁদা ৬৲ ও এককালীন দান ১৮৭৷১০।

মোট ব্যয় ঔষধ পথ্যাদি ক্রয়, জনৈক সেবকের খোরাকী ইত্যাদি বাবদ ১৯৫।/০ আনা।

অবৈতনিক সাধারণ বিদ্যালয়—ইং ১৯১৬ সালে ইহার মোট ছাত্র সংখ্যা ২৫ জন; তন্মধ্যে ২৪টী বালক ও ১টী বালিকা। দৈনিক উপস্থিতির হার শতকরা ৭৩ জন। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন ছাত্র দিবসে অবসর পায় না বলিয়া রাত্রে অধ্যয়ন করে।

উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য পুস্তক সম্বলিত একটী পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ যাহাতে তাহাদের অবসরমত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ের আয় এককালীন দান হিসাবে ১০৮৵৫, খুচরা আদায় ৷৴৫, মোট ১০৯।৴১০। শিক্ষকের বেতন, স্কুলঘর মেরামত ও অন্যান্য খরচ হিসাবে মোট ব্যয় ৯৮।৶১০ টাকা।

বয়ন শিল্প বিদ্যালয়—ইং ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ৪।৫টী যুবক দেশীয় বয়ন শিল্পের উন্নতিকামনায় অর্থাদি ব্যয় করিয়া প্রায় দশ বৎসর উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা উক্ত শিল্প নিজেরা শিক্ষা করিয়া আরও ৩।৪ জনকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহাতে ৩ জন শিক্ষালাভ করিতেছে।

উক্ত শিল্পালয় স্থাপনের আরও একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে—গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়ায় যদি তাহারা সামান্য মূল ধন নিয়োজিত করিয়া তাহাদের অবসর সময় বয়নকার্য্যে নিয়োগ করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আর্থিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি বিধান করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাছে মূলধনও নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় এপর্য্যন্ত কেহই উক্ত উদ্দমে হস্তক্ষেপ করে নাই। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর একটী পৃথক শিল্পালয় স্থাপনে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহারা বয়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদিগকে সেখানে কার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা

উপার্জ্জন করিতে দেওয়া হইবে। ইহাদিগকে সফল-কাম হইতে দেখিলে অপরেও উক্ত শিল্প অর্থাগমের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ঐরূপ শিল্পালয় স্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ কিছু অর্থের প্রয়োজন।

শিল্পালয়, অনাথাশ্রম কিম্বা বিদ্যালয়ের জন্য যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে, (১) স্বামী কেশবানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, কোয়ালপাড়া, পোঃ কোতলপুর, জেলা বাকুড়া; অথবা (২) স্বামী সারদানন্দ, সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগ-বাজার, কলিকাতা। পাঠাগারের জন্য পুস্তকও প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠানত্রয়েব উন্নতিকল্পে আশ্রমবাসিগণ সকলের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদেব উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ তাহাতে আশা করা যায—সাধারণের সহানুভূতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইবে এবং মহানুভবগণের সাহায্যে অর্থেরও অপ্রতুলতা হইবে না।

দাতব্য ঔষধালয় বেলুড় মঠ—ইতিপূর্ব্বে আমরা বৈশাখ মাসের উদ্বোধনে এই দাতব্য ঔষধালয়টীর জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এপর্য্যন্ত কোনও প্রকার সাহায্যাদি না আসায় আমরা পুনরায় সহৃদয় জনসাধারণের নিকট তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে এই ঔষধালয়টী মঠ বাটির একটী ঘরে ছিল; তথায় অল্প স্বল্প ঔষধাদি রাখিয়া মঠস্থ সকলের এবং প্রতিবাসীদেরও ঔষধাদি দেওয়া হইত।

কিন্তু ক্রমশঃ বাহিরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মঠের ভিতর নিত্যই জনতা ও গোলমালের জন্য একটী পৃথক্ ঔষধালয় নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। ঐ ঔষধালয়টী নির্ম্মিত হওয়ায় গ্রামের ও গ্রামান্তর হইতে আগত পীড়িত নরনারীগণের চিকিৎসার বড়ই সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থাভাব বশতঃ

ঔষধাদির অনাটন হওয়ায় ঔষধালয়টীর যাহা উদ্দেশ্য তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না।

এদিকে ঔষধালয়টীর উপর সাধারণের এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা মনে করে মঠের সাধুদের ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যাইবেই। উক্ত কারণে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরাও পীড়িত নারায়ণ জ্ঞানে তাহাদের সেবাদি কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে তাহার চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু প্রত্যহ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আজকাল এই মহার্ঘের বাজারে সকলের জন্য সকল প্রকার ঔষধ একজনের পক্ষে দান করা অসম্ভব। সেই জন্য সহৃদয় সাধারণের নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি, যাঁহার যতটুকু সাধ্য ঔষধ, পথ্য ও অর্থসাহায্যাদি শ্রীভগবানের কার্য্য ভাবিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া উক্ত সেবাকার্য্যে সহায়তা করুন।

ইং ১৯১৬ ও ১৭ সালের একই সময়ের ষাণ্মাসিক রোগীর সংখ্যা তুলনায় আলোচনা করিলে বৎসর বৎসর রোগীর সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বেশ বুঝা যাইবে। ইং ১৯১৬ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত নূতন রোগীর সংখ্যা ৯৬২ ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা ১৭১৭। ইং ১৯১৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত নূতন রোগীর সংখ্যা ১৬৭৯ আর পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৪২৬২।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা -অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়, জেলা হাওড়া।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন।

(স্বামী সারদানন্দ)

পাণিহাটি মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদনা বৃদ্ধি হইল। সেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আর্দ্রপদে বহুক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে বারম্বার অনুযোগ করিলেন এবং পুনরায় ঐরূপ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং বালক-স্বভাব ঠাকুর ঐ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত দোষ রামচন্দ্রপ্রমুখ কয়েক জন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া বলিলেন, "উহারা যদি একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি পাণিহাটিতে যাইতে পারিতাম।" চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও রামবাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তারী পাশ করিয়া-ছিলেন। বৈষ্ণব মতের প্রতি অনুরাগবশতঃ পাণিহাটির উৎসবে যাইবার জন্য তিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এখন ঐবিষয়ে সমধিক দোষভাগী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। আমাদিগের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে ছোট তক্তাখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলেন —"বালককে শাসন করিবার জন্য কোন কার্য্য করিতে নিষেধ

করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে যেমন বিষণ্ণ হইয়া থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? তিনি তাহাতে গলার প্রলেপ দেখাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন 'এই দ্যাখ্ না, ব্যথা বাড়িয়াছে, ডাক্তার বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে।' বলিলাম, তাই ত মশায়, শুনিলাম সেদিন আপনি পেনেটি গিয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্যই ব্যথাটা বাড়িয়াছে। তিনি তাহাতে বালকের ন্যায় অভি-মানভরে বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ, দ্যাখ দেখি এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা, আর রাম কি না আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশ-করা ডাক্তার যদি ভাল করে বারণ করতো তাহলে কি আমি সেখানে যাই।' আমি বলিলাম, তাই ত মশায়, রামের ভারি অন্যায়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে। শুনিয়া তিনি খুসী হইলেন এবং বলিলেন, 'তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়, এই দ্যাখ্ দখি—তুই কতদূর থেকে এলি। আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?' বলিলাম, আপনাকে দেখিলেই আনন্দ হয়, কথা নাই বা কহিলেন, আমাদের কোন কষ্ট হইবে না, ভাল হউন, আবার কত কথা শুনিব। কিন্তু সেকথা শুনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট প্রভৃতি সকল বিষয় ভুলিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ক্রমে আষাঢ় অতীত হইল। মাসাধিক চিকিৎসাধীন থাকিয়াও ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অন্য সময়ে স্বল্প অনু-ভূত হইলেও একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তখন কোনরূপ কঠিন খাদ্য ও তরিতরকারি গলাধঃকরণ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত। সুতরাং দুধ ভাত ও সুজির পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর ঐ সকল দিন অতিবাহিত করিতেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষাপূর্ব্বক স্থির করিলেন, তাঁহার

clergyman's Soar throat হইয়াছে। অর্থাৎ লোককে দিবারাত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে বাগ্‌যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ঐরূপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগ নির্ণয় করিয়া ডাক্তারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্ মানিয়া চলিলেও দুইটি বিষয়ে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্যসংযমের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরূপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবুদ্ধি হারাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মুহ্যমান জনগণ পথের সন্ধান ও শান্তির প্রয়াসী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে উপদেশাদি প্রদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিসকলের আগমন বড় স্বল্প হইতেছিল না। পূর্ব্বপরিচিত ভিন্ন পাঁচ সাত বা ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে ধর্ম্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দ্বারে নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুকাল পর হইতে নিত্যই ঐরূপ হইতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ বৎসরে ঠাকুরের নিয়মিত কালে স্নান আহার এবং বিশ্রামের সত্য সত্যই অনেক সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। তদুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাঁহার নিদ্রা স্বল্প হইত। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থানকালে আমরা কতদিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ করিতেছেন, কখন পশ্চিমের কখন উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, আবার কখন বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরূপে রাত্রের ভিতর

তিন চারি বার শয্যাত্যাগ করিলেও রাত্রি ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ, মনন, নাম, গুণ-গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবসে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিদ্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি।

অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, ঠাকুর তদ্বিষয় আমাদিগের কাহাকেও না বলিলেও উহার পরিচয় শ্রীশ্রীজগদম্বার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কখন কখন পাইতাম কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জনৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ছোট তক্তাখানির উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "যত সব এঁদো লোককে এখানে আন্‌বি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুঁ দিয়ে জাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আমার চোখ্ গেল, হাড় মাটি হল—অত করতে আমি পার্‌ব না, তোর সখ থাকে তুই কর্‌গে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দুই এক কথা বল্লে দিলেই (চৈতন্য) হবে!" অন্য এক দিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম, বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে—যাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আসে।" ঐরূপে লোকশিক্ষায় সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈক স্ত্রীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তুই জল ঢাল, আমি কাদা করি।" ধর্ম্মপিপাসুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েক দিন পরে এক দিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, "এত লোক কি আন্‌তে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়াছিস! লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই

না! একটা ত এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া), রাত-দিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিক্‌বে ?"

বাস্তবিক, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধ ও অমৃতময়ী বাণীর কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভের আশয়ে নিত্যই দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মোহিত হইয়া তদবধি পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া হইবার পূর্ব্বে ঐরূপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হওয়া সুকঠিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার সুযোগ কখন উপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় এক প্রকার ভালই হইয়াছিল, নতুবা আমার পূজ্য দেশপূজ্য হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ তাঁহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এত দিন যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্য দর্শনে বহু পূর্ব্বে বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত—কারণ, তাঁহার নিজ মুখে তাঁহারা বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন, "অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের) অন্তর্দ্ধান হইবে।"

তাঁহার দেহরক্ষা করিবার কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত ঠাকুর সময়ে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেমে অন্ধ আমরা সে সকল কথা তখন শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাঁহার অলৌকিক কৃপা লাভে আমরা যেরূপ ধন্য হইয়াছি, আমাদিগের আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত সকলে তদ্রূপ কৃপা লাভে শান্তির অধিকারী হউক—এই বিষয়েই তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহার অদর্শনের কথা ভাবিবার অবসর কোথায় ? কণ্ঠরোগ হইবার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে

ঠাকুর ঐবিষয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে, দেহ রক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।" কণ্ঠ-রোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্য পদার্থ যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন—কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্ব্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন এবং অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া বহুদিবস না আসিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোল ভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐবিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর ঐরূপে বুঝাইলেও তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।"

লোকশিক্ষা প্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ ঐ বিষয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই। অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং কোন্ এক দৈব শক্তির আবেশে আত্ম-হারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের ভাবুক তাঁহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধি লাভ

করিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধাসকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় করাইতেন। ঐরূপে দেহপাতের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া দিয়াছেন।

লোকের মনের নিগূঢ় ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা তাঁহাতে চিরকাল সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি। শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা তাঁহার মনকে যে কখন স্পর্শ করিত না উহা তদ্বিষয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেও নিজ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তিনি উহা কখনও প্রকাশ করিতেন না। যখন যতটুকু প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইত, তখন ততটুকু মাত্র প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া দিতেন। অথবা কোন সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্য তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ বিষয়ক সামান্য একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের কণ্ঠের বেদনা বৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণের শেষে আমাদিগের সুপরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্য এক রমণী ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরকে দিবার মত আজ বাটীতে দুধ ভিন্ন অন্য কিছু নাই যাহা তোর হাতে পাঠাই, এক ঘটি দুধ লইয়া যাইবি?" পূর্ব্বোক্ত রমণী তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ভাল দুধের অভাব নাই তাঁহার জন্য দুধ বরাদ্দও আছে জানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয়া যাই বার প্রয়োজন নাই।"

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্য দুধ ভাত ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না—এবং কোন কারণে গয়লানী সে দিন নিত্য বরাদ্দ দুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দুধ না লইয়া আসায় তিনি তখন বিশেষ অনুতপ্তা হইলেন এবং পাড়ায় কোন স্থানে দুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদূরে 'পাঁড়ে গিন্নি' নামে পরিচিতা এক হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, তাহার সকল দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; কেবল দেড় পোয়া আন্দাজ উদ্বৃত্ত থাকায় সে উহা জাল দিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজন বলায় সে ঐ দুগ্ধ তাঁহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সে দিন ভাত খাইলেন। আহারান্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত বুলাইয়া দাও তো।" রমণী ঐকথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিবার পরে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐ মন্ত্র জানি, উনি একথা কিরূপে জানিতে পারিলেন? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন রমণীর নিকটে আমি উহা সকাম কর্ম্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধি জানিয়া বহুপূর্ব্বে শিখিয়া লইয়াছিলাম, পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্ত্তব্য জানিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তাভজা মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি ঘৃণা করেন ভাবিয়া ঐবিষয় তাঁহার নিকটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—কেমন করিয়া উনি তাহা টের পাইলেন!" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐকথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, উনি সকল

কথা জানিতে পারেন, অথচ মনমুখ এক করিয়া সদুদ্দেশ্যে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তাহাকে কখন ঘৃণা করেন না; তোমার ভয় নাই; আমিও ইঁহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উঁহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা এখন ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও।"

শ্রাবণ যাইয়া ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা এক দিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিল। বাগবাজারবাসিনী জনৈকা রমণী সেদিন তাঁহার বাটীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার তাঁহার বিশেষ আকিঞ্চন ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ জানিয়া সেই আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্য একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টা হইলেও ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া না আসায় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে ভোজনে বসাইতেছেন, এমন সময়ে সে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল —ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, সেইজন্য আসিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (মহেন্দ্র), প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল, কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্ব্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে। ভোজনকালে নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "যাঁহাকে লইয়া এত আনন্দ তিনি বুঝি এইবার সরিয়া যান, আমি ডাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি ঐরূপ কণ্ঠরোগ ক্রমে ক্যান্সারে (cancer)

পরিণত হয়, অস্থ রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই।"

পরদিবস ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ হইতে গঙ্গা দর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া লইয়া অনতিকাল পরে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু ভাগীরথী তীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐস্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর ষ্টীটে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যত দিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি ঐস্থানে থাকিয়া যাইলেন।

বাটীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধিসম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে, রোহিণী তাহাই, শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহ কালের মধ্যেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বৈঠকখানা ভবনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ব্ববাদসম্মত হইল।

এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের সর্ব্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বহুব্যক্তি তাঁহার দর্শনমানসে যখন তখন দলে দলে উপস্থিত হইযা বলরামের ভবনকে উৎসব স্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করিযাছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে সুগম নহে তাহাদিগকে ধর্ম্মালোক প্রদানের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইযাছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজন-কাল পর্য্যন্ত, এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এবং ভজনসঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইযা বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছ্বলিত করিযাছিলেন। সকল দিবস সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর বলরামের ভবনে এই কয় দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরস্ত হইব।

আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই এক

দিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। এক দিবস অপরাহ্নে ঐরূপে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ এবং গিরিশচন্দ্র এবং কালিপদ * মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন,

আমায় ধর নিতাই।

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া একব্যক্তি পরমপ্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্ জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠ্‌ল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে
অষ্ট সখি সাক্ষি তাতে
(এখন) কি দিয়ে সুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, "বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল

* শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকালীপদ ঘোষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" ঐরূপে উপর্য্যুপরি তিন বার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম,ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিযাছেন। গোস্বামী যেমন ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য

(সিষ্টার নিবেদিতা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল বিবাহসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা রহিয়াছে। সে সকল স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাত্যে একটী বক্তৃতার এক স্থলে তিনি সবিস্ময়ে বলিতেছেন, "এই সকল দুর্দ্দান্ত স্ত্রীলোক—যাহাদের মন হইতে 'সহ্য কর, ক্ষমা কর' প্রভৃতি শব্দ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!" তিনি ইহাও স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না যে, যেখানে বিবাহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিলে ভবিষ্যৎ মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব ও সাহসের কার্য্য। তিনি সর্ব্বদাই দেখাইয়া দিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শগুলির মধ্যে পরস্পর আংশিক

আদানপ্রদান দ্বারা উভয়কেই একটু তাজা করিয়া লওয়া আবশ্যক। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া দোষারোপ করিতেন না, এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে, ঐগুলি এমন কোন অনাচার দূর করিবার চেষ্টা হইতেই ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা উহাদের সমালোচক মহাশয় খুব সম্ভবতঃ নিজের একগুয়েমী বশতঃই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঘড়ির দোলনটা (Pendulum), কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষে একদিন তিনি, বিবাহ পাত্রপাত্রীর নিজেদের পছন্দ মত না হইয়া অভিভাবকগণের ব্যবস্থানুযায়ীই হইয়া থাকে, এই কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ওঃ! এদেশে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা রহিয়াছে! ইহার কতকটা অবশ্য সকল সময়েই ছিল। কিন্তু এখন ইউরোপীয়গণকে ও তাহাদের অন্যরূপ রীতিনীতিসকল দেখিয়া উহা বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজ জানিতে পারিয়াছে যে, অন্য একটা রাস্তাও আছে!"

জনৈক ইউরোপবাসীকে তিনি আবার বলিলেন, "আমরা মাতৃভাবকে বাড়াইয়া তুলিয়াছি, তোমরা জায়াভাবকে, এবং আমার মনে হয়, একটু আদানপ্রদান দ্বারা উভয় পক্ষই লাভবান হইতে পারে।"

তার পর তাঁহার সেই স্বপ্নের কথা; যাহা তিনি জাহাজে আমাদিগের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন—"স্বপ্নে আমি দুই ব্যক্তির গল্প শুনিতে পাইলাম—তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবাহাদর্শসমূহের আলোচনা করিতেছে, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যাহা এখনও জগতের পক্ষে হিতকর বলিয়া অত্যাজ্য।" এই দৃঢ়বিশ্বাস হেতুই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শগুলির মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে অত সময় অতিবাহিত করিতেন।

তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষে পত্নী স্বামীকে যত ভালবাসে, পুত্রকে পর্য্যন্ত স্বপ্নেও সেরূপ ভালবাসিতে পারে না। তাহাকে সতী হইতে হইবে। কিন্তু স্বামী মাতাকে যত ভালবাসে, স্ত্রীকে তত ভালবাসিতে

পাইবে না। সুতরাং ভারতে ভালবাসার পরস্পর আদানপ্রদান প্রতিদানরহিত ভালবাসার ন্যায় উঁচু জিনিস বলিয়া বিবেচিত হয় না। উহা 'দোকানদারী'। স্বামী স্ত্রীর সর্ব্বদা একত্রাবস্থানের আনন্দ ভারতবর্ষে সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এটী আমাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের নিকট হইতে লইতে হইবে। আমাদের আদর্শকে তোমাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করিয়া লইতে হইবে। আর তোমাদেরও আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা লওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি মাত্র লোকের মনে এই ধারণাই অপর সকল চিন্তাকে অভিভূত করিয়া বলবতী হইত যে, যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল আত্মার মোক্ষ ও জগতের সেবা সেই সন্ন্যাসজীবন, যাহা স্বচ্ছন্দতা ও গৃহসুখের প্রয়াসী সেই গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহা মহা কর্ম্মিগণ সময়ে সময়ে পোষ্যবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। একবার তিনি সস্নেহে ও অতি সদয়ভাবে জনৈক শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি এই সকল গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের সাধ কখনও কখনও তোমার মনে উঠে, তজ্জন্য চঞ্চল হইও না। এ সকল আমারও কখনও কখনও মনে আসে!" আর একবার জনৈক বন্ধুর মুখে তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করিতেছেন, এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "প্রত্যেক কর্ম্মী সময়ে সময়ে ঐরূপ বোধ করিয়া থাকেন!"

কিন্তু তিনি ভাবিতেন যে, কোন সামাজিক আদর্শকে মিছামিছি বাড়াইয়া তুলিয়া অবশেষে যাহা সমাজের গণ্ডীর পারে অবস্থিত, তাহার চিরন্তন মাহাত্ম্যের লাঘব করায় মহা অনর্থের সম্ভাবনা আছে, তিনি জনৈক শিষ্যকে গুরুগম্ভীর ভাবে এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি যাহাদিগকে শিক্ষা দিবে, তাহাদের প্রত্যেককে এই কথা বলিতে কদাপি ভুলিও না—

'মেরু সর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥'

—মেরু ও সর্ষপের মধ্যে যে প্রভেদ, সূর্য্য ও খদ্যোতের মধ্যে যে প্রভেদ, সাগর ও নদীর মধ্যে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।

তিনি জানিতেন যে ইহাতে ধর্ম্মগরিমারূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে, তাঁহার নিজের উহা দমন করিবার উপায় এই ছিল যে, তিনি নিজ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তমাত্রের নিকটই—তা গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন—শির নত করিতেন। কিন্তু উক্ত বাক্যের মর্য্যাদা হ্রাস করা, তাঁহার চক্ষে, আদর্শটীকেই ছোট করিয়া ফেলা—উহা তিনি কোন মতেই করিতে পারিতেন না। বরং তিনি অনুভব করিতেন যে, এ যুগে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের উপর একটী মহাগুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে—সেটী বিবাহিত জীবনেও সন্ন্যাসাদর্শগুলিকে প্রচার করা; উদ্দেশ্য, যাহাতে কঠিনতর পথটী অপেক্ষাকৃত সহজ পথটীর উপর সর্ব্বদা নিজের সংযমশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে, এবং প্রণয়ের আপাতমধুর মোহজাল—যাহা হৃদয়মনের একান্ত প্রীতিকর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী লাভের দোহাই দিয়া, মানবজীবনের চরমলক্ষ্য যে আত্মার নিজ মহিমায় অদ্বিতীয় ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি, তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়—সে মোহজাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যই বিশ্বাস করেন যে, বিবাহের চরম পরিণতি মানবের নিজ স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি; ইহার অর্থই এই যে, উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে হয়। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মানবত্ব ঈশ্বরত্বে লীন হয়, এবং তদবধি সমগ্র জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই আদর্শের যথার্থতা এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ চরম অবস্থায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধের মধ্যে ভালবাসার একবার বৃদ্ধি, একবার হ্রাস, ক্রমাগত এইরূপ প্রবৃত্তির জোয়ার ভাঁটা হইতে থাকে। কিন্তু যখন বাহ্যসম্বন্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তখন প্রেমের আর হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

এখন হইতে মন প্রেমাস্পদকে সমভাবে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া থাকে।

তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার মতামতের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁহার কাশ্মীরে একদিনের উক্তিটীর কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। সে দিন রবিবার প্রাতঃকাল; উভয় পার্শ্বে সারি সারি পপ্‌লার গাছের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে; তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে স্ত্রীজাতি ও জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, আমরাও শুনিতেছি। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্মের গৌরব এই যে, উহা কতকগুলি আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু কখনও একথা বলিতে সাহস করে নাই যে, ঐগুলির কোন একটীই একমাত্র সত্য পন্থা। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে। বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসমার্গকে অন্য সকল পথ অপেক্ষা ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছে, এবং বলে যে, উহাই সকল মুমুক্ষুর একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা। মহাভারতে এক ছোকরা সাধুর গল্প আছে; তিনি জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে একজন বিবাহিতা নারীর নিকট এবং পরে একজন মাংসবিক্রেতার নিকট যাইতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই গল্পটীই পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ। পতিব্রতা এবং ব্যাধ উভয়েই জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন দ্বারাই আমরা এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি।' স্বামিজী উপসংহারে বলিলেন, "দেখিতেছ, এমন কোন জীবিকা নাই, যদ্দ্বারা ভগবানের নিকট পৌঁছান না যায়। তাঁহাকে লাভ করা না করা শেষটা শুধু প্রাণের ব্যাকুলতার উপর নির্ভর করিতেছে।"

কোন্ জীবনে কতটা পরিমাণে আদর্শ পবিত্রতার প্রকাশ, তাহা লইয়াই যে সকল জীবনের মহত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয়—এই ব্যাপারটীকে মতবাদ হিসাবে স্বামিজী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। তবে কতক-গুলি লোক আছে, যাহারা উহার কদর্থ করিয়া এইরূপ মিথ্যা দাবি করিয়া থাকে যে, তাহাদের বিবাহ শুধু ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত

হইয়াছে। সাধু হিসাবে স্বামিজী এই সকল লোকের উক্তিকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, আমরা আত্মগরিমা-বশতঃ সর্ব্বদাই নিজ নিজ কার্য্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে ঐরূপে অজ্ঞাতসারে বাড়াইয়া তুলি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার প্রায়ই এমন সব লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত, যাহারা বিলাসের মধ্যে অলসভাবে জীবন যাপন করিলেও বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার নামগন্ধ নাই, বলিত যে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই তাহারা সংসারে রহিয়াছে; এবং তাহাদের নানা ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহারা বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই ত্যাগ অভ্যাস ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত এই সকল অলীক কল্পনার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শুধু এই উত্তর দিতাম যে, এরূপ সব মহাপুরুষ ত ভারতবর্ষে জন্মান না। মহাত্মা জনক রাজাই এই প্রকারের আদর্শ পুরুষ ছিলেন, এবং সমগ্র ইতিহাসে জনকরাজা মাত্র একবারই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!" এই বিশেষ ভ্রমটীর সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়া দিতেন যে, দুই প্রকার Idealism (আদর্শবাদ) আছে; একটী—যথার্থ আদর্শটীকেই পূজা ও উচ্চাসন প্রদান করা; অপরটী—আমরা নিজে যে অবস্থাটা লাভ করিয়াছি, তাহাকেই বাড়াইয়া স্বর্গে তোলা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদর্শটীকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের অহংজ্ঞানেরই নিম্নে আসন দেওয়া হইল।

কিন্তু তাঁহার এই কঠোর সমালোচনা কোন শুষ্ক দোষদর্শীর (cynic) মত ছিল না। যাঁহারা আমাদের আচার্য্যদেবের 'ভক্তিযোগ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশেষ উক্তিটী মনে পড়িবে যে, প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে আদর্শটীকেই দেখে। আমি তাঁহাকে একটী বালিকাকে বলিতে শুনিয়াছি—বালিকার একজনের প্রতি প্রণয়ের কথা তখন সদ্য টের পাওয়া গিয়াছে—"যতদিন তোমরা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে আদর্শটীকেই দেখিতে পাইবে, ততদিন তোমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুখ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে।"

আমাদের আচার্য্যদেবের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিসকলের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া মহিলার কিন্তু এই বিশ্বাস ছিল যে, স্বামিজী সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাবশতঃ বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও উপকারিতা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই। উক্ত মহিলা নিজে দীর্ঘকাল বৈধব্য জীবন যাপন করিতেছিলেন এবং বিবাহিত জীবনে অসাধারণ সুখভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, স্বামিজী দেহাবসানের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই বিষয়ে যে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাকেই জ্ঞাপন করিতে চাহিবেন। আবার যে পত্রবাহক তাঁহার পত্রখানি মহিলার বহুদূরস্থিত গৃহে পৌঁছাইয়া দিল, সেই তাঁহার দেহত্যাগের তারের সংবাদও ঐ সঙ্গে তাঁহার হাতে দিল। কে জানিত পত্রখানি এরূপ দারুণ শোকের সময় যাইয়া উপস্থিত হইবে? পত্রখানিতে স্বামিজী লিখিতেছেন—"আমার মতে কোন জাতিকে অখণ্ড ব্রহ্ম-চর্য্যের আদর্শে উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে মাতৃভাবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে হইবে,—বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই ইহার সোপান। রোম্যান ক্যাথলিক ও হিন্দু-গণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া প্রভূত শক্তিশালী মহাশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ ও নারীসকলের সৃষ্টি করিয়াছে। আরবীদিগের নিকট বিবাহ একটা কড়ারে বন্দোবস্ত, বা জোরপূর্ব্বক দখল, যাহা ইচ্ছামাত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। ফলে আমরা দেখি যে, তাহার চির-কুমারী বা ব্রহ্মচারীর আদর্শের বিকাশ নাই। আধু-নিক বৌদ্ধধর্ম্ম, যে সকল জাতি এখনও বিবাহবন্ধনের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের হাতে পড়িয়া, সন্ন্যাসকে অতি বিকৃত কদাচারপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যতদিন জাপানে বিবাহ সম্বন্ধে (পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও প্রণয় ছাড়া) একটা মহান্ ও পবিত্র আদর্শ গড়িয়া না উঠিতেছে, ততদিন কিরূপে তথায় উচ্চদরের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সকল জন্মিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন আপনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পতিপত্নীর

মধ্যে সম্বন্ধটীকে পবিত্র ও অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের গৌরব, সেইরূপ আমিও ক্রমশঃ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই মহাপবিত্র বন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইলেই কতিপয় শক্তিশালী আজীবন ব্রহ্মচর্য্যবান পুরুষ ও নারীর উদ্ভব হইতে পারিবে।”

আমাদের কেহ কেহ বোধ করেন যে, এই পত্রখানিতে স্বামিজী যতটা অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও ব্যাপকতর অর্থ নিহিত আছে। যে মহা দর্শনে বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই তাহার শেষ কথা। যদি দাম্পত্যবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই সমাজকে নির্জ্জনবাস ও সংযমে গঠিত সন্ন্যাসজীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাইবার সোপান-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে সংসারের কর্ত্তব্যগুলিকে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করাও পূজাপ্রার্থনাদির ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম পবিত্র উপায়স্বরূপ হইল। সুতরাং এখানে আমরা একটী সাধারণ নিয়মের পরিচয় পাইলাম, যদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, কেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি প্রভৃতিকে তত প্রশংসা না করিয়া, বরং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে চরিত্রদার্ঢ্যের বিকাশেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। আবার, স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও যে কেন সর্ব্বদা সকলকে শক্তিমান হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন, তাহার ভিতরকার অর্থও আমরা বুঝিতে পারি। উহার কারণ নির্ণয় অতি সহজ। যদি “বহু ও এক, ইহারা একই মনের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট একমাত্র সত্তা” হয়, তাহা হইলে এক কথায় বলা যায়, চরিত্রই ধর্ম্ম। জনৈক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন বলিয়াছেন, সত্য সত্যই—“জগতের সাধারণ জিনিষগুলিকে গ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের মধ্যে চলা ফেরার নামই মহত্ব; এবং গভীর প্রেম ও প্রভূত সেবার নামই সাধুতা।” কে জানে, হয়ত এই সহজ সত্যগুলিই অবশেষে এ যুগের নবধর্ম্মবাণীর অস্থি-মজ্জা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা যে সম্ভবপর, আমাদের আচার্য্য-

দেবের নিজ মুখের এই কথাগুলিই তাহার নিদর্শন, "সর্ব্বোচ্চ সত্য সকল সময়েই অতি সহজ।"

ব্রজ-ভ্রমণ

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

এবৎসর জন্মাষ্টমীর দুই চারি দিন পরে শুনিলাম যে, শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে যাত্রীরা ব্রজ-চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণে যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা-স্থলী দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদেরও বড় ইচ্ছা হইল। আমি ও আমার বন্ধুতে মিলিয়া যাত্রীদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলাম। বৃন্দাবন-ধামের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক ব্রহ্মচারীজী আমাদের বলিলেন যে, যাত্রীরা রাস্তায় অনিয়ম, দূষিত আহার ও জল পান করিয়া দুরন্ত গরমে তপ্ত বালি ও কাঁটা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া যায়। এই সব অত্যাচার এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনেকেই নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের জন্য যদি পথে ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অনেকের বিশেষ উপকার হয়। আমরা ব্রহ্মচারীজীর নির্দ্দেশমত কতকগুলি হোমিওপ্যাথি-ঔষধ লইয়া বৃন্দাবন-বিহারীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাদ্র ত্রয়োদশীতে ৩টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রতিবৎসর ভাদ্র কৃষ্ণাদশমীর দিন ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণের জন্য যাত্রীরা বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া বাহির হইত এবং সন্ধ্যায় মথুরায় শ্রীশ্রীভূতেশ্বর মহাদেবের স্থানে আসিয়া, মথুরার চৌবে পাণ্ডা ও অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, পরদিন অতি প্রত্যুষে আবার পথ চলিত, কিন্তু গত বৎসর এই চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চৌবে পাণ্ডা ও বৃন্দাবনের ব্রজবাসী

পাণ্ডাদের সহিত পয়সা ও প্রাধান্য লইয়া বিবাদ এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এবার যাত্রার অন্য রকম ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের হুকুমে মথুরার দলের তিন চারি দিন পরে ব্রজবাসী দলকে যাত্রা করিতে হইয়াছিল।

৮৪ ক্রোশ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বদিন বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করিতে হয়। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি ও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করিলাম। সন্ধ্যাকালে ৺গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরে একত্রিত হইয়া ভাগবতপাঠ নামসংকীর্ত্তন এবং যাত্রার নানাবিধ আলোচনা প্রভৃতি কর্ম্মে অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত করিলাম। তাহার পর যে যাহার স্থানে ফিরিয়া গেলেন। আমরা জয়পুররাজ-প্রতিষ্ঠিত নূতন মন্দিরে বাকি সময়টুকু কাটাইয়া দিলাম। অতি প্রত্যুষে যাত্রীদের সহিত একত্রিত হইয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হইলাম।

এখানে বৃন্দাবন-ধাম ও উহার অন্যান্য স্থানগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইলে মন্দ হইবে না।

ই, আই, রেলওয়ের হাত্রাস জংসন ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ পোয়া রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া হাত্রাস সিটি ষ্টেশনে বি, বি সি, আই রেলওয়ের ছোট গাড়িতে বদলী করিয়া মথুরা জংশন ষ্টেশনে আসিতে হয়। এখানে বৃন্দাবনের গাড়ি প্রস্তুত থাকে। গাড়ি বদল করিয়া বৃন্দাবনে আসিতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে। কেহ কেহ মথুরা হইতে একা অথবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া থাকেন। বৃন্দাবন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই, ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ দলে দলে আসিয়া পিতার নাম, জিলা, গ্রাম প্রভৃতির নাম, বৃন্দাবনে আগন্তুকের পাণ্ডা আছে কি না—যদি থাকে তাহার নাম ইত্যাদি তত প্রকার প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় খাতা খুলিয়া আগন্তুকের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কে কবে শ্রীধামে আসিয়া কোন পাণ্ডাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠের ছাড়পত্র পাইয়াছিলেন, তাহার নজির দেখাইবার জন্য মহা গোলযোগ সৃষ্টি

করে। যাহা হউক, উহারই মধ্যে কোনও পাণ্ডাকে মনোনীত করিয়া লইতে হয়। কারণ স্থানীয় পাণ্ডা ভিন্ন তীর্থদর্শন সুসম্পন্ন হয় না।

যাঁহারা তীর্থদর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন ও যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে আসেন। পাণ্ডার বাড়ীতে থাকিবার সুবিধা না হইলে এবং পাণ্ডাকে বলিলে উাহারা অন্যত্র থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দেয়।

বাসায় কিছুকাল বিশ্রাম করিবার পর সময় ও সুবিধা হইলে যমুনা স্নান ও অন্যান্য নানাবিধ তীর্থক্রিয়াদি করিতে হয়। যমুনা স্নানকালে পাণ্ডারা যাত্রিগণকে একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া থাকে যে, বৃন্দাবনে অন্য কোনও পাণ্ডাকে তাহারা বরণ করিবেন না—এমন কি তাঁহাদের বংশের কেহ কখনও উক্ত পাণ্ডা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা তীর্থক্রিয়াদি করাইতে পারিবেন না। স্নান-ক্রিয়াদি সারিয়া দর্শনার্থী ৺গোবিন্দজীকে দর্শন করিবেন এবং ইচ্ছামত ভেট বা প্রণামী দিবেন। এই ভেটের টাকার হিসাবে যাত্রীর নামকরণ হইয়া থাকে—যথা ২৲ টাকা অথবা তদূর্দ্ধ সংখ্যা ভেট দিলে ৺গোবিন্দজীর আশীর্ব্বাদী একখণ্ড লাল কাপড় মস্তকে জড়াইয়া দিয়া থাকে, এই লাল "উপন্না"ধারীকে "লাল যাত্রী" বলে। ১০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ ভেট দিলে জরির ঝালরযুক্ত কাপড় মস্তকে ধারণ করিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ "শিরপা"ধারীকে "শেঠযাত্রী" অথবা "শোভাযাত্রী" বলিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বৃন্দাবন-ধামের অধিকাংশ তীর্থগুলি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্য শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা অবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় ব্যাকুল হন এবং অনেক কঠোর তপস্যা করিয়াও ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া হতাশ হইয়া প্রায়োপবেশনে শরীর ত্যাগ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মকুণ্ড-

তীরে করুণস্বরে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহসঙ্গীত গাহিতে-ছিলেন। ভাবে বিভোর হওয়ায় নয়নের জল আর কিছুতেই বাধা মানিতেছিল না। এমন সময় একটি ব্রজবালক একভাঁড় দুধ লইয়া আসিল এবং ভাঁড়টি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া নিজ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাঁহার নয়ন মার্জ্জন করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। শ্রীরূপ বালকের অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং মিষ্ট ব্যবহারে মোহিত হইলেন। বালকের পুনর্দর্শনলালসায় তাঁহার আবার বাঁচিতে সাধ হইল। তিনি দুগ্ধ পান করিলেন। কিন্তু দুগ্ধ পান করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে উহা দুগ্ধ না অমৃত। শূন্য ভাঁড় রাখিয়া এই বিস্ময়কর ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন-কিছু পরে শূন্য ভাঁড়টিও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রজনন্দন যশোদা দুলাল তাঁহাকে দর্শন দিয়াও বঞ্চনা করিয়া গিয়াছেন। ক্ষোভে দুঃখে তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অবসন্ন শরীর ও মন রাত্রে নিদ্রার কোলে ঢুলিয়া পড়িল। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেই বালক অতি মধুর স্বরে বলিতেছে—"সে যোগপীঠ নামক স্থানে মাটির নীচে আছে এবং শ্রীরূপ যেন তাহাকে উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠা ও সেবা করেন।" স্বপ্নে ইহাও জানিতে পারিলেন যে, যে স্থানে মাটির উপর একটি দুগ্ধবতী গাভী তাহার স্তন্যধারা ঢালিতেছে সেই স্থানটিকেই যোগপীঠ বলে এবং সেই স্থানেই শ্রীরূপের ইষ্ট শ্রীশ্রীগোবিন্দজী আছেন। পরদিন গোস্বামীজী স্বপ্ন-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মাটি খুঁড়িয়া ৺গোবিন্দজীর বিগ্রহমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং যোগপীঠের নিকটেই কুঁড়ে তৈয়ার করাইয়া শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেই দেবসেবা করিতে লাগিলেন।

অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিং বাঙ্গালা দেশ হইতে নিজ রাজ্যাভিমুখে ফিরিবার কালে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে আসেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর অদ্ভুতভাবে প্রাপ্ত বিগ্রহমূর্ত্তির গঠন-নৈপুণ্য ও গোস্বামীজীর আন্তরিক সেবা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে মনস্থ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই সুদৃশ্য লাল

প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়া রাজার দেবতাপ্রীতির গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল এবং শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপ প্রকাণ্ড সুগঠিত ও সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত মন্দির এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। শুনা যায়, গোবিন্দজীর মন্দিরই বৃন্দাবনে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মন্দিরের চূড়া অত্যুচ্চ থাকায় মুসলমান সম্রাট্ আরঙ্গজেব তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ হইতে ইহার আলো দেখিতে পান, এবং হিন্দুর দেবমন্দিরের চূড়া তাঁহার প্রাসাদ-চূড়া হইতেও উচ্চতর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনাকরতঃ উহার উপরাংশ ভগ্ন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। শীঘ্রই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল, এবং এই ভগ্ন মন্দিরের মালমসলা লইয়া নিকটেই একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইল। সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া নমাজ করিলেন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। প্রবাদ আছে যে, মন্দির ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক ভগ্ন হইবার আগেই গোবিন্দজীর পুরোহিত বিগ্রহমূর্ত্তি লইয়া জয়পুরে পলায়ন করেন এবং সেই অবধি ৺গোবিন্দজী বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই।

হিন্দুদেবদ্বেষী আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানগণ বৃন্দাবনে বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করে এবং এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ৺মদনমোহনজী এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তিগুলিকে নিকটবর্ত্তী হিন্দুরাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। ৺মদনমোহনের মূর্ত্তিটিকে জয়পুর রাজার শ্যালক কশৌলীরাজ নিজ রাজধানী কশৌলীতে রক্ষা করেন। এখনও কশৌলীতে ৺মদনমোহনজী ও জয়পুরে ৺গোবিন্দজীর সুবৃহৎ মন্দির আছে এবং বিগ্রহমূর্ত্তির নিত্য সেবা গৌড়ীয় গোস্বামীদের দ্বারা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, মুসলমান অত্যাচার বন্ধ হইলে দেবমূর্ত্তিগুলিকে বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনা হয় এবং নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই রাখা হয়। ৺গোবিন্দজীকেও বৃন্দাবনের সেই পুরাতন মন্দিরে রাখা হয় নাই। এই পুরাতন মন্দিরের নিকটে ২৪ পরগণা বহড়ুর গ্রামনিবাসী জমিদার দেওয়ান নন্দকুমার বসু একটি নূতন

মন্দির তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন এবং অদ্যাবধি সেই মন্দিরে ৺গোবিন্দজী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত বিরাজ করিয়া শত শত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। ভগ্ন মন্দির এখন গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির নামে আখ্যাত হইতেছে এবং এই মন্দিরের নিকটেই যোগপীঠে ৺মহামায়া পূজিত হইয়া থাকেন। এই যোগপীঠ শ্রীরূপ গোস্বামীর সাধনস্থান বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনন্তর ৺গোবিন্দজী দর্শন করিয়া ৺মদনমোহন দর্শন করিতে হয়। এই স্থানেও ৺গোবিন্দজীকে যেরূপ ভেট দিতে হইয়াছে, সেইরূপ দিতে হয়।

৺মদনমোহন-বিগ্রহ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে।

শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন ইহা নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতবর্ণিত বনশোভা ও জয়দেববর্ণিত ইহার বসন্তশোভা কেবল কবিকল্পনাই ছিল। পৌরাণিক বৈভব এখন আর, নাই ৪৫০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান অত্যাচারে ইহা প্রকৃতই মহারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। মুসলমান শাসনে পরাধীন হিন্দুজাতি দেবতার জন্য ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পণ—আত্মোৎসর্গ একবারেই ভুলিয়া গেলেন। দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু আপন জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া—ভক্তি ও শক্তি হারাইয়া সেই পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামসদৃশ বৃন্দাবন বন্যজন্তুর আবাস মহারণ্যে পরিণত করিল। গৃহী আর সেই পবিত্র বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না, কাজেই কেবল সন্ন্যাসী ও সর্ব্বত্যাগী বিরক্ত বৈষ্ণব ভিন্ন সেই পবিত্র ভগবানের লীলাস্থানে কেহই আসিতে সাহস করিতেন না। ব্রজবাসী সকলে যে যেখানে সুবিধা পাইলেন, নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত. শ্রীগৌরাঙ্গ সপারিষদে বৃন্দাবনে আসিয়া ভগবানের লীলাস্থানগুলি প্রথমে খুঁজিয়া পাইলেন না কিন্তু পরে

নিজ ঐশী শক্তিপ্রভাবে উহাদের উদ্ধারের উপায় কতকটা করিয়া যান এবং শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগকে ব্রজধামের লীলাস্থানগুলি উদ্ধার করিতে অনুজ্ঞা করেন। পার্ষদেরা শ্রীগুরুর আজ্ঞানুযায়ী সেই অরণ্যে বাস করিয়া লীলাস্থানগুলি উদ্ধার করিতে থাকেন এবং ক্রমে সেই বৃন্দারণ্য বৈষ্ণব তত্ত্বপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র করিয়া প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত করিলেন। কথিত আছে যে, সম্রাট্ আকবর বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সামন্তরাজপরিবৃত হইয়া রূপ সনাতনের নিকট আসিয়াছিলেন। নানা দিগ্ দেশ হইতে শত শত সাধু ভক্ত গোস্বামিদ্বয়ের নিকট অপূর্ব্ব ভাগবততত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ সেই বিশাল ও বিজন অরণ্য আবার ব্রজবালক বালিকায় পূর্ণ হইয়া পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালপ্রভাবে ইহা আর সুন্দর কুঞ্জকাননশোভিত, কদম্ব তমাল-তরুরাজিবেষ্টিত সেই বৃন্দাবন নাই—এখন ইহা বৃহৎ অট্টালিকাপূর্ণ সহরে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকিয়া সাধনে ও প্রচারে রত হইলেন—কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রত্যহ সকালে মথুরায় মাধুকরি করিতে যাইতেন—মাধুকরি অর্থাৎ মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা স্থান হইতে আহার আহরণ করা। ব্রজমণ্ডলে এই মাধুকরি প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ সাধু ও বৈষ্ণবকে দিয়া থাকেন। বিরক্ত বৈষ্ণবের এবং অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর ইহাই একমাত্র পবিত্র ভিক্ষালব্ধ অন্ন।

একদিন সনাতন মথুরায় এইরূপ ভিক্ষায় গিয়াছেন এবং চৌবে ব্রাহ্মণের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন, কোনও চৌবে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর সুদৃশ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; মূর্ত্তিটীর উপর তাঁহার মন বড়ই আকৃষ্ট হইল। সেইদিন হইতে তিনি প্রত্যহই এইস্থানে আসিতেন ও মদনমোহনকে প্রথমে দর্শন করিয়া অন্যত্র ভিক্ষায় গমন করিতেন। একদিন মথুরা পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ বোধ হয়

মূর্ত্তিটীর দর্শন পাইবেন না, এবং দুঃখিতান্তঃকরণে সেই চৌবের বাড়ীতে আসিলেন—আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, সেই বিগ্রহ মনোহর মদনমোহন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, চৌবে বালকগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে ও বালসুলভ চঞ্চলতাবশতঃ চৌবে গৃহিণী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছে। সনাতন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন এবং একদৃষ্টে সেই সুঠাম বালককে দেখিতে লাগিলেন। বালকদের আহার শেষ হইলে, রমণী মাধুকরি লইয়া সনাতনকে আহ্বান করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মাধুকরি লইলেন না, সেই মদনমোহনরূপী বালকের উচ্ছিষ্ট প্রসাদস্বরূপ ভিক্ষা করিয়া লইলেন ও তাহাই ভোজন করিলেন। অন্যত্র ভিক্ষা করিতে আর সেদিন প্রবৃত্তি হইল না। তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। একাগ্রমনে বালকের ভোজনকালীন ব্যবহার স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, সেই বালক তাঁহার নিকট আসিয়া অতি মধুর স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, "তুমি আমাকে মথুরা হইতে আনিয়া নিজে যমুনার জল ও তুলসী দ্বারা পূজা করিও।" এদিকে চৌবের স্ত্রীকেও জানাইল যে তাঁহাকে যেন সনাতনের হস্তে দেওয়া হয়। পরদিন সনাতন অতি মাত্র পুলকিত হইয়া মথুরায় চৌবের বাড়ী আসিলেন ও চৌবে গৃহিনীকে নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রমণী কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে মদনমোহন সমর্পণ করিলেন। মূর্ত্তিটী পাইয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং একটি উচ্চ টিলার উপর কুঁড়ে প্রস্তুত করিয়া বিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন। মদনমোহনকে মথুরা হইতে আনিয়া অবধি সনাতন মাধুকরি ত্যাগ করিয়া মুষ্টি ভিক্ষাই করিতে লাগিলেন ও তাহাতে যাহা আটা পাইতেন তাহার "আঙ্গাকড়ি" অর্থাৎ এক-প্রকার অতি পুরু ক্ষুদ্রাকার রুটি প্রস্তুত করিয়া ভোগ দিতেন ও নিজে সেই প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। অদ্যাবধি মদন-

মোহনকে আঙ্গাকড়ি ভোগ না দিলে পূজা সফল হয় না। কৌপীন মাত্র সম্বল ভিক্ষু সনাতন এই আঙ্গাকড়ি ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভোগ তাঁহার অতি প্রিয়তম দেবতাকে নিবেদন করিতে পারিতেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই বিষণ্ণ হইতেন। একদিন মুলতানবাসী কৃষ্ণদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী অতি দীনভাবে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া কাতরভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার পণ্যবাহী নৌকা নিকটস্থ কালীদহ ঘাটের বালির চরে আটকাইয়া গিয়াছে, কিছুতেই টানিতে পারা যাইতেছে না—তিনি যদি কৃপা করিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন তাহা হইলেই নৌকা ভাসিয়া উঠিবে। সনাতন শ্রেষ্ঠীর কাতরতা দেখিয়া দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে সম্মত হইলেন ও তাঁহাকে লইয়া বিগ্রহের নিকট আসিয়া নৌকা ভাসিয়া উঠিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রেষ্ঠী ঘাটে আসিয়া দেখিতে পাইল যে, নৌকা ভাসিয়া উঠিয়াছে ও তাহার লোকেরা অনেকে কলরব করিতেছে। চীরধারী ভিক্ষুর উপর দেবতার অশেষ কৃপা স্মরণ করিয়া শ্রেষ্ঠী বিস্মিত হইল এবং মনে মনে মদনমোহনের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিয়া আগ্রা অভিমুখে নৌকা লইয়া প্রস্থান করিল। আগ্রায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত পণ্য আশাতীত মূল্যে বিক্রয় করিল এবং মন্দির নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত বস্তু ও রাজমিস্ত্রি লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া সেই টিলার উপরেই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বিগ্রহের সেবা ও ভোগরাগের সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদনমোহন সামান্য কুটীর ছাড়িয়া সেই বৃহৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই মন্দিরে এখন আর মদনমোহনজী নাই। আরঙ্গজেবের অত্যাচারে এই শ্রীমূর্ত্তিও জয়পুরের নিকটবর্ত্তী কশৌলী রাজ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। কশৌলীরাজ নিজ রাজধানীতে সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গৌড়ীয় গোস্বামী দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও সেই মন্দিরে মদনমোহনজীর সেবা ও পূজাদি রাজব্যয়ে নির্ব্বাহ করা হইতেছে।

বৃন্দাবনে যে মন্দিরে এখন মদনমোহনজী বিরাজিত আছেন তাহা

বহতুর নিবাসী দেওয়ান নন্দকুমার বসু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে সম্রাটের একজন হিন্দু আমিন এই অঞ্চলে রাজকর আদায় করিতেন, তিনি এই মদনমোহনের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, যাহা কিছু রাজকর আদায় করিতেন সমস্তই বিগ্রহের সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এই অমিতব্যয়িতার জন্য সরকারের বিস্তর প্রাপ্য কর বাকি পড়িয়া যায় এবং তিনি দিল্লীতে কারারুদ্ধ হন। পরে কোন উপায়ে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন ও সমস্ত ত্যাগ করিয়া মদনমোহনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীমদনমোহন কারাগারে তাহাকে দর্শন দেন ও তাহাকে তথা হইতে মুক্ত করিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করেন। যাহা হউক, ইনিই পরে ভক্ত সুরদাস নামে আখ্যাত হন। ইঁহার রচিত ভক্তিরসাত্মক বহু সঙ্গীত আজিও ব্রজমণ্ডলে অতি আনন্দের সহিত গীত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমদনমোহন দর্শন করিয়া মধু পণ্ডিত স্থাপিত ৺গোপীনাথ দর্শন করিতে হয়। বংশীবটের নিকট গোপীনাথবাজারে ইঁহার সুবৃহৎ মন্দির ও সুন্দর স্থাপত্যনৈপুণ্যযুক্ত নাটমন্দির কচ্ছবাহ ঠাকুর-বংশীয় রায় সিংহ নামক এক সর্দার প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচারে এ মন্দিরও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পুরাতন মন্দিরের নিকটেই—"গোপীনাথ ঘেরায" ৺গোবিন্দজী ও ৺মদনমোহন জীর নূতন মন্দিরনির্ম্মাতা দেওয়ান নন্দকুমার বসু গোপীনাথের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

এই প্রধান তিন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাত্রীদের আপন আপন "গুরুপাট" দর্শন করিতে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত যাত্রিগণের এখানে অনেক গুরুপাট আছে। যথা, নিত্যানন্দ পরিবার, অদ্বৈত বা সীতানাথ পরিবার, আচার্য্য প্রভুর পরিবার ইত্যাদি। এই সকল বংশের গোস্বামী প্রভুরা যথায় বাস করেন সেই সকল স্থানকেই "গুরুপাট"

বলিয়া থাকে। তীর্থাদি দর্শন করিয়া কুলগুরুর ভেট না দিলে তীর্থ-ক্রিয়া সফল হয় না বলিয়া শুনা যায়।

শৈব ও শাক্ত যাত্রীদের গুরুপাট পূর্ণমাসী ও কেশেশ্বরী কৃষ্ণকালীর কুঞ্জ—এই উভয় স্থানে সম্প্রদায়ভেদে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়।

গুরুপাট দর্শন ও দক্ষিণাদি দ্বারা গুরুপূজা করিয়া যমুনা ও বৃন্দা-পূজা করিতে হয়। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর ও সর্ব্বকলুষ-নাশিনী যমুনা দেবীর পূজা না করিলে যাত্রিগণের বৃন্দাবনযাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। এই ছয়টি অবশ্য করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য দেব দর্শন করা কর্ত্তব্য।

বৃন্দাবনে প্রায় ৫০ সহস্র দেবালয় আছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলির নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ—এখানে লোকনাথ গোস্বামী ৺রাধাবিনোদ নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আজীবন তাঁহার সেবায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত, প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর এই লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য। গুরু শিষ্য উভয়ের সমাজ এখানেই আছে। এখানে যাত্রীদের নিকট এক আনা করিয়া ভেট লওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরাধারমণ—গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যস্থ বিগ্রহমূর্ত্তি ক্ষুদ্র। ইঁহার অনেক প্রকার বেশ হয়, এবং এই বেশ দেখিবার জন্য বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরাধা দামোদর—শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামিদ্বয়ের সমাজ বা সমাধি আছে।

মন্দিরের দক্ষিণে একটি অতি প্রাচীন বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারায় ক্লান্ত হইয়া ব্যাকুল চিত্তে এই বৃক্ষের তলায় বসিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের নিকটে শ্রীজীব গোস্বামীর সাধনকুটীর অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার

পর রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। দেববন-বাসী হরিবংশ নামে এক গৌড়ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য আশ্রয় করতঃ বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হোদল-গ্রামে অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষার্থ গমন করেন। ব্রাহ্মণ অতিথিকে যথাসাধ্য ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতিথি উচ্চবংশীয় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পরিচয় পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। তাহার পর অতি বিনীতভাবে আর্থিক অসচ্ছলতা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার দুইটি কিশোরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হরিবংশ ব্রাহ্মণের কাতরতায় বিচলিত হইলেন ও কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়া নব পরিণীতা পত্নীদ্বয়সহ বৃন্দাবনে আসিলেন। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তাঁহার নূতন শ্বশুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন, ইনি সেই মূর্ত্তি বৃন্দাবনে লইয়া আসেন ও প্রতিষ্ঠা করেন। শুনা যায়, হরিবংশ স্বভাবতঃ বড়ই রসিক ছিলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় বিবাহ করিয়া তিনি আরও রসিক হইয়া পড়েন এবং পত্নীদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিবার জন্য "কিশোরী ভজন" ও "কামসাধন" প্রভৃতি মত চালাইয়া দেন। প্রথমে ইহাঁর ধর্ম্মকে কেহই বিশ্বাস করিত না কিন্তু পরে ইহার অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল।

নিধুবন—এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকা রাজা হইয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে কোটাল সাজাইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এখানে বাঁদরের বড় উপদ্রব—যাত্রীরা এই বনে আসিবার সময় কিছু ছোলাভাজা সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং বনে প্রবেশ করিয়াই ছোলাগুলি ছড়াইয়া দেন। বড় বড় বিকট বাঁদরের পাল সেই ছোলাভাজা কুড়াইয়া লইয়া খাইতে থাকে ও সেই সময়ে যাত্রিগণ কুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আছে।

নিকুঞ্জবন বা সেবাকুঞ্জ—শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। স্থানটি এখনও

বকুল, তমাল রাজিতে শোভিত। কুঞ্জের ভিতর শ্রীমতীর পট পূজা হইয়া থাকে—কৃষ্ণ নাই। এখানে কেহ কেহ ফুলসজ্জা দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে দানগলি মানগলি প্রভৃতি আরও অন্যান্য স্থান আছে।

শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী—সম্রাট্ আকবরের সময় স্বামী হরিদাস নামে এক পরম ভক্ত সাধু নিধুবনে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার অসাধারণ ত্যাগ বৈরাগ্য ও অপূর্ব্ব প্রেম ভক্তি দর্শনে বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। স্বামিজী একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আকবরের প্রিয় গায়ক মিঞা তানসেন ইঁহারই শিষ্য ছিলেন। গুরুর কৃপায় তানসেন অপূর্ব্ব সঙ্গীতশক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতের সঙ্গীত-গুরুরূপে পূজিত হইতেন। এখনও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভক্তিনম্র-শিরে মিঞা তানসেনের নাম করিয়া থাকেন। আকবর তানসেনের নিকট স্বামী হরিদাসের অসাধারণ সঙ্গীতশক্তির পরিচয় শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে স্বামিজীর ভক্তি-রসাত্মক গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বামিজীকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ত্যাগী বৈরাগ্যবান্ সাধু তাহা গ্রহণ করেন নাই। ৺বঙ্কুবিহারী হরিদাসের ইষ্টদেবতা—ইষ্টদেবতাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, স্বামিজী তাঁহার সাকার মূর্ত্তির দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইলেন। ভক্ত নিজ উপাস্যকে নানাভাবে উপভোগ করিতে চাহেন এবং ভক্তের ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপাসকের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন। স্বামিজীর ইচ্ছা হইবামাত্র স্বপ্নে ইষ্টদেবতা দর্শন দিলেন ও সেই স্থানের মাটির ভিতর হইতে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া সেবা করিবার আজ্ঞা দিলেন। পরদিন স্বামিজী সেই স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারীকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে স্বামিজীর শিষ্যগণের ব্যয়ে ৺বঙ্কুবিহারীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল স্বামিজীর বংশধর সেবাইতগণের উদ্যোগে ও নানা দেশীয় শিষ্যগণের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিহারীজীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের

কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শকের মন মোহিত করিয়া রাখে। বিহারীজীর ঝাঁকি দর্শন প্রসিদ্ধ। বিগ্রহের গঠন নৈপুণ্য এত সুন্দর যে, একবার দেখিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে যে, কোনও যুবতী এই মূর্ত্তি দেখিয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, তিনি সমস্ত ভুলিয়া এই মূর্ত্তিটিকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন, কিন্তু পুরোহিতগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলে ও মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে বাধা দেয়। ইহাতে যুবতী অধৈর্য্য হইয়া সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান, তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। তদবধি এইরূপ ঝাঁকি অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে—কেহই ক্রমান্বয়ে এক মিনিট কালও দর্শন করিতে পান না। দেবতা একটু দীর্ঘ বিশ্রামপ্রিয় বলিয়া দর্শন সকাল ৯॥০ এবং সন্ধ্যায় ৮।০ টার পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। বৎসরে একবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিহারীজীর সম্পূর্ণ—অর্থাৎ চরণ দর্শন হইয়া থাকে। মদনমোহন দর্শন করিয়া আসিবার কালে এই মন্দির রাস্তায় পড়ে।

শেঠের মন্দির—এই মন্দিরে অনেক দেবতা আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গজী প্রধান। শ্রীরামানুজ প্রবর্ত্তিত "শ্রী" সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃন্দাবনে পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি শাখা আছে—বড়গলৈ ও তেঙ্কল। তেঙ্কল শাখার শিষ্য প্রসিদ্ধ ধনকুবের শেঠ লছমীচাঁদ এই বৃহৎ কৈলাসদৃশ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যনৈপুণ্য ইহাতে বর্ত্তমান। এত বড় মন্দির বৃন্দাবনে—এমন কি সমগ্র উত্তর ভারতে আর নাই। শেঠ লছমীচাঁদ প্রথমে জৈন ছিলেন, তৎপরে তেঙ্কলগুরুর মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়েন। ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক বড় বড় মন্দির আছে। মথুরায় দ্বারিকাধীশের সুবৃহৎ মন্দিরও ইঁহার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

লালাবাবুর মন্দির—কায়স্থকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবুর নাম বাঙ্গালীর নিকট অবিদিত নাই। লালাবাবুর অদ্ভুত ত্যাগের কাহিনী বাঙ্গালী কেন সমগ্র হিন্দু ভক্ত ভারতবাসীই

অল্পবিস্তর শুনিয়াছেন। ইনিই এই সুবৃহৎ মন্দির ২৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডের সংস্কারও ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। পুণ্য তীর্থ জ্ঞানে এই মন্দির দর্শন করিবার জন্য নানা দেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ আসিয়া থাকেন। মন্দিরস্থ বিগ্রহ ও অতিথিসেবার জন্য লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তিও লালাবাবু দান করিয়া গিয়াছেন। সেই সম্পত্তি হইতে দেবসেবা এবং শত শত অতিথি অভুক্তের রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপিত আছে।

ব্রহ্মচারীর কুঞ্জ বা মন্দির—গোয়ালিয়র রাজের অর্থানুকূল্যে তদীয় গুরু ব্রহ্মচারীজীর নামে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোপাল, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীশ্রীহংসগোপাল নামে তিনটি বিগ্রহমূর্ত্তি আছেন। নিত্য সন্ধ্যাকালে রাসযাত্রা হইয়া থাকে। বালকগণ কৃত এই রাসলীলা ও রাসগীতি শুনিবার জন্য বহুলোকসমাগমে এই স্থান সন্ধ্যাকালে মুখরিত হইয়া উঠে।

সাহাজীর মন্দির—বোম্বাই প্রবাসী কোনও ধনাঢ্য শেঠ এই শ্বেত পাথরের বৃহৎ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নাটমন্দির, বৈঠকখানা, বাঁকা বাকা থাম, মেজে ও প্রাচীরে সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত নানা বর্ণের ছবিগুলি দর্শকের মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। শ্রীপঞ্চমীর দিন এখানে একটি উৎসবও হয়—বহু দূর দেশ হইতে আগত ভক্তেরা, এই উৎসবে বিচিত্র আলোকমালায় ভূষিত অপরূপ শোভান্বিত মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকেন।

গোপীনাথবাজার ও ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যপথে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কুঞ্জ আছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই স্থানে সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। ভক্ত সাধকগণ এই স্থান দর্শন করিতে সর্ব্বদাই আসিয়া থাকেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধামাধবজীর বিগ্রহমূর্ত্তি আছে। ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণ বলেন যে, এই বিগ্রহটিকে শ্রীজয়দেব গোস্বামী ঝুলিতে করিয়া আনিয়া স্থাপন করেন।

বৃন্দাবনের পশ্চিমদিকে শ্রীগরুড়-গোবিন্দ নামে একটি মনোহর স্থান আছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য রাখাল বালকগণ গোচারণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া পড়েন এবং বৃক্ষের নীচে বসিয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ খেলা করিবার পর তাঁহার কোনও নূতন ধরণের খেলা করিবার ইচ্ছা হইল এবং সখা শ্রীদামকে গরুড়রূপে উপবেশন করাইয়া নিজে উহার পিঠে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে উপবেশন করিলেন। রাখাল বালকেরা হঠাৎ তাঁহার অন্য রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল ও বাড়ী ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতরূপে ক্রীড়া করিবার সংবাদ পিতা, মাতা ও অন্যান্য গোপগণকে জানাইল। পরদিন ব্রজবাসী বৃদ্ধ গোপেরা উক্তস্থান দর্শন করিতে আসিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে দর্শন দিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপবৃন্দের অনুরোধে পূর্ব্বদিনের ন্যায় চতুর্ভুজ হইলেন এবং সেই নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গোপ ও রাখালবালকগণ মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বনজ ফল ও পুষ্পের দ্বারা পূজা করিল। অদ্যাবধি শ্রাবণের শুক্লা-অষ্টমীর দিন এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে এবং ঐ দিবস মথুরা, বৃন্দাবন ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ হইতে বহু লোক আগমন করিয়া বিগ্রহ দর্শন ও মেলার শোভা বর্দ্ধন করে।

(ক্রমশঃ)

মাধবদেব।

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

মাধদেবের পিতার নাম গোবিন্দ।* তিনি বাণ্ডকা নামক গ্রামে বাস করিতেন। পত্নীবিয়োগে শোকসন্তপ্ত গোবিন্দ পুত্র দামোদরকে বাণ্ডকায় রাখিয়া স্বয়ং বরদোয়ায় টেম্বুষানিবন্ধে প্রস্থান করেন। তথায় শঙ্করদেবের সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মে। গোবিন্দ অবশেষে জনৈকা শঙ্করাত্মীয়ার পাণিগ্রহণ করেন। কাছাড়ীদিগের উপদ্রববশতঃ শঙ্করদেবের ন্যায় গোবিন্দও সভার্য্য বাসস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ভুলিয়াগণ কর্ত্তৃক হৃত সর্ব্বস্ব হন। অবশেষে হরশিঙ্গা নামক জনৈক অসমীয় রাজকর্ম্মচারী নিঃসহায় গোবিন্দকে স্বগৃহে আশ্রয় দান করেন।

এই স্থলে ১৪১১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে, কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদ তিথি, রবিবার, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মাধবদেবের জন্ম হয়। গোবিন্দ পুত্রের দুইটী নাম রাখিলেন,—

করিয়া গণতি নাম থৈলা দুটী
মাধব রতনাকর।
প্রখ্যাত মাধব নাম ভৈলা তান
গুপুত ভৈলা অপর॥

কালে গোবিন্দ বিষম অর্থসঙ্কটে পতিত হইলেন। বিপদে পড়িয়া স্বতঃই তাঁহার সুদিনের বন্ধুবর্গের কথা মনে পড়িল। তিনি তাহাদিগের দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু দুর্দ্দিনে কেহই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে সম্মত হইল না। উৎসব, ব্যসন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজদ্বার ও শ্মশানে যিনি সমভাবে প্রিয়জনপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ বন্ধুর

---

* ইঁহার অন্যান্য কতিপয় নামও দৃষ্ট হয়।

সংখ্যা মুষ্টিমেয়। হুতাশনে যেরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, তদ্রূপ বন্ধুর পরীক্ষা বিপদ সময়ে। সত্য বটে, গোবিন্দের বন্ধুর নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু তাহাদিগের প্রায় সমস্তই সুদিনের বন্ধু, দুর্দ্দিনের নহে। এই বন্ধুপরীক্ষায় এক মাঝি মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। গোবিন্দ এই বন্ধুর গৃহে কতিপয় বর্ষ সুখে অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানে তাঁহার সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা উর্ব্বশীর জন্ম হয়।

উর্ব্বশীর বিবাহকাল সমাগত প্রায় হইলে মাধবদেব জনকজননী-সমভিব্যাহারে পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইয়া টেম্বযানিবঙ্কে উপস্থিত হন। তথায় গয়াপাণি নামক জনৈক সুদর্শন ও সদ্বংশজাত কায়স্থ যুবকের সহিত উর্ব্বশী পরিণয়পাশে আবদ্ধা হন।

কিয়ৎকাল গত হইলে ভার্য্যা মনোরমাকে জামাতৃগৃহে রাখিয়া গোবিন্দ পুত্রের সহিত বহুকাল-পরিত্যক্ত বাণ্ডুকায় প্রত্যাগমন করিলেন। বহুকাল পরে পিতাকে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাধবকে প্রাপ্ত হইয়া দামোদর অতীব আনন্দিত হইলেন। বাণ্ডুকায় কিয়ৎকাল অবস্থিতির পর গোবিন্দের মৃত্যু হইল। পুত্রদ্বয় পিতার যথোচিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর মাধবদেব মাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া স্বীয় প্রাপ্য পিতৃ বিষয়সম্পত্তির জন্য পুনরায় বাণ্ডুকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কিয়দ্দিবস সুখে বাণ্ডুকায় কালাতিপাত করিলেন। বিষয়সম্পত্তির স্বীয় প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইয়া মাধবদেব চিন্তা করিলেনঃ—

ইসব দ্রব্যত কোন সার নাহিকন্ত।
ইথানত নাহি কিছু ভক্তি আলোচন॥

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অংশ তিনি অগ্রজকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

মাধব মাতৃচরণদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জননীর রোগের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দেবীপূজায় এক জোড়া শ্বেতছাগ

মানসকরতঃ অনতিবিলম্বে মাতৃ-সকাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাতা ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃ-গত-প্রাণ পুত্র মাতাকে সুস্থ অবলোকন করিয়া দারুণ চিন্তাভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

মাধব ভগ্নীপতি রামদাসকে (গয়াপাণি শঙ্কর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রামদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) একজোড়া শ্বেতচ্ছাগক্রয়ের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিলেন। পূজার সময় সমাগত প্রায়, কিন্তু রামদাস ছাগ আনয়ন করিতেছেন না দেখিয়া মাধব ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। রামদাসও সহজ পাত্র নহেন। তিনি মাধবদেবের নিকট ছাগবলির অবৈধতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। অবশেষে মাধবকে গুরু শঙ্করের নিকট লইয়া গেলেন।

শঙ্কর মাধবে ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল।
দুইহন্তো তোলন্ত শাস্ত্র দুইহন্তো খণ্ডন্ত।
দুযো কথা কন্ত দুযো দুইক নমানন্ত॥
মাধবে শাস্ত্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহন্ত।
নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্করে খণ্ডন্ত॥
প্রভাতরে পরা তিনি পর বেলি গৈল।
দুইহন্তরো কথা সাঙ্গ তথাপি নভৈল॥

অবশেষে শঙ্করদেব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন।
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ॥
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্।
তথা চ সর্ব্বার্চনমচ্যুতেজ্যা॥

এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া মাধবদেব অবনতমস্তকে শঙ্করের মতকেই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ ও তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এইরূপে শঙ্কর-মাধব-সম্মিলন হইল।

আসাম-গগন অচিরে হরিনামধ্বনিতে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। শঙ্কর-মাধবের সমবেত শক্তি নামধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইল। প্রতি

মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের সময়ে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। শত শত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা প্রবল স্রোতে প্লবমান তৃণের ন্যায় মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত মহাত্মাদিগের মহোদ্যমের নিকট ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

ইতিপূর্ব্বে মাধবদেবের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু মত্ত মধুপের ন্যায় তিনি এক্ষণে যে মধুপানে রত ছিলেন, তাহাতে সাংসারিক সুখবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে ক্ষণকালও স্থান পাইল না। তিনি চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন ও কৌশলে তৎপ্রদত্ত জোড়নের * অলঙ্কার প্রতিগ্রহণ করিলেন।

একদা অহমরাজ বন্য হস্তী ধরিবার জন্য শঙ্করাদি ভূঞাবৃন্দকে হস্তীগড় পরিরক্ষণে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শঙ্কর-রক্ষিত দিক দিয়া কতিপয় হস্তী পলায়ন করে। এই আকস্মিক বিপদে শঙ্কর ও ভূঞাগণ পলায়ন করেন। ক্রুদ্ধ অহমরাজ তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। রাজচরগণ অপর কাহাকেও ধৃত করিতে না পারিয়া শঙ্করজামাতা হরি ও শিষ্য মাধবকে ধৃত করিয়া রাজসকাশে উপস্থাপিত করিল। রাজা প্রধান মন্ত্রীপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, বন্দিদ্বয়ের মধ্যে একব্যক্তি বৈরাগী ও অপরটী সংসারী। জিঘাংসাপরায়ণ নৃপ বৈরাগীকে নিহত করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া সংসারী হরির শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন—বৈরাগী বধ নিষ্ফল, কারণ, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিবার কেহ নাই। হরি বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। মাধব শ্রীশ্রীহরিগুণগান করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে ঘাতককৃপাণে হরির মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইল—ভক্তের মস্তক রাম নামোচ্চারণ করিতে করিতে ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবচরণে লুটাইয়া পড়িল।

অহমরাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত শঙ্কর অহমরাজ্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে, মাধব গুরুর অনুগমন করাই স্থির

* আসামে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপক্ষ হইতে পাত্রীকে অলঙ্কার প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে—ইহাকে জোড়ন কহে।

করিলেন। যাত্রাকালে দুইটী ভক্ত মাধবদেবের নৌকায় স্থান প্রার্থনা করিল। নৌকা লোক ও দ্রব্যে পরিপূর্ণ. সম্পূর্ণ স্থানাভাব; তথাপি মাধবদেব ভক্তগণের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে স্থান দান করিতে ব্যগ্র হইলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় দ্রব্যাদির কিয়দংশ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে স্থান প্রদান করিলেন। শঙ্করদেব ইহা অবগত হইয়া আনন্দভরে বলিয়া উঠিলেন;—

সাধু সাধু মাধব করিলা বড কর্ম্ম।
তুমি সি জানিলা বাপু ভকতর মর্ম্ম॥

শঙ্করদেব স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন, মাধবও ছায়াবৎ সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। শঙ্করের পাটবাউসী অবস্থানকালে মাধব বরাদি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। মাধব প্রত্যহ বরাদি গ্রাম হইতে শঙ্করসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতেন। বরাদি পাটবাউসী হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী বলিয়া শঙ্কর মাধবের জন্য নিকটবর্ত্তী অন্য একস্থানে গৃহের ব্যবস্থা করিলেন।

একদা শঙ্করদেব মাধবের মন পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সংসারসুখে বীতস্পৃহ মাধব উত্তর করিলেন,—

তোমাথের সঙ্গ আসি যি কালত পাইলোঁ।
সেহি কালে জোড়নর কন্যা এড়ি আইলোঁ॥
তোমাথের পদ সেবা করিবে ইচ্ছায়।
এতেক বিবাহ করিবাক বাঞ্ছা নাই॥

হয়ত উপযুক্তা পাত্রীর অভাবনিবন্ধন মাধব বিবাহে অসম্মত হইতেছেন, এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া শঙ্করদেব স্বীয় কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মাধব অবিচলিত-চিত্তে পুনরায় উত্তর প্রদান করিলেন,—

কাঁবো * করোঁ মুবুলিবা বিহা করিবাক।

* মিনতি

আকে লাগি † গুরু মানি নাহিকো তোমাক ॥
যাক আশে গুরু মানি আছোঁ তোমাথেক।
তাক মাত্র শিক্ষা আতা লাগয় দিবেক ॥
অনাদি জনম ভোগ করোঁ বিষয়ক।
তাকে এড়াইবাক কহিয়োক উপায়ক ॥

এইরূপ নানা আলাপন করিয়া মাধবের দৃঢ়সংকল্প সন্দর্শনে শঙ্করদেব সহর্ষচিত্তে মাধবের বহু সাধুবাদ করিলেন।

অতঃপর শঙ্করদেব শতাধিক সহচর সমভিব্যাহারে দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা করিলে মাধবদেবও তদনুসরণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করদেবের দেহরক্ষার পর তৎপুত্র রামানন্দ ঠাকুর মাধবদেবের বাসস্থলে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই নিদারুণ শোকবার্ত্তা প্রদান করিলেন। মাধব এই সংবাদে শোকে অভিভূত হইলেন। কিন্তু শোকেরও সীমা আছে। ক্রমে ক্রমে মাধবদেব শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। শঙ্কর-বিচ্ছেদের বর্ষাধিক কাল পরে রামানন্দ ঠাকুর বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। মাধব দিবানিশি অক্লান্ত ভাবে গুরুপুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মাতা ও ভক্তবৃন্দকে কাঁদাইয়া শঙ্করপুত্র অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

অতঃপর মাধবদেব সুন্দরীদিয়া নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় মনোহর নামঘর নির্ম্মিত হইল। মাধবদেব ও নারায়ণ ঠাকুর * মহোৎসাহে নামধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল।

বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুরবাসী বরবিষ্ণু নামক জনৈক ব্যক্তি আসাম-পর্যটনে বহির্গত হন; কিন্তু প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চন্দ্রভূঞা নামক একব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বরবিষ্ণুর কৃতজ্ঞতা, চরিত্রশীলতা প্রভৃতি গুণবিমুগ্ধ চন্দ্রভূঞা স্বীয়

† আকে লাগি—ইহার জন্য।

* শঙ্করদেবের শিষ্যবিশেষ।

কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নারায়ণ ঠাকুরের নিকট মাধব-মহিমা শ্রবণ করিয়া বরবিষ্ণু মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও সপ্তাহ কাল একান্ত মনে গুরুসেবা করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একদা একটী গারো ও একটী ভুটীয়া মাধবদেবের নিকট শরণ গ্রহণার্থ আগমন করে। মাধবদেব তাহাদিগকে শরণ দিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিলে তাহারা শ্রীমাধব-বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবৃত্তি করিল,—

গারো ভোট যবনে হরির নাম লয়।
হেনয় হরির নাম সজ্জনে নিন্দয়॥

এতচ্ছ্রবণে মাধবদেব যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে "শরণ" প্রদান করিলেন। গারো ও ভুটীয়া ভক্তদ্বয়ের নাম যথাক্রমে গোবিন্দ ও জয়ানন্দে পরিবর্ত্তিত করা হইল। যবন জয়হরি নামক এক ব্যক্তি উত্তরকালে মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

একদা মাধবদেবের ভক্ত জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোপাল নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপমানিত হন। ভক্তের অপমানে মাধবের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইল। ভক্তের অপমানে অপমানিত মাধব ক্রোধে ও ক্ষোভে সেদিন একেবারেই অন্নগ্রহণ করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি সুন্দরীদিয়া পরিত্যাগ করিয়া বরপেটায় গমন করিলেন।

একদল স্বার্থপরায়ণ হিংসাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণের চেষ্টায় শঙ্করদেব একাধিক বার বিপজ্জালে পতিত হইয়াছিলেন; ঠিক ঐরূপে আর একদল লোকের ষড়যন্ত্রেও কূটমন্ত্রণায় মাধবদেবের শেষ জীবন কথঞ্চিৎ অশান্তিময় হইয়াছিল। কতিপয় ব্রাহ্মণ হিংসাবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া নৃপতি রঘুদেবকে* মাধবদেবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।—

* প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব্ব খণ্ডে চিলারায়ের পুত্র রঘুদেব ও পশ্চিম খণ্ডে নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করিতে থাকেন।

শূদ্র এক গোট আছে মাধব নামত।
অনাচার করি নষ্ট করিলে জগত ॥

রাজাজ্ঞায় মাধবদেব রাজধানীতে নীত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তর্ক করিতে সাহসী না হওয়ায়, তিনি মুক্তিলাভ ও কিয়ৎকাল পরে রাজাজ্ঞায় হাজো নামক স্থানে গমন করিলেন।

অতঃপর মাধবদেব রঘুদেবের রাজ্য ত্যাগ করতঃ বেহার নগরে গমন করেন। তথায় মহোৎসাহে নামধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন সহস্র সহস্র লোক তাঁহার পদরজঃ গ্রহণ করিতে আগমন করিতে লাগিল। তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃতা অমৃতনিস্যন্দিনী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে লাগিল। রাজমাতা, রাজমহিষী, ও রাজকুমার বীরনারায়ণ আদি বহু রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট 'শরণ' গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কোচ মেচ জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল,—

কোচ মেচ লোক সবে এড়িলেক
পূর্ব্বর যত আচার।
মাধব দেবর উপদেশ পায়া
ভৈল সবে সদাচার।

বেহার নগরে মাধবদেবের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য মাধববিদ্বেষিদল একাধিকবার উদ্যম করে, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। মাধবের প্রতিকূলাচরণ করার পরিবর্ত্তে নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন।

ক্রমে মাধবের জীবনব্রত শেষ হইয়া আসিল। অবশেষে ১৫১৮ শকের ভাদ্র মাস, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি, দ্বিপ্রহর কালে যোগাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে মহাপুরুষ মাধবদেব মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।*

* মাধবদেবের দেহত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রণীত "মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব আৰু শ্রীমাধবদেব" পুস্তকে দেখা যায় যে, নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ মাধবদেবের নিকট "শরণ" প্রার্থনা করেন ও তৎক্ষণ-

মাধবদেব আদর্শ গুরুসেবক ছিলেন। তাঁহার গুরুসেবার তুলনা কলিযুগে অতি বিরল। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগকরতঃ প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে মাধবদেব গুরুর দন্তধাবন ও স্নানাদির জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং অবগাহন করিতে যাইতেন। স্নানান্তে গুরুদেবের স্নানের জন্য জল আনয়ন করিতেন ও নামপ্রসঙ্গের সময়ে স্বহস্তে গুরুজনের আসন পাতিয়া দিতেন। গুরুদেব ভোজনান্তে বিশ্রামপর হইলে কিয়ংকাল তাঁহার সেবা করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে যাইতেন। ভোজনান্তর গুরু-গত-প্রাণ শিষ্য পুনরায় গুরুপাদপদ্মে লগ্নদৃষ্টি হইয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলে মাধবও তৎসঙ্গে গিয়াছিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর মাধবদেবের তৎ-কালীন কর্ম্মের যেরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ;—

বস্ত্র সলাই * গৈয়া ঠাই মাধবে আতান্ত †।
বজারক গৈয়া বস্ত্র কিনিয়া আনন্ত॥
স্নান করি শঙ্করক ভোজন করান্ত।
তৈল লৈয়া তান দুই চরণ জান্তন্ত॥
শঙ্করদেবের নিদ্রা আসিলেক যেবে।
আদা খার মাধবে পায়ত দিয়া তেবে॥
লাস করি নমাই থৈয়া দুখানি চরণ।
তেবেসে আপুনি গৈয়া করন্ত ভোজন॥
এহি মতে সেবা নিতে মাধবে করন্ত।
আন লোকে কাতফোন্ত বুমটি পারন্ত॥

গুরুভক্তির কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মাধবের এই অতুল্য গুরুভক্তি চির-কাল আমাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিবে। তিনি বলিয়াছেন,—

স্বরূপে ঠিক শঙ্করদেবের ন্যায় মাধবদেবও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। দৈত্যারি ঠাকুর দেহত্যাগের অন্য কারণ বিবৃত করিয়াছেন।

* সলাই—পরিবর্ত্তন করিয়া। † আতান্ত—লেপন করেন।

গুরুসেবা করিলন্ত মার্কণ্ডেয় ঋষি।
প্রহ্লাদেয়োঁ গুরুসেবা করিলা হরিষি॥
লক্ষ্মণে করিলা গুরুসেবা সাবধান।
মঞো গুরুসেবা করি আছো কিছুমান॥

সত্য বটে, বিনয়াবতার মহাপুরুষ স্বীয় গুরুসেবার মাত্রা "কিছু-মান" (কিঞ্চিৎ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই গুরুভক্তি বস্তুতঃই অতুল্য।

কাহারও কাহারও মতে মাধবদেব যদিও স্বয়ং সংসারত্যাগী ছিলেন, তথাপি তিনি কাহাকেও বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা আরও বলেন, মাধবদেবকে সংসার-ত্যাগী দেখিয়া অন্যে সংসারত্যাগ করিলে, বিষকণ্ঠ শঙ্করকে দেখিয়া বিষপানানুযায়ী কর্ম্ম করা হইবে। স্বমত সমর্থনার্থ তাঁহারা "গুরু-চরিত্র" হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করেন ;—

তোরা যদি হরি ভকতি করিবা।
তেবে গৃহবাস পুনু কেঁহো ন ছাড়িবা॥
আমার দেখিয়া গৃহবাস নাহি কয়।
ইতো সাস* করিবা তুমি সমস্তয়॥

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাধবদেব বৈরাগ্যাশ্রমবিরোধী ছিলেন না। তিনি বরং উহা সমর্থন করিতেন। অপর-ব্যক্তি-রচিত জীবন-চরিতে লিপিবদ্ধ উপদেশ হইতে মাধবদেবের স্বরচিত গ্রন্থে লিখিত উপদেশ তাঁহার মতামত সম্বন্ধে নিশ্চিতই বলবত্তর প্রমাণ। মাধবদেব "ভক্তিরত্নাবলী"তে লিখিয়াছেন,—

মহন্তর সঙ্গ মুকুতির মুখ্য দ্বার।
স্ত্রীর সঙ্গীর সঙ্গ নরক যাইবার॥

ইহা হইতেই মাধবদেবের বৈরাগ্যে কিরূপে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

শিষ্য মাধব গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় নিরত

* সাস—সাহস।

হইয়াছিলেন। গুরু শঙ্করের ন্যায় তাঁহারও অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। শাস্ত্রশিরোমণি "নামঘোষ" তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব ফল।

একদা বঙ্গে মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন,

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

আর আসামেও মাধবদেব জীমূতমন্দ্রে বিঘোষিত করিয়াছিলেন,—

সত্য যুগে ধ্যান	ত্রেতা যুগে যজ্ঞ
দ্বাপর যুগত পূজা।
কলিত হরির	কীর্ত্তন বিনাই
আবর নাহিকে দুজা॥

পুনশ্চ—

নাহিকে কলিত ধর্ম্ম কীর্ত্তনব সম।
যিতো গায়ে হরিগুণ সিসি নরোত্তম॥

মাধবদেব আর্য্য, অনার্য্য ও উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে সমভাবে নামধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন —চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো যদি হরিভক্তিপরায়ণঃ। মাধব-গুরু শঙ্করদেব প্রচার করিয়াছিলেন—

সিটো চণ্ডালক গরিষ্ঠ মানি।
যার জিহ্বাগ্রে থাকে হরিবাণী॥

আর মাধবদেব গাহিযাছিলেন —

পরম নির্ম্মল ধর্ম্ম	হরিনাম কীর্ত্তনত
সমস্ত প্রাণীর অধিকার।
এতেকে সে হরিনাম	সমস্ত ধর্ম্মর রাজা
এহি সার শাস্ত্রব বিচার॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যত	যার যেন বিধি আছে
তারে সে কেবলে অধিকার।
হরিনাম কীর্ত্তনর	নাহিকে নিয়ম একো
এতেকে সে ধর্ম্ম মাজে সার॥

শঙ্করদেবের সহিত মিলন না হইলে হয়ত মাধবদেবের সমগ্র জীবন অন্যরূপে ও অন্য উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত পরিচালিত হইত। কিন্তু শঙ্করের সহিত সম্মিলনের দিবস হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীগুরুসমারব্ধ মহাকার্য্যের সফলতাসম্পাদনেই আত্ম-বিনিয়োগ করিয়াছিলেন—

শঙ্কর বৈকুণ্ঠ পয়াণ করিলা
মাধব আছিলা র'হি।
বিধির ঈশ্বর হরিনাম ধর্ম্ম
প্রচারিলা শাস্ত্র চাহি॥
শঙ্করে ভকতি প্রকাশিলা মাত্র
মাধবেসে প্রচারিল।
মাধবর প্রসা দত ব্যভিচারী
অজ্ঞানী সবে বুঝিল॥

—————

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক-দর্শন] [এরিষ্টটল

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। সেই শব্দ মোটামুটী দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলি শব্দ স্বাধীনভাবে কোন পদার্থকে বুঝায়; কতকগুলি অন্যের সহিত মিলিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমটিকে স্বতন্ত্রার্থক বাচক (Categorematic) ও দ্বিতীয়টীকে পরতন্ত্রার্থবাচক (Syn-categorematic) শব্দ বলে। কোন একটী বাক্য লইলে এই দুই প্রকারের শব্দই আমাদের ব্যবহার করিতে হয়। যদু হয় মর—এই

বাক্যে 'যদু' ও 'মর' এই দুইটী শব্দ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু হয়' এই শব্দটী তাহা পারে না। 'যদু', 'মর' প্রভৃতি শব্দকে নাম (Name) আখ্যা দেওয়া হয়। এই নাম নানারূপে বিভাগ করা হয়—সে প্রসঙ্গ এস্থলে স্থগিত থাকুক। পদার্থ মাত্রেই গুণবিশিষ্ট। যখন এক শ্রেণীর পদার্থ অপর এক শ্রেণীর পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন ব্যাপক-জাতিকে পরজাতি (Genus) ও ব্যাপ্য জাতিকে অপর জাতি (Species) বলে। যে সকল গুণ এক পরজাতির অন্তর্ভুক্ত এক অপরজাতিকে সেই পরজাতির অন্তর্ভুক্ত অন্য একটী অপরজাতি হইতে পৃথক করে তাহারা সেই জাতির ব্যবর্ত্তক গুণ (Differentia)। একই জাতি এক হিসাবে পরজাতি অন্য হিসাবে অপরজাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। যে জাতিকে আর নিম্নতর জাতিতে বিভাগ করা যায় না তাহাকে অপরতম-জাতি (Infima species) ও যাহাকে অপর কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাহাকে জাতক-জাতি বলে (Sumum Genus)। এই জাতি শৃঙ্খল স্বেচ্ছানুসারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু এরিষ্টটল ও তাঁহার মতাবলম্বীদের মতে ইহাদের একটা সাম্য থাকা চাই। তাঁহাদের মতে সার-গুণ (Essence) লইয়া এই জাতি বিভাগকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রাণী একটা পরজাতি, ইহাকে বিভাগ করিতে হইলে পশু, মনুষ্য এই ভাবে বিভাগ করিতে হইবে কিন্তু দ্বিপদ চতুষ্পদ এইরূপ ভাবে ভাগ করা শ্রেয় নয়। পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে প্রাণীর সার-গুণ বর্ত্তমান পরন্তু দ্বিপদত্বে তাহা নাই। এই সার গুণ বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝিয়াছিলেন তাহা বলা সুকঠিন। তবে এইটুকু বুঝা যায়, কতকগুলি পদার্থকে এক জাতীয় পদার্থ হইতে হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ-সম্বন্ধবিশিষ্ট নয় এমন অনেকগুলি সাধারণ গুণ থাকা চাই। সেই নিয়মানুসারে গরুকে সাদা, কাল প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভাগ করা শ্রেয় নয়। কারণ এই স্থলে কেবল মাত্র একটী গুণকে (অর্থাৎ বর্ণ) লক্ষ্য করা হইতেছে। এই জাতিবিভাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তি-সমষ্টির হ্রাস ও গুণ-সংখ্যার হ্রাস

হইলে ব্যক্তি সমষ্টির বৃদ্ধি হয়। পরজাতির গুণ অপেক্ষা অপরজাতিতে গুণের সংখ্যা অধিক কিন্তু পরজাতি অপরজাতি হইতে ব্যাপক পদার্থ।

(২) জাতির গুণ আলোচনা করিলে দেখা যায়—অপরজাতির যেটী বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম সেটী পরজাতির নহে কিন্তু কতকগুলি গুণ আছে যাহা উভয়তঃই বর্ত্তমান। মানুষের প্রাণ আছে, এই প্রাণ থাকা গুণটী পরজাতিরও ধর্ম্ম, কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান এটী অপরজাতীয় ধর্ম। ইংরাজিতে প্রথমটীকে Generic ও দ্বিতীয়টীকে Specific property বলে। জাতির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত এইরূপ ধর্ম্ম বা গুণ ছাড়া পদার্থের কতকগুলি আকস্মিক গুণ বা ধর্ম্ম থাকিতে পারে। সেগুলিকে উপলক্ষণ (accident) বলে। যদি কোন উপলক্ষণ কোন বিশেষ জাতির সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধে জড়িত হয় তাহাদিগকে তাহার ধর্ম্ম হইতে পৃথক করা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া পড়ে। যেমন চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী জন্তুর পরিহার্য্য উপলক্ষণ খুরের দ্বিখণ্ডত্ব। পরন্তু চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী জন্তুর এটী সার-গুণ (Essence) না হওয়ায় সেটীকে ধর্ম্ম বলা যায় না। পরজাতি, অপরজাতি, ব্যবর্ত্তক গুণ, ধর্ম্ম, উপলক্ষণ, ইহাদিগকে বিধেয়ক (Predicables) বলে।

কোন একটী বাক্য প্রয়োগ করিলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। বিধেয় পদটী উদ্দেশ্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে জড়িত হইতে পারে সেটী চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে সেটী বিধেয়ের পরজাতি, অপরজাতি, ব্যবর্ত্তক গুণ, ধর্ম্ম বা উপলক্ষণ।

(৩) এরিষ্টটলের মতে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে দ্বৈখণ্ডিক-ভাগ প্রণালী (Dichotomus) অবলম্বনই শ্রেয় যেমন—

প্রাণী
- চিন্তাশীল
- অচিন্তাশীল
  - পশু
  - অপশু ইত্যাদি।

(৪) দুইটী পদার্থের সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে আমাদের সত্যাসত্য জ্ঞান লাভ হয়, এই সত্যাসত্য নির্ণয়ই ন্যায়শাস্ত্রের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ইহার অপর নাম অবগতি (Judgment)। উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়ের স্বরূপতা থাকিলে অন্বয়ী (affirmative) বাক্য হয় ও বিরূপতা থাকিলে ব্যতিরেকী (negative) বাক্য হয়। এই বাক্য নানা ভাগে বিভাগ করা যায়। যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য তাহাকে ব্যাপক বাক্য (universal proposition) ও যেটার তাহা ব্যাপ্য নহে সেটীকে অব্যাপক বাক্য (particular proposition) বলে। দুইটী অন্বয়ী বাক্য-সমগুণ বাক্য (of the same quality)। একটী অন্বয়ী অপরটী ব্যতিরেকী বাক্য—বিষমগুণ বাক্য (not of the same quality)। দুইটী ব্যাপক বাক্য সমপরিমাণ বাক্য (of the same quantity)। একটী ব্যাপক অপরটী অব্যাপক বাক্য বিষমপরিমাণ বাক্য (not of the same quantity)। ব্যাপক বাক্য অন্বয়ী হইলে তাহাকে ব্যাপকান্বয়ী (universal affirmative) ও ব্যাপক বাক্য ব্যতিরেকী হইলে অব্যাপক-ব্যতিরেকী (universal negative) বলে। অব্যাপক অন্বয়ী বাক্যকে ইংরাজীতে (particular affirmative) ও অব্যাপক ব্যতিরেকীকে (particular negative) বলে। সংক্ষেপে A 'আ', E 'এ', I 'ই', O 'ও' বলা হয়। এই চারি প্রকার বাক্যের মধ্যে ব্যাপকান্বয়ী বাক্যে উদ্দেশ্য ব্যাপ্য, বিধেয় অব্যাপ্য — 'আ'

ব্যাপক ব্যতিরেকী বাক্যে ,, ,, ,, ব্যাপ্য — 'এ'
অব্যাপক অন্বয়ী বাক্যে ,, অব্যাপ্য ,, অব্যাপ্য — 'ই'
অব্যাপক ব্যতিরেকী বাক্যে ,, ,, ব্যাপ্য — 'ও'

ব্যাপক বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাপ্য, অব্যাপক বাক্যের উদ্দেশ্য অব্যাপ্য।

(৫) এই বাক্যের সাহায্যে আমাদের জ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ নিরূপিত হয়। কতকগুলি অনুমান অপর কোন মধ্যস্থ বাক্যের সাহায্য বিনা সাধিত হয়, সেগুলিকে নিরপেক্ষানুমান কহে ও কতক স্থলে মধ্যস্থ বাক্যের সাহায্য লইতে হয়, সেটী সাপেক্ষানুমান। 'মানুষ মাত্রেই মর' ইহা হইতে 'কোন কোন মানুষ' মর

অনুমান করিতে অপর কোন বাক্যের সাহায্য দরকার হয় না, এটী নিরপেক্ষানুমান। অপর স্থানে সকল 'মানুষ মর হইতে 'যদু মর' অনুমান করিতে হইলে 'যদু মানুষ' এই বাক্যের সাহায্য লইতে হয়, এটী সাপেক্ষানুমান।

(৬) ব্যবহারিক জগতে এই অনুমান বলেই সত্যাসত্য নির্ণীত হয়; কিন্তু কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য আছে যেগুলিকে আর কোন অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যায় না। এরিষ্টটল এইরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের উপর ন্যায়শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

'যে বস্তু যাহা তাহাই'—ইহার নাম তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of Identity) 'কোন বস্তু একই কালে সৎ ও অসৎ হইতে পারে না' —ইহাকে বিরোধ নিয়ম বলে (Law of Contradiction)। কোন পদার্থ হয় আছে বা নাই, এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তাহার হইতে পারে না—ইহাকে মধ্যাভাব নিয়ম বলে (Law of Excluded Middle)। ইহাই এরিষ্টটলের সুবিখ্যাত সূত্র (Dictum)। এরিষ্টটলের মতে এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম না মানিয়া চলিলে যুক্তি অশুদ্ধ হইবে।

(৭) এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হইতে অপর কয়েকটী নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। যদি (ক) (খ) হয় এবং (খ) (গ) হয়, তবে (ক) (গ) হইবে।

২। যদি (ক) (খ) হয় এবং (খ) (গ) না হয়, তবে (ক) (গ) নহে।

৩। যদি (ক) (খ) না হয় এবং (খ) (গ) না হয়, তবে (ক) (গ) কিনা বলা যায় না।

মোটামুটী এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম লইয়া আমাদের অনুমান কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই অনুমান হয় নিরপেক্ষ না হয় সাপেক্ষ।

আমরা প্রথমে নিরপেক্ষানুমান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব।

(৮) সকল (ক) হয়, (খ) এটী 'আ' বাক্য (Universal

affi m·t v৫)। 'আ' বাক্য সত্য হইলে 'এ', 'ই', ও 'ও' বাক্য কি হইবে দেখা যাউক।

একটী উদাহরণ লওয়া যাউক।

সকল মানুষ মর, এটী 'আ' বাক্য। সকল মানুষ মর এটী সত্য হইলে সকল মানুষ মর নহে এটী মিথ্যা হইবে অর্থাৎ কোন মানুষ মর নহে এটী মিথ্যা অর্থাৎ 'এ' বাক্য মিথ্যা হইবে।

কোন মানুষ মর নহে, এটী মিথ্যা হইলে কোন কোন মানুষ মর নহে এটীও মিথ্যা হইবে অর্থাৎ 'ও' বাক্য মিথ্যা হইবে।

সকল মানুষ মর, এটী সত্য হইলে কোন কোন মানুষ মর অর্থাৎ 'ই' বাক্য সত্য।

(৯) সুতরাং দেখা গেল।

'আ' সত্য হইলে 'ই' সত্য—'এ' মিথ্যা 'ও' মিথ্যা।

অনুরূপ যুক্তি বলে

'এ' সত্য হইলে 'ও' সত্য—'আ' মিথ্যা 'ই' মিথ্যা।

'ই' সত্য হইলে 'ও' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না। কিন্তু 'এ' বাক্য মিথ্যা হইবে এবং

'ও' সত্য হইলে 'আ' বাক্য মিথ্যা—'এ' এবং 'ই' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না।

(১০) উদাহরণ সাহায্যে বুঝা যাউক।

কোন মানুষ অমর নহে, এটী 'এ' বাক্য, সুতরাং কোন মানুষ অমর এটী মিথ্যা। কোন মানুষ অমর এটী মিথ্যা হইলে সকল মানুষ অমর এটী মিথ্যা। কতকগুলি মানুষ জ্ঞানী এটী 'ই' বাক্য, কতকগুলি মানুষ জ্ঞানী এ কথা সত্য বলিলে কোন মানুষ জ্ঞানী নয় অর্থাৎ 'ও' বাক্য মিথ্যা হইবে। কিন্তু 'ই' বাক্য সত্য বলিয়া 'সকল মানুষ জ্ঞানী' এ সিদ্ধান্ত অথবা 'কোন কোন মানুষ জ্ঞানী নয়' এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কতকগুলি মানুষ ধনী নয় এটী 'ও' বাক্য, কতকগুলি মানুষ ধনী না হইলে সকল মানুষ ধনী এ কথা বলা যায় না। সুতরাং সকল

মানুষ ধনী এটী মিথ্যা বাক্য। কতকগুলি ধনী নয় সুতরাং সকল মানুষ ধনী নয় এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং কতকগুলি ধনী এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় না।

(১১) অতঃপর দেখা যাউক 'আ' বা 'এ' বা 'ই' বা 'ও' বাক্য মিথ্যা হইলে অপরগুলি কি হইবে।

'আ' মিথ্যা হইলে 'ও' সত্য হইবে—'এ' এবং 'ই' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না।

'এ' মিথ্যা হইলে 'ই' সত্য হইবে—'আ' এবং 'ও' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না।

'ই' মিথ্যা হইলে 'এ' এবং 'ও' সত্য হইবে—'আ' মিথ্যা।

'ও' মিথ্যা হইলে 'আ' এবং 'ই' সত্য হইবে—'এ' মিথ্যা।

(১) 'আ' এবং 'এ' বাক্যের সম্বন্ধকে বিপরীত সম্বন্ধ বলে (Contrary)—অর্থাৎ 'আ' সত্য হইলে 'এ' মিথ্যা, 'এ' সত্য হইলে 'আ' মিথ্যা। কিন্তু 'আ' মিথ্যা হইলে এ' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে এবং 'এ' মিথ্যা হইলে 'আ' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(২) 'আ' এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধকে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বলে (Contradictory)—'আ' সত্য হইলে 'ও' মিথ্যা, 'আ' মিথ্যা হইলে 'ও' সত্য ; 'ও' সত্য হইলে 'আ' মিথ্যা এবং 'ও' মিথ্যা হইলে 'আ' সত্য—দুইটী বাক্যের মধ্যে একটী সত্য হইলে অপরটী মিথ্যা হইবেই হইবে।

(৩) 'ই' এবং 'এ' বাক্যের মধ্যেও বিরুদ্ধ সম্বন্ধ।

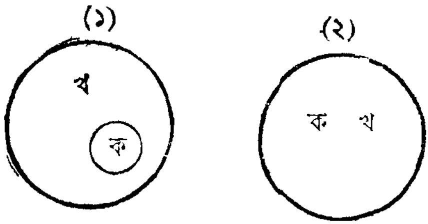
(৪) 'আ' এবং 'ই' মধ্যে সম্বন্ধ এই যে 'আ' সত্য হইলে 'ই' সত্য, 'আ' মিথ্যা হইলে 'ই' মিথ্যাও হইতে পারে সত্যও হইতে পারে। 'ই' মিথ্যা হইলে 'আ' সত্য হইবেই হইবে। 'ই' সত্য হইলে 'আ' মিথ্যাও হইতে পারে সত্যও হইতে পারে, 'ই' বাক্যকে 'আ' বাক্যের অনুকূল বাক্য বলে (Sub alte্rn)।

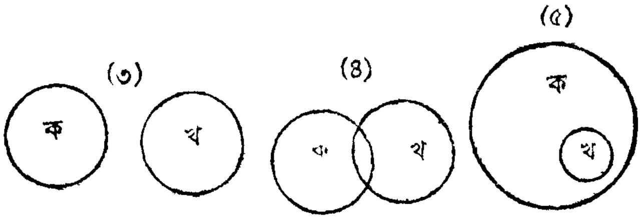
(৫) 'এ' এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধকেও অনুকূল বলা হয়।

(৬) 'ই' এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধ এই যে একটী সত্য হইলে

অপরটী সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে কিন্তু একটী মিথ্যা হইলে অপরটী সত্য হইবেই। ইহাদিগকে অধীন বিপরীত (Sub-contrary) বাক্য বলে।

(১৩) নিম্নলিখিত চিত্র সাহায্যে উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধি হয়।





(১) (২) চিত্র 'আ' বাক্য প্রকাশক যথা সকল ক হয় খ।
(৩) ,, 'এ' ,, ,, কোন ক খ নয়।
(১) (২) (৪) (৫) চিত্র 'ই' ,, ,, কতক ক হয় খ।
(৩) (৪) (৫) ,, 'ও' ,, ,, কতক ক খ নয়।

(১৪) উদাহরণ অপেক্ষা চিত্র সাহায্যে এই বিষয় সুন্দরতর-রূপে বুঝা যায় তাই সেই উপায়ে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 'আ' বাক্য সত্য বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে বাক্যটী (১) বা (২) চিত্রের অন্তর্গত হইবে। 'ই' বাক্যে (১) ও (২) চিত্র আছে। সুতরাং 'আ' বাক্য (১) চিত্রেরই হউক আর (২) চিত্রেরই হউক 'ই' বাক্যেও তাহারা আছে। সুতরাং 'আ' সত্য হইলে 'ই' সত্য হইবেই হইবে। 'এ' বাক্যে (১) বা (২) চিত্র নাই। সুতরাং 'এ' মিথ্যা। 'ও' বাক্যেও (১) বা (২) চিত্র নাই সুতরাং 'ও' মিথ্যা।

(১৫) 'এ' বাক্য সত্য অর্থাৎ (৩) চিত্রের অন্তর্ভুক্ত। (৩) চিত্র 'আ' কিম্বা 'ই'তে নাই সুতরাং 'আ' এবং ই' মিথ্যা। 'ও'তে আছে সুতরাং 'ও' সত্য।

(১৬) 'ই' বাক্য সত্য অর্থাৎ (১) (২) (৪) (৫) চিত্রের মধ্যে যে কোনটীর অন্তর্গত। 'আ'তে (১) (২) চিত্র আছে (৪) (৫) নাই। সুতরাং 'আ' বাক্য সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। (৩) চিত্র নাই সুতরাং 'এ' মিথ্যা। 'ও'তে (৪) ৫) চিত্র আছে (১) (২) নাই সুতরাং 'ও' মিথ্যা হইতে পারে সত্যও হইতে পারে।

(১৭) 'ও' বাক্য সত্য অর্থাৎ (৩) (৪) (৫) চিত্রের মধ্যে যে কোনটীর অন্তর্গত। (১) (২) চিত্র অন্তর্গত নয় সুতরাং 'আ' মিথ্যা। 'এ'তে (৩) চিত্র আছে ৪) (৫) নাই সুতরাং 'এ' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। 'ই'তে (৪) (৫) আছে (৩) নাই। সুতরাং 'ই' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। এইবার দেখা যাউক এই বাক্যগুলি মিথ্যা হইলে কি হয়।

(১৮) 'আ' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (১) (২) চিত্রের অন্তর্গত নয়, (৩) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্গত। একমাত্র 'ও' বাক্যই (৩) (৪) (৫) চিত্রের যে কোনটীর আকার ধারণ করিতে সক্ষম সুতরাং 'আ' মিথ্যা হইলে 'ও' 'ই' সত্য। 'এ'তে (৩) চিত্র আছে (৪) (৫, নাই। 'ই'তে (৪) (৫) আছে (৩) নাই। সুতরাং 'এ' এবং 'ই' বাক্য সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(১৯) 'এ' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (৩ চিত্রের অন্তর্গত নয়, (১) (২) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্গত। কেবলমাত্র 'ই' বাক্যই (১) (২) (৪) (৫) চিত্রের যে কোনটীর আকার ধারণ করিতে পারে সুতরাং 'ই' সত্য। 'আ' বাক্যে (৪) (৫) নাই, 'ও' বাক্যে (১) (২) নাই, সুতরাং 'আ' এবং 'ও' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(২০) 'ই' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (১) (২) (৪) (৫) চিত্রে নাই ৩) চিত্রের অন্তর্গত। সুতরাং 'এ' সত্য। 'আ' বাক্যে (৩) চিত্র নাই সুতরাং 'আ' মিথ্যা। 'ও' বাক্য (৩) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে (৩) আছে (৪) (৫) নাই সুতরাং 'ও' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(২১) 'ও' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (৩) (৪) (৫ চিত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, (১) (২) চিত্রের অন্তর্গত। সুতরাং 'আ' বাক্য সত্য। 'এ'তে (১) (২) নাই সুতরাং 'এ' মিথ্যা হইবে 'ই' বাক্যে (১) (২) (৪) (৫) চিত্র আছে—এখানে (১) (২) আছে, ৪) (৫) নাই সুতরাং 'ই' বাক্য সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

গাজী মিঞা।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)

বহু বৎসর পূর্ব্বে মীরাটের নওচন্দী মেলায় যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলাম, গত আষাঢের উদ্বোধনে "নওচন্দী" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, "বহ্রাইচ, বারাবাঙ্কী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বালে-মিঞার দরগা বলিয়া যে পীরস্থান দেখা যায়, তাহা গাজী মিঞা সৈয়দ্ সলারের পিতা বালে মিঞার কবর। এক ব্যক্তির বহু স্থানে সমাধি বিদ্যমান থাকা ভারতে নূতন নহে। কথিত আছে, বালে মিঞা যে যে স্থানে প্রকটভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার কোন না কোন স্মারক বস্তুর সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার নিবাসভূমি বহ্রাইচেই সমাধিস্থ হন।" এই সম্বন্ধে 'ধর্ম্ম-সুধাকরমণ্ডলী' হইতে, কিছুদিন হইল, একখানি খোলা চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। গত জুন মাসে এলাহাবাদ অবস্থানকালে উক্ত চিঠির একখানি প্রতিলিপি আমার হস্তগত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ অন্ত সাধারণের অবগতির জন্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পশ্চিমাঞ্চলে গাজী মিঞা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পূজা পাইয়া থাকেন। গাজী মিঞার হিন্দু পূজারীর সংখ্যা অল্প নহে। মসূউদ্

গাজী অর্থাৎ গাজী মিঞা অসহুল্লার পৌত্র এবং সালার সাহেবের পুত্র। ১০৪৪ সম্বতে ইনি অজমীঢ়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তাঁহার মাতুল মহ্‌মুদ গজনবীর সহিত গজনী গমন করেন। ইহা সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের পরের কথা। গজনী পৌছিবার পর তথায় ধর্ম্মবিদ্বেষবশতঃ সোমনাথের মূর্ত্তির নাক কান কাটিয়া গাজী মিঞা তাহাতে চূণ প্রস্তুত করাইয়া সেই চূণ পাণের সহিত সোমনাথের পূজারিগণকে খাইতে বাধ্য করেন। এই সূত্রে বজীর খ্বাজা অহমদের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটে এবং এই কারণে তিনি দেশ হইতে দূরীভূত হন। গাজী মিঞা বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এবং স্বীয় মিত্র ও স্বমতাবলম্বী সর্দ্দারগণ সমভিব্যাহারে ভারতে আসিয়া খুদা রসুলের নাম ও কোরাণের সত্য প্রচারার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তিনি সেই সঙ্গে ইহাও প্রচার করেন যে, খুদা রসুল তাঁহাকে অবিশ্বাসীদিগের দণ্ডবিধানার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তিনি ভারতে ধর্ম্মযুদ্ধ এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। অতঃপর গাজী মিঞা শিবপুর, অজমীঢ, মুলতান এবং দিল্লী প্রভৃতির জমীদার ও রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ, হিন্দুর প্রাণনাশ ও সম্পত্তি লুণ্ঠনাদি করিতে করিতে অবশেষে বহ্রাইচের রাজা সুহৃদেবের হস্তে নিহত হন। তাঁহার সঙ্গী সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই সেই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করেন। যে সকল সর্দ্দার রক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহারাই পরে মৃতসর্দ্দারদিগের সমাধি প্রস্তুত করিয়া কাহাকে 'গাজী মিঞা' কাহাকে 'মলিক আদম্', 'বড়ে পীর', 'বৈহ্‌রানা', 'কানর', 'লাল পীর', এবং 'তসূলা পীর' প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত করিয়া আপনারাই সেই সকল দর্গার অধিকারী হইয়া বসেন। পীরস্থান ধর্ম্মভীরু ভারতের অশিক্ষিত নরনারীর পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। সুতরাং হিন্দু মুসলমান সেবকগণের পূজোপচারে এই সকল দর্গার প্রচ্ছন্ন পূজারিগণ অনায়াসে আপনাদের উদর পালনের পথ করিয়া লইতে সমর্থ হন এবং সেই সঙ্গে গোপনে গোপনে মুসলমানধর্ম্মের প্রচার করিতে

থাকেন। গাজীর ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ব্যাপার কিন্তু এই স্থানেই শেষ হয় নাই। বহ্রাইচ যাইবার পথে রুদৌলী গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। "রুদৌলী সরীফ" গাজী মিঞার শ্বশুরালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এজন্য বহ্রাইচ-যাত্রী হিন্দুকুলাঙ্গনাগণকে রুদৌলী গ্রাম হইয়া যাইবার কালে তথাকার কুরুচিপূর্ণ মুসলমান যুবকগণের কুৎসিত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। হোলীপর্ব্বে সদৃশ আচরণে অভ্যস্থা কুলকন্যাগণ গাজী মিঞার শ্বশুরবাড়ীর প্রতিবেশী মনে করিয়া এই সকল দুর্ব্বৃত্তের আচরণে ভীতা হন না অথবা তাহা আপনাদের মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন না। ধর্ম্মসুধাকরমণ্ডলী এজন্য বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া গাজী মিঞার হিন্দু পূজারিদিগকে সম্বোধন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক ব্যাপার এই যে, বহ্রাইচে গাজী মিঞার রৌজা বা সমাধিগৃহের সম্মুখ-দ্বারে একটী লৌহশৃঙ্খল বিরাজমান। প্রথা আছে, পীরের আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হিন্দু মুসলমান উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকল লোককেই সেই শৃঙ্খল চুম্বন করিতে হয়। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সময় আমরা বহ্রাইচে উক্ত রৌজা দেখিতে যাই, তখন কোন হিন্দু যাত্রীকে তথায় উপস্থিত দেখি নাই, কিন্তু কয়েকজন মুসলমান

* হুআ তুমহে ক্যা হিন্দু লোগো কি মুর্দ্দো পর সর পটক রহে হো।
তুম অপনে দেবো কো ত্যাগ করকে মিঞাকে পিছে ভটক রহে হো॥
পড়ে হ্যায় ক্যা অক্ল পর যে পত্থর বনে তুম ঐসে নাদান ক্যা হো।
মুজাবরো সে থুকা কে খাতে শবরাতে হিন্দু ইমান ক্যা হো॥
মুজাবর পীর মুর্দ্দা গাজী ক্যা দেগে তুমকো সনতান ভাই।
শরম হ্যায় তুমকো ন আতী বিলকুল ডুবা দিয়া ধরম মান ভাই॥
থা হিন্দুও কা জো জাঁ কা দুশমন বনা ওহী দেবতা তুমহারা।
হ্যায় শোক বুদ্ধি পর ইয়ে তুমহারে ন তুমনে সোচা ন কুছ বিচারা॥
থা বেধর্ম্মা গউ কা ঘাতক ন জিসকে অকর্ম্ম কা আরপারা।
ইসী অধর্মীপনে পর রাজা সুহলদেব নে উসে হ্যায় মারা॥
জিসে ন হো রেকী মঁগা লে ভর্থারীথ মে হ্যায় হাল সারা।
লিখা হুআ জো জীবনী মিঞা কা লো মাস শীতল বচন হমারা॥

যাত্রী ভক্তিভরে উক্ত শৃঙ্খল চুম্বন করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখানকার প্রথা দেখিয়া আমার জগন্নাথক্ষেত্রই মনে পড়ে। কিন্তু বহ্রাইচের গাজীক্ষেত্র জগন্নাথক্ষেত্রকেও টেক্কা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে দেশে চারিজন ব্রাহ্মণের জন্য পাঁচটি "চুলা"র প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই দেশে হিন্দু মুসলমান-নির্ব্বিশেষে একই স্থানে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া চুম্বন করায় যে হিন্দুর সংস্কারে বাধে না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহা ঔষধার্থে সুরাপানের ব্যবস্থার সংস্কারান্তর বলা যাইতে পারে। যে কারণেই হউক, দক্ষিণ ভারতে শ্রীক্ষেত্রের জাতিভেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হিন্দুর মিলনক্ষেত্রের মত উত্তরভারতে গাজী মিঞার রৌজা হিন্দু মুসলমানের মিলনমন্দিরস্বরূপ বিরাজ করিতেছে এবং উক্ত শৃঙ্খলটা উভয়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ করিবার ইঙ্গিতস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শিলচর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (Home of Service) একটী সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী ও আবেদন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইং ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন নিঃস্বার্থ যুবকের উদ্যোগে ও মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ে অধিনায়কত্বে, এই আশ্রমটী স্থাপিত হয়। তদবধি আশ্রমটী উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার সেবার ভাবে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই কায়িক ও আর্থিক সাহায্যাদি দান করিয়া অনুষ্ঠানটীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

আশ্রমের তত্ত্বাবধানে দরিদ্র ও তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় বালকগণের শিক্ষার্থ একটী বিবেকানন্দ নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ২০ জন। আশ্রমের সেবকগণই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক পুস্তকাবলী সম্বলিত একটী পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে। উহা হইতে সর্ব্বসাধারণকে বিনা চাঁদায় পুস্তকাদি লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

সেবকগণ ইং ১৯১৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৬০ জন পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং মৃতের সৎকারার্থ কতিপয় নিঃসহায় পরিবারবর্গকে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহারা একটী অগ্নি-নিবারণী-দলও গঠন করিয়াছেন এবং সহরের অগ্নি-নিবারণ কার্য্যে সহায়তা করেন।

বিগত অক্টোবর মাসে ভীষণ বন্যায় কাছাড় জেলা এবং শ্রীহট্টের কতক অংশ প্লাবিত হইয়া যায়, উহাতে অনেকে নিরাশ্রয় এবং নিরন্ন হইয়া পড়েন। আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ কাছাড় জেলায় দুইটী ও শ্রীহট্টে একটী সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহাদের অভাব মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রথম হইতেই আশ্রমের নিজস্ব একটী কেন্দ্র-গৃহ না থাকায় ঐরূপ নানাবিধ সেবা কার্য্যের বহু অসুবিধা হইতেছে। উক্ত অভাব দূর করিবার জন্য শিলচর সহর হইতে তিন মাইল দূরে রামকৃষ্ণপুর নামক গ্রামে ২২ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। তথায় সাধু-সন্ন্যাসিগণের থাকিবার জন্য মঠ, দাতব্য ঔষধালয়, নিঃসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করিবার জন্য গৃহ ও আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। নৈশ-বিদ্যালয় ও পাঠাগারটী সহরেই থাকিবে।

এই সকলের জন্য প্রায় ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য আশ্রমবাসিগণ সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা আশা করি, এই সদনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সাহায্য অতি সামান্য হইলেও মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম শিলচর, এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা অনাথ আশ্রমের পঞ্চবিংশতিতম (ইং ১৯১৬) বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আশ্রমটী বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। অভিভাবকহীন, নিরন্ন ও আশ্রয়শূন্য বালক-বালিকাগণের পিতামাতার স্থলে অভিষিক্ত হইয়া তাহাদিগকে একদিকে স্নেহ অন্ন ও আশ্রয় দান, অপর দিকে বিদ্যা, বিনয় ও শীলতা শিক্ষা দিয়া 'মানুষ' করিয়া তোলাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য।

আশ্রমে বালক ও বালিকাদিগের জন্য তদুদ্দেশ্যে একটী করিয়া লোয়ার প্রাইমারী স্কুল আছে। বালিকাগণকে স্কুলের পাঠ ছাড়া সেলাই, কাটছাঁট, সূক্ষ্ম বয়ন কার্য্য এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম-সকল বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাদিগকে সৎপাত্রস্থ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন আনন্দময় করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা অতি আনন্দের সহিত পাঠ করিলাম যে, আলোচ্য বর্ষে এইরূপ ৫টী বালিকার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

বালকদিগের জন্য একটী শিল্প বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে; উহাতে দর্জ্জির ও ছুতারের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণকে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫টা বালক উচ্চ ইংরাজী স্কুলে এবং ২টী মধ্য ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইং ১৯১৬ সালে ১টী যুবক আশ্রমে থাকিয়া বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাপড়ায় ওকালতি করিতেছে এবং একটী বালক ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে, বালক-বালিকাদিগের নৈতিক উন্নতির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

আলোচ্য বর্ষে ৮৭টী বালক ও ৪৬টা বালিকা—মোট ১৩৩ জন আশ্রমে স্থান পাইয়াছে।

আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষ হইতে কর্ম্মঠ ও পরহিতব্রত অবৈতনিক সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয়, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও

রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর যাহাতে তাঁহারা আরও অধিক সংখ্যক অনাথ বালকবালিকাগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ তাহাতে কেহই সহানুভূতি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আগষ্ট মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে জানা যায় যে, গত জুলাই মাসে ১৭ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ২৭ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ৩ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, ২ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ও ১২ জন তখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৮৩৬ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০৯ জন নূতন এবং ২২২৭ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয়, চাঁদা হিসাবে ৯৷৷০, এক কালীন দান হিসাবে ১৯ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে ৫০০—মোট ৫৬৮৷৷০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ১৯৮৶১৫ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে খরচ ২৭৭/১৫—মোট ৪০৫৷/১০।

সন ১৩২৪ সালের মাঘ মাসে, ইং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রয়াগধামে 'কুম্ভমেলার' অধিবেশন হইবে। তদুপলক্ষে যাত্রিগণের সুবিধা ও পীড়িতের সেবার জন্য তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের পক্ষ হইতে একটী সেবা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। মেলাস্থানে পীড়িত দরিদ্র নারায়ণগণকে ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করা এবং বৃদ্ধ আতুরগণ স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রভৃতিরূপ সময়োপযোগী সাহায্য করাই উক্ত সেবা-কেন্দ্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইবে। ঔষধপথ্যাদি কিম্বা অর্থ যিনি যাহা এই অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য

করিতে চান তাহা ব্রহ্মচারী পঞ্চানন, সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

গত ২৯শে জুন, ১৯১৭, মান্দ্রাজবিভাগস্থ অম্বরপেটের শাখা বিবেকানন্দ সোসাইটীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে দুই দিবসব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। পূজা, হোম, স্তোত্রপাঠ, হরিকথা, ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাদি উক্ত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

ইং ১৯১৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী সারদানন্দের নিকট দরিদ্রভাণ্ডারের জন্য প্রেরিত দানের প্রাপ্তি স্বীকার ও হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দাতাগণের নাম :—

জনৈক বন্ধু, কিশোরগঞ্জ ১৫৲ টাকা, শ্রীযামিনীমোহন দত্ত, পাটনা, ১৲ টাকা, মাঃ ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য ২ টাকা; শ্রীগিরিশচন্দ্র বিশ্বাস, কালেক্টরী অফিস, মৈমনসিংহ ২৲ টাকা. জনৈকা স্ত্রীলোক, মুক্তাগাছা ১০৲ টাকা; এম, মুখার্জ্জি ১৲ টাকা; শ্রীযুক্ত জে এম, কর, পুটাও, ৪৲ টাকা—মোট ৩৫৲ টাকা।

সাহায্যপ্রাপ্তগণের নাম :—

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাগদী ৪৲ টাকা; শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য ২৲ টাকা; ঔষধ পথ্যাদির জন্য কামারপুকুরের জনৈক ৫ টাকা; বাগবাজার নিবাসী একটী দরিদ্র পরিবার ২৲ টাকা; ব্যাধিগ্রস্ত জনৈকের রাহাখরচ ৫৲ টাকা, জনৈক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য দান ২৲ টাকা; একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারকে ২৲ টাকা, একটী দরিদ্র-পরিবার, নকাসীপাড়া ২৲ টাকা বাগবাজারের একটী দরিদ্র পরিবারকে ৫৲ টাকা—মোট ২৯৲ টাকা। বাকি তহবিল জমা ৬ টাকা।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্য্যদেবের সম্বন্ধ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

নিঃসন্দেহ, ভারতবর্ষই মনস্তত্ত্ব-চর্চ্চার প্রকৃষ্ট স্থান। জগতের অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা হিন্দুদিগের নিকটই মানুষ সমধিক-পরিমাণে কতকগুলি মনরূপে প্রতিভাত হয়—একথা বলা চলে। চিত্তৈকাগ্রতা তাহাদের নিকট জীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। ধীশক্তি ও প্রতিভা, সাধারণ সচ্চরিত্রতা ও সর্ব্বোচ্চ সাধু জীবন, নৈতিক দুর্ব্বলতা ও শক্তিমত্তা—এসকলকে তাহারা একাগ্রতার এক আধটু তারতম্য হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে মনস্তত্ত্ব একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মত যথোচিত-ভাবে অধীত হইয়া আসিয়াছে, হিন্দুজাতির এই তন্ময়তাই কতকাংশে তাহার কারণ, আবার কতকাংশে তাহার ফলও বটে। জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে লিখনপ্রণালীর উপকারিতা লোকে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিবার বহুপূর্ব্বে, হিন্দুসমাজে মানবের সমষ্টিমনের যাবতীয় ব্যাপার, পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও অবেক্ষণের ফলসমূহের আদানপ্রদান দ্বারা নিঃশব্দে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যাপারটীর সহিত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের আদৌ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, একথা লোকের মনে উদয় হইবার যুগযুগান্তর পূর্ব্বে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের প্রকৃতির

সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল এই বিজ্ঞানটীর সম্বন্ধে পরীক্ষার যুগ পূর্ণভাবে অভ্যুদিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এইরূপে যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইয়া অদ্ভুত প্রসারতা প্রাপ্ত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে, মনোরাজ্যের এমন অনেক ঘটনার যথোচিত সমাবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস থাকিবে, যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অভিজ্ঞ পাশ্চাত্যদিগের নিকট অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলিয়া বোধ হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। সুতরাং সম্মোহনী বিদ্যা এবং অজানিত নানাপ্রকারের অসাধারণ অনুভব বা শক্তি—রোগ ভাল করা, মনের কথা বলিয়া দেওয়া, দূরদর্শন এবং দূরশ্রবণ, এইগুলিই ইহাদের মধ্যে সাধারণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত—এ সকল যাঁহারা ভারতের প্রাচীন মনস্তত্ত্ব বা 'রাজযোগের' আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট একটা মস্ত কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা সকলেই জানি যে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রধান উপকারিতা এই যে, উহা আমাদিগকে নানা ঘটনা বুঝিতে ও লিপিবদ্ধ করিতে সহায়তা করে। কোন একটী রোগ বিরল হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্রের কোথাও একবার মাত্র উহার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তখন হইতে মানব মনে উহার একটী স্থান রহিল। উহা আর অলৌকিক ব্যাপার নহে -তাহার একমাত্র কারণ এই যে, শীঘ্র বা বিলম্বে উহার শ্রেণী নির্দ্দেশ হইবেই! উহার একটী নাম আছে। উহার নিদান এবং চিকিৎসা এখন শুধু কালসাপেক্ষ।

সচরাচর যাহাকে "অলৌকিক দর্শনাদি" নামে অভিহিত করা হয়, সেই সকল ঘটনার যে অংশ বিশ্বাস্য, তৎসম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বোক্তরূপ কথা বলা চলে। সহজেই বুঝা যায় যে, এই পর্য্যায়ভুক্ত ঘটনাবলী সত্য হইলে আর আদৌ অলৌকিক থাকে না—উহা বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করা, অথবা বায়ু হইতে রেডিয়ম পৃথক করিয়া লওয়ার ন্যায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

বাস্তবিকই, 'অলৌকিক' বা 'অতিপ্রাকৃত' কথাটী আদৌ সঙ্গত কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করা যাইতে পারে, কারণ যদি কোন জিনিসের অস্তিত্ব একবার সপ্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উহা প্রকৃতির ভিতরেই এবং উহাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলা ঐজন্যই নিতান্ত অযৌক্তিক। আলোচ্য ঘটনাসমূহ ভারতবর্ষে মনোবৃত্তিরই সমধিক বিকাশের ফলমাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং উহাদের ব্যাখ্যা ঘটনাগুলির মধ্যে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া যে ব্যক্তি ঐ সকল উপলব্ধি করিয়াছে তাহারই মনের অবস্থা দৃষ্টে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, কারণ ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ঐ মন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভ্যস্ত অনুভবসকল হইতে স্বতন্ত্র এক একরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে।

শাস্ত্রে চরম চিত্তৈকাগ্রতার যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর বাস কালে বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মধ্যে সেই সকল মানসিক বিকাশের অনেকগুলির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বাহ্যজগতের ঘটনাসমূহ এমন জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আপনা হইতে তথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এবং বালকেরা যে সকল প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া লিখিয়া পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার অনুভূতিসকল এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি স্পর্শমাত্র, কিরূপ চরিত্রের লোক তাঁহার খাদ্যসামগ্রী, কাপড় চোপড়, বা বিছানা ছুইয়াছে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার ঐরূপ স্পর্শ করিতেই তাঁহার অঙ্গ যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন যে, তিনি দাহ যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। অন্য এক সময়ে হয়ত বলিলেন, "এই দেখ। ইহা আমি খাইতে পারিতেছি; যে উহা পাঠাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই ভাল লোক" আবার তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ ভাবের এরূপ দৃঢ়সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল যে, নিদ্রাকালেও তিনি

ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না, এবং জাগ্রত অবস্থায় কোন পুস্তক বা ফল উহার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকিলে, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার হাত যেন আপনা হইতেই উহা যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া আসিত।

জগতের ঋষিপদবীভুক্ত মহাপুরুষগণের কাহারও সম্বন্ধে কোন ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্‌ই বলিবেন না যে, উক্ত মহাপুরুষ দেবতাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন; তাঁহারা শুধু ইহাই বলিবেন যে, তিনি এমন একটী মানসিক অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেন, যেখানে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইত যে, তিনি দেবতাদিগের সহিত কথা কহিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাকে ভারতীয় দার্শনিকগণ "স্ব-সংবেদ্য" ব্যাপার বলিয়া থাকেন। এই অবস্থার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ দেখিয়াছেন। এখনও তাঁহারা গল্প করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অতি বিস্ময়ের সহিত শুনিতেন—কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যেন দুই বা বহু জনে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তন্মধ্যে একপক্ষের কথাগুলিই শুধু তাঁহাদের কাণে আসিতেছে; এদিকে তাঁহাদের গুরুদেব শান্তভাবে বিশ্রাম করিতে করিতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, তিনি শিষ্যগণের অদৃশ্য দেব-দেবীসমূহের সহিত ধ্যানযোগে কথোপকথন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অজস্র দর্শনসমূহের পশ্চাতে সর্ব্বদাই মানবকে সেবা করিবার দৃঢ়সংকল্প বিদ্যমান থাকিয়া ঐ সকলকে একটী মহাজীবনরূপে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার বহুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ তৎসম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি তমসাচ্ছন্ন নিশায় সময়ে সময়ে যন্ত্রণায় মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন আবার পৃথিবীতে, এমন কি কুকুর যোনিতেও, জন্মগ্রহণ করেন, যদি উহাতে একটী জীবেরও কিছু সহায়তা হয়। অন্যান্য সময়ে যখন তিনি নিজের মনের কথা অপরের সামনে কিছু কিছু খুলিয়া বলিতে পারিতেন, তিনি বলিতেন যে, উচ্চ উচ্চ দর্শন আসিয়া তাঁহাকে সেবার ভাব হইতে টানিয়া লইবার

জন্য প্রলোভিত করিতেছে। তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহাদের গুরুদেব কখনও কখনও গভীর সমাধিভঙ্গের পর যে দুই চারিটী কথা আপন মনে বলিতেন, তাহাও এই বিষয়ক বলিয়া স্থির করিতেন। তিনি যেন তখন শিশুর ন্যায় মায়ের কাছ হইতে দৌড়িয়া গিয়া খেলিবার জন্য জগন্মাতার নিকট আবদার করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিবার জন্য তিনি 'আর একটী মাত্র জীবসেবাকার্য্য' বা 'আর একটী ছোট খাট জিনিস ভোগ' করিব —এই বলিয়া বায়না ধরিতেন। কিন্তু ঐ ব্যুত্থানকালে তাঁহাতে সর্ব্বদা অনন্ত প্রেম ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লক্ষিত হইত,—যেমন ঈশ্বরে একান্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হইয়া থাকে। যখন স্বামী বিবেকানন্দ হার্ভার্ড বক্তৃতা উপলক্ষে ঐ দুইটীকেই সমাধিজনিত বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ও মৃগীরোগের বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা, এই দুইয়ের মধ্যে লক্ষণের পার্থক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের জীবনে সমাধি-অবস্থা লাভ ও পুনরায় তাহা হইতে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, এতদুভয়কে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রত্যেক কথাটীতে ওরূপ দৃঢ়প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার উপর কিরূপ আধিপত্য ছিল তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি তাঁহার শেষ অসুখের সময় গলদেশ হইতে মনকে একেবারে উঠাইয়া লইতে পারিতেন; তখন তথায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেও, যেমন ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থানকে অসাড় করিয়া ফেলিলে হইয়া থাকে সেইরূপ, কোনই বেদনা অনুভূত হইত না। তাঁহার সকল জিনিসকে তন্ন তন্নভাবে লক্ষ্য করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। শারীরিক গঠনের এতটুকু খুঁটিনাটিও তাঁহার নিকট অর্থপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত, তিনি উহাতে শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবের প্রকৃতির কিছু না কিছু পরিচয় পাইতেন। নবাগত শিষ্যগণকে তিনি একরূপ যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার মনশ্চৈতন্য হইতে কয়েক মিনিটের

মধ্যে তথায় বহু অতীতের যে সকল সংস্কার নিহিত রহিয়াছে, তাহাও জানিয়া লইতেন। লোকের প্রত্যেক সামান্য কথা ও কার্য্য, যাহা অপরের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, তাহা তাঁহার নিকট চরিত্র-রূপ মহাপ্রবাহে নীত তৃণখণ্ডের ন্যায় ঐ স্রোতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিত। তিনি বলিতেন, "কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা হয়, যখন নরনারীগণকে কাচের বস্তুর ন্যায় বোধ হয়, এবং উহাদের ভিতর-বাহির সব দেখিতে পাই।"

সর্ব্বোপরি, তিনি স্পর্শমাত্র লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতে পারিতেন; তাহাতে তাহাদের সমগ্র জীবন এক নূতন শক্তি-প্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইত; সমাধির বিষয়ে, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত জনৈক সাদাসিধা প্রকৃতির লোক আমায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয় মাসের এক দিনের একটী ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। ঐ দিন কাশীপুরের বাগানে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে সমবেত কতকগুলি ভক্তের মাথায় হাত দিয়া কাহাকেও বলিলেন, "চৈতন্য হোক্", আবার কাহাকেও বলিলেন, "আজ থাক্", এইরূপ সকলকে বলিলেন। ইহার পরেই এইরূপে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের প্রত্যেকের এক এক বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি হইতে লাগিল। একজনের মনে অনন্ত বেদনা জাগিয়া উঠিল; অপর এক জনের নিকট আশপাশের সকল জিনিস ছায়ার ন্যায় অবাস্তব এবং একটী ভাবের ব্যঞ্জকমাত্র হইয়া উঠিল; তৃতীয় ব্যক্তি ঐ কৃপা অপার আনন্দরূপে অনুভব করিলেন—আনন্দ আর ধরে না; একজন একটী মহাজ্যোতি দেখিলেন, উহা তদবধি আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র গমন করিত, ফলে যখনই তিনি কোন মন্দির বা পথিপার্শ্বস্থ দেবালয়ের নিকট দিয়া যাইতেন তখনই তাঁহার বোধ হইত, যেন তিনি তথায় ঐ জ্যোতির মধ্যে একটী মূর্ত্তি আসীন দেখিতে পাইতেছেন; দেখিতেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে যেরূপ দেখিবার উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে ঐ মূর্ত্তি

কখন হাসিতেছেন, কখনও বিষণ্ণ রহিয়াছেন; ঐ মূর্ত্তিকে তিনি "বিগ্রহাধিষ্ঠাতা চৈতন্য" বলিয়া জানিতেন এবং ঐরূপেই তৎসম্বন্ধে বলিতেন।

এইরূপে প্রত্যেকের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সার বস্তু নিহিত আছে, তাহা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, অথবা তৎকালে যিনি যতটুকু গ্রহণের উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে নিজ অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কঠোর সত্যপরায়ণতা এবং প্রবল বিচারবুদ্ধির সূত্রপাতও পোষণ করিয়া যান, যাহা তাঁহার হাতে গড়া সকল শিষ্যের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছিলেন, "কোন জিনিসকে পরীক্ষা না করিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, ঠাকুর আমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন।" তার পর যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ শিক্ষা কিরূপ বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন গভীর চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিত্য বস্তুর কিছু না কিছু আভাস অনুভূতি করাইয়া দিতেন, তাহা হইতেই প্রত্যেকে এমন একটী জ্ঞান লাভ করিতেন যাহা কখনও প্রতারিত হইবার নহে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম বয়সের বক্তৃতাগুলির একটীতে বলিয়াছেন, "আমাদের নিজ চেষ্টায়, অথবা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় আমরা সেই চরম বস্তু লাভ করি।"

গুরুর জীবনই শিষ্যের করতলগত রত্নসম্পদ্, এবং ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই যে, স্বামিজী মানবের মনোবৃত্তিসমূহ কতদূর প্রসারতা লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন সেই সকলকে তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, পাশ্চাত্য দেশের মনোরাজ্য বিষয়ক গবেষণাসমূহের সংস্পর্শে আসিবামাত্র সমগ্র জ্ঞানরাশিকে মগ্নচৈতন্যভূমি (sub-conscious), সাধারণ জ্ঞানভূমি (conscious) এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানভূমি (super-conscious) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিয়া-

ছিলেন। প্রথম শব্দ দুইটী ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনেকটা প্রচলিত ছিল, তৃতীয়টী তিনি স্বয়ং নিপুণ, সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং নিজ জীবনের অনুভূতির বলে মনস্তত্ত্ববিষয়ক শব্দসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সাধারণ জ্ঞান—মগ্নচৈতন্য এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ দুইটী মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা সামান্য পাতলা আবরণ মাত্র।" তিনি স'বিস্ময়ে আরও বলিয়াছিলেন, "যখন আমি পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে সাধারণ জ্ঞানের এত বড়াই করিতে শুনিলাম. তখন আমি স্বকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই! সাধারণ জ্ঞান? সাধারণ জ্ঞানে কি আসিয়া যায়! তাহার নীচে যে অতলস্পর্শ সাগরোপম মগ্নচৈতন্য রহিয়াছে এবং তাহার ঊর্দ্ধে যে তুঙ্গ পর্ব্বতোপম অতীন্দ্রিয় জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাদের তুলনায় উহা ত কিছুই নহে! ইহাতে আমার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ আমি কি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দশ মিনিটের মধ্যে লোকের মগ্ন চৈতন্য হইতে তাহার সমগ্র অতীতটা জানিয়া লইতে এবং তাহা হইতে তাহার ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র অন্তর্নিহিত শক্তি নিরূপণ করিয়া লইতে দেখি নাই?"

প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহিত কখনও বিচারবুদ্ধির বিরোধ থাকিতে পারে না—রাজযোগে লিপিবদ্ধ এই উক্তিটীর সত্যতাও, নিঃসন্দেহ, তাঁহার ঐরূপ সকল জ্ঞানভূমির অভিজ্ঞতা-প্রসূত। দক্ষিণেশ্বরের সাধুর নানা অসাধারণ উপায়ে অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি তজ্জনিত বৃথাভিমানে কখনও আত্মহারা হইয়া, যাহা সাধারণ উপায়ে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়াস পাইতেন না। একবার এক অদ্ভুত সাধুবেশধারী দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে আসিয়া বলে যে, সে না খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন অলৌকিক দর্শনের সাহায্য লইবার চেষ্টা না করিয়া শুধু কয়েক জন চতুর লোককে তাহাকে লক্ষ্য করিবার জন্য লাগাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যেন তাহারা

সে ব্যক্তি কি খায় এবং কোথায় খায়, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে।

কোন জিনিসই পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা চলিবে না, এবং সাধারণ লোকেরা স্বপ্ন, ভাবী ঘটনা পূর্ব্ব হইতে দেখা এবং তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদি যে সকল উপায়ে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার এত চেষ্টা করিয়া থাকে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেহত্যাগের দিবস পর্য্যন্ত সে সকলকে আতঙ্কের চক্ষে দেখিতেন। লোকে এসকলও ভূরিপরিমাণে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত; করিবারই কথা। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা এগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, যদি উহারা সত্য হয়, তবে তাঁহার না-মানা সত্ত্বেও নিজ নিজ ফল প্রকাশ করুক। তিনি বলিতেন, কোন একটী ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যক্ষেত্রে সত্য হইবে কি না, সে কথা তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব; তিনি শুধু এই বিষয়টী ধ্রুব জানিতেন যে, যদি তিনি একবার উহাকে মানেন, তাহা হইলে তিনি আর কখনও উহার হাত এড়াইতে পারিবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বদা দেখা যাইত যে, অলৌকিক দর্শনাদি কেবল পারমার্থিক বিষয়েই প্রযুক্ত হইত; তিনি কখনও বেদিয়াদের ন্যায় ঐহিক বিষয়সমূহ গণিয়া বলিয়া দিতেন না; এবং তাঁহার শিষ্যগণের মতে ঐরূপ ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া শক্তির অল্পবিস্তর অপব্যবহারই সূচিত করে। স্বামিজী বলিতেন, "এ সকল অবান্তর ব্যাপার, ইহারা প্রকৃত যোগ নহে। অপরোক্ষভাবে আমাদের উক্তিসমূহের যাথার্থ্য প্রমাণিত করে বলিয়া উহাদের কতকটা প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। একটু সামান্য আভাসেও মানুষের বিশ্বাস হয় যে, স্থূল জড়জগতের বাহিরে একটা কিছু আছে। কিন্তু যাহারা এই সব জিনিষ লইয়া কাল কাটায়, তাহাদের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।" আর একবার তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এ সকল 'সীমান্ত সমস্যার' (Frontier questions) ব্যাপার! উহাদের সাহায্যে কোন

নিশ্চিত বা দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমি ত বলিয়াছি উহারা 'সীমান্ত-সমস্যার' ব্যাপার। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখাটী সর্ব্বদাই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে।"

আমাদের সামনে যাহা কিছু আসুক না কেন, বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা সর্ব্বদা থাকা চাই। কাহারও অলৌকিক দর্শনাদির কথা শুনিলেই বলিতেই হইবে, 'তখনই আমি উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব, যখন আমি উহা অনুভব করিব। কিন্তু আমাদের নিজের অনুভূতিকেও তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন অলৌকিক ঘটনার যে ব্যাখ্যা প্রথমেই মনে আসিল, তাহাকেই সার জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। চট্ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও, স্বামিজী শেষ বয়সে পরলোকগত আত্মা সকলের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই বলিয়াছিলেন, "আমি জীবনে অনেকবার ভূত দেখিয়াছি, এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে, এক জ্যোতির্ম্ময় অশরীরী আত্মা দেখিয়াছি।" কিন্তু ইহাতে একথা বুঝায় না যে, ভূতুড়েরা ভূতনামানর জন্য যে সকল চেষ্টা এবং পরীক্ষা করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ একদিনের ঘটনায় তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এই দলভুক্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি জগতের সকল বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমান্, সে যে তথাকথিত একজন মিডিয়মের (যাহার শরীরে ভূতাবেশ হয়) সামনে আসিয়াই তাহার সমস্ত বলবুদ্ধি খোয়াইয়া বসে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমেরিকায় তিনি কয়েকটী ভূতনামান ব্যাপারে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি ঐ সময়ে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখান হয়, তাহাদের অধিকাংশকেই একেবারে জুয়াচুরি মনে করিতেন। সকলগুলি দেখিয়া শুনিয়া তিনি এই সার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "সকল স্থলেই অতি সহজ সহজ উপায়ে অতি বড় বড় জুয়াচুরি হইয়া থাকে।" আবার

তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সকল ঘটনার অনেকগুলিকে বহির্জ্জগতের সত্য না বলিয়া অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার হিসাবেই ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।* যদি এই সকল বাদসাদ দিবার পরও উহাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর যে, সেটুকু সত্যসত্যই যথার্থ।

কিন্তু যদি এরূপই হয়, তথাপি মায়িক জগতের জ্ঞান লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দুই চারিটা জীব ঘুরিতে ঘুরিতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও, উহাতে অমৃতত্বের প্রকৃত ধারণা সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করা যায়। একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই ঐ অমৃতত্ব লাভ করা যায়। স্বামিজীর মতে ভূতপ্রেতাদি লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে বাসনাবৃদ্ধি, অহঙ্কারবৃদ্ধি এবং অসত্যে পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি আত্মার জন্য জীবনের সাধারণ ভোগগুলিকেই পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল অলৌকিক ক্ষমতা আরও কত অধিক পরিমাণে ত্যাজ্য! এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মে যদি সিদ্ধাইয়ের ব্যাপারগুলা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি উহাকে উচ্চতর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধের সিদ্ধাইসকলকে দারুণ ঘৃণা করা বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিরন্তন গৌরব। উহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে বড় জোর এই কথা বলা যায় যে, উহাদের সাহায্যে একটু আধটু বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহাও আবার ধর্ম্মশিক্ষার প্রথম সোপানগুলি সম্বন্ধে। বাইবেলের ভাষায় "সিদ্ধাই-আদি যাহা কিছু, সব লোপ পাইবে; একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকিবে।"

* যেমন, দাক্ষিণাত্যে একব্যক্তির মনের কথা বলিয়া দিবার শক্তি আছে বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল। সে বলিত যে, এক অদৃশ্য স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে কি বলিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেয়। স্বামিজী বলিতেন, "আমার এই ব্যাখ্যা মনোমত না হওয়ায় আমি অপর একটী ব্যাখ্যার সন্ধান করিতে লাগিলাম।" তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ঐ সকল তথ্য সে নিজেরই ভিতর হইতেই প্রাপ্ত হইত।

যে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এই সকল প্রলোভনকে দূর করিতে পারেন, তাঁহার নিকটই সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথায়, "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ, সমাধিঃ।" যিনি সিদ্ধিসকলকে সমূলে পরিহার করিতে পারেন তাহারই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধিলাভ হয়। তিনিই ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।

আগমনী।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ)

১

স্বাগত ওগো নগনন্দিনি,
স্বাগত আজি বঙ্গে,
দশ করে দশ আয়ুধধারিণী,
করি অরি পরি রঙ্গে।
বামে ষড়ানন দক্ষে গণেশ,
কমলা বিমলা মাধুরী অশেষ,
মর্দ্দিত পদে দৃপ্ত অসুর
অসি অঙ্কিত অঙ্গে।

২

ডাকিছে তোমায় শারদ লক্ষ্মী,
বিহগ কূজন ছন্দে,
বাজায় কম্বু অম্বুদ-দল,
সঘনে পরমানন্দে।
উড়িছে হংসপতাকা আকাশে,
বিকীরিত ধূপ গন্ধ বাতাসে,
শ্রীচরণ তব পাদপ পত্র
শীর্ষ নোয়ায়ে বন্দে।

৩

অন্নহীনের দেশে অন্নদে,
এস বরাভয় হস্তে,
শুষ্ককণ্ঠে সঞ্চারি সুধা,
অভয় বিতরি ত্রস্তে।
কোথা এবে সেই উৎসব দিন,
আঁধার-মগ্ন জ্যোতি-বিমলিন
বঙ্গ আকাশে প্রমোদ সূর্য্য
অকালে গিয়াছে অস্তে।

৪

আর কি সে দিন আছে অম্বিকে,
তোমার বোধন মন্ত্র,
ওঙ্কার রবে দিবে ঝঙ্কারি,
বিশ্ব-হৃদয় তন্ত্র!
তব আগমনী-গীতি তরঙ্গ
আর কি প্লাবিত করিবে বঙ্গ,
আর কি উঠিবে সে সুখ রাগিণী
আলোড়ি মরম-যন্ত্র।

৫

পুষ্পবিহীন এবে তরুরাজি,
প্রকৃতি নিথর ক্ষুব্ধ,
তৃষিত কণ্ঠে ছুটে না চাতক
নীরদের পাছে মুগ্ধ।
হরিৎ-শস্য-সম্ভারে আর,
শোভে না ক্ষেত্র—নেত্র-বিহার,
কেদার বাঁধিতে ধায় না কৃষক,
প্রচুর পুলক লুব্ধ।

৬

জননী যাদের জগৎপালিনী,
ত্রিপুর যে মার রাজ্য,
অমৃতের চির অধিকারী যারা,
কীর্ত্তিত ভবে আর্য্য,
তাহারাই আজি অন্নবিহীন,
দলিত ঘৃণিত দীন হ'তে দীন,
বহে দুর্ব্বহ তুচ্ছ জীবন,
যাতনা অপরিহার্য্য !

৭

এই দুর্দ্দিনে এস পার্ব্বতি,
ওগো নগাধিপ কন্যা,
ভাসাও বঙ্গ আবার তেমতি,
প্রবাহি জীবন বন্যা।
সঙ্গেতে ল'য়ে এস মা সিদ্ধি,
অসীম শক্তি, অসীম ঋদ্ধি,
কর এ বঙ্গ গৌরবময়ী,
ধন ধান্যেতে ধন্যা।

৮

আর ভয় নাই শঙ্করী আসে
দূরিতে সকল শঙ্কা,
গগনে পবনে বাজিয়া উঠেছে,
উমার অভয় ডঙ্কা।
রে মন অন্ধ ভক্তি আবেশে,
জুড়াও চক্ষু হেরি অনিমেষে,
মঙ্গলময়ী মুরতি মায়ের,
অমৃত মুকতি অঙ্কা।

জীবনের সাহিত্য।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী)

আজকাল আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, বাঙ্গালাভাষার এই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির দিনে বাঙ্গালাসাহিত্যে ঠিক বাঙ্গালীত্বের সন্ধান মিলিতেছে না। এই 'বাঙ্গালীত্ব' জিনিষটা সমস্ত বাঙ্গালীর ঘরের কথা না হউক, যাহা বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতর আঘাত করে, তাহারই অভাব বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেটী বাঙ্গালীর—ধর্ম্মপ্রাণতা। এই সেদিন দেশের একজন কর্ম্মী ও বিদ্বান্ অথচ প্রধানতঃ বিদেশী শিক্ষাতেই শিক্ষিত বাঙ্গালী দুঃখের সহিত বলিলেন যে, প্রাচীন যুগের বাঙ্গালার গীতিকবিতার মধ্যে যে রূপান্তরের কথা ছিল—যাহার অনুধ্যান ও পরিকল্পন পাঠকের জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটাইবার যোগ্যতা রাখিত—সেইরূপ হৃদয়বত্তার সেইরূপ আন্তরিকতা-সংলেপ্ত জীবনের সাহিত্য আজ আর আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেন এমন হইল? এখানকার সাহিত্যে ত চাঁদের আলোয় প্রকৃতি হাসে, নীলাঞ্জন-নিন্দী নীল রবিদগ্ধ পাটল আকাশকে ছাইয়া ফেলে, কুটজ-কেতকী-গন্ধে আর্দ্র-স্নিগ্ধ বাতাস ভরিয়া যায়, বৃন্তচ্যুত যূঁথী যাঁথী মল্লিকা শেফালীর প্রচ্ছদপটে ধরণীদেবী নিত্য ভূষিতা হন, ঊষর মরুর বক্ষদেশ ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী কলগানে বহিয়া যায়, সাগরবারি বেলাতটের আহ্বানে নিমেষে নিমেষে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পদলুণ্ঠনে আত্মসমর্পণের চিহ্ন রাখিয়া যায়, সূর্য্যকরণে নভশ্চুম্বী পর্ব্বতমালার গাত্রে "সাতশ' হীরার মাণিক" জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠে, মানবের অন্তঃপ্রকৃতি এখনও ত সেইরূপ সত্যের জন্য লালায়িত, ভালবাসা মান, অভিমান, জীবনের দ্বন্দ্ব, মোহ, হর্ষ বিষাদ, আগ্রহ ঔদাস্য, জয় পরাজয় এ সকলের চিহ্নই সাহিত্যে এখনও পাওয়া যায়। তবে কেন এমন হইল?—

* * * *

বাঙ্গালীর জীবনে আজ যে নূতনত্বের আবির্ভাব হইয়াছে ইহা তাহার জীবনের লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু 'চাঞ্চল্য ও অস্থিরতাই' জীবনের চিহ্ন নহে। বৈচিত্র্য ও গতি লইয়াই মানবজীবন, তাহা সত্য কিন্তু এই বৈচিত্র্য ও গতি যদি প্রতিপদক্ষেপে জীবনের সংরক্ষণ নীতি ও স্থিতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া চলিতে আরম্ভ করে, জীববিজ্ঞানের নিয়মানুসারে তাহা হইলে উহা পরিণামে প্রাণবস্তুটিরই সংহার করিয়া বসে—সেইজন্য সমাজে গতি স্থিতির অপেক্ষা রাখে। পরিণামে দেখা যায় যে এ উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। সংগ্রাম, সংক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের পর আবার একটা শান্তি ও স্থিতির যুগ আসিবে কিন্তু কাল-নেমির অবিশ্রান্ত ঘূর্ণনের ফলে সেই স্থিতির সুখ ও সেই স্থিতির স্বপ্ন আবার ভাঙ্গিবে, তাহার স্থান নূতন নূতন বিপ্লব ও নূতন নূতন চাঞ্চল্যের কারণ আসিয়া অধিকার করিবে ও বিশ্বের নাট্যশালায় মূর্তিমান্ নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের অবকাশ সৃজন করিয়া দিবে। এই দ্বন্দ্ব, এই বিক্ষোভ আবার এই শান্তি ও এই স্থিতির উত্থান পতন লইয়াই পার্থিব জীবন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ চিরদিন আধ্যাত্মিক তেজে বলীয়ান্। কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব, কত খণ্ড প্রলয়ের প্রবল বিভীষিকা ইঁহাদের চারিধার জীবন্ত কালরাত্রির ন্যায় আসিয়া ঘেরিয়াছে—ভারতের জাতিসঙ্ঘের বহিরাকারও তাহাতে কতরূপেই না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু ভারতবাসীর অন্তর কোন্ শুভ উষাকালে, কোন্ পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সামবেদী ঋষিকণ্ঠের উদ্গীথ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল—এখনও সে গীতের মাধুর্য্য সে ভুলিতে পারে নাই, তাহাই চিরদিন তাহার অবসন্ন দেহে প্রাণ বহন করিয়া আনিয়াছে। জড়জগতের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে দৃঢ়সংস্থ এই 'ব্রাহ্মীস্থিতি'র তত্ত্ব ভারতের ঋষিগণের সাধনার ধন। তামসিক ও রাজসিক ভাবের উপরে সাত্ত্বিকতার আসন। জগতের অপর অনেক জাতি একেবারে ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ভারতবাসী তাহার এই সাত্ত্বিকস্থিতির তত্ত্বকে পূজা করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তাহার সমাজও এযাবৎ

টকিয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইল এদেশের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একটা ঘোর তামসিকতার মোহময় তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর নানাজাতির সংস্পর্শে ও চারিদিকের নানা ভাবের উত্তেজনার আঘাতে তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপেই রাজসিকতার অভ্যুদয় হয় ও ঘটিবে। এই সময়ে আমাদের দেশে ইহার আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল এবং তাহা আসিয়াছে কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতবাসী তাহার অতীত জীবনের উপর বীত শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাহিত্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাহিত্য জীবনকে প্রতিফলিত করে। আবার দেশের জাতীয়সাহিত্য জাতীয়জীবন গড়িয়া তুলিবার দাবী রাখে। আমাদের জাতায় বিশিষ্টতা আমাদের সাহিত্যে দেখিতে পাই। শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ এবং এমন কি আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত এই বিশিষ্টতার লক্ষণে অনুপ্রাণিত। কাব্য যাহা তাহাও "কান্তাসম্মিততয়া" হইলেও "সদ্যোপরনির্বৃতয়ে" হইবে ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিকের মত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেকখানি স্থানও ধূপধুনার গন্ধে ভরপূর ছিল। তখনকার সাহিত্য সমাজের সেই পরিপূর্ণ-জীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত। সমাজের সাত্ত্বিক শ্রেণীর লোকদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ক্ষাত্র ও অপর ভাবের রাজসিকতা তাহার যথোচিত পুরস্কার লাভ করিত। ভারতের কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে রঘুবংশীয়-গণের যৌবনে ইন্দ্রিয় বিষয়ের চর্চ্চার কথা বলিয়াছিলেন, আবার তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন ও অন্তে যোগাবস্থ হইয়া তনুত্যাগের কথাও বলিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ভোগের উত্তেজনা যদি উচ্চ আদর্শস্থিতির ভাবে পরিচালিত না নয় তাহা হইলে তাহার পরিণামই বা কি হয়। সমাজ কেবল অনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দাম যৌবনের লীলাখেলারই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, ইহা যাঁহাদের মত তাঁহারা জীবনের পূর্ণত্বের দিক হইতে বিচার না করায় যৌবনের মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারেন নাই। যৌবনের নামে

যে যথেচ্ছাচারের সাহিত্য আজ জাতীয় জীবনের প্রতি বিদ্রূপের অট্টহাস প্রকাশ করিতেছে তাহা যদি ইঁহাদের কথামত সমাজের সিংহাসনে আসীন হয় তাহা হইলে সমাজের পবিত্রভাব ও চিন্তা ক্রমশঃ দূরে পলায়ন করিবে। শুধু Broad grin-এ কখনও কোনও জাতির উন্নতি হয় নাই ও হইবে না। সমালোচক সাহিত্যিক মাথু আর্নল্ড শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উচ্চচিন্তাসমন্বিত জীবনের সমালোচনাপূর্ণ হইবে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখনকার সাহিত্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুর আমরা শুনিতে পাইতেছি, তাহাও আধুনিক ইউরোপীয় রীতির অনুকরণ। সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রাচীন অথবা নব্য, classical অথবা Romantic এই সকল রীতির কোনটীই একেবারে সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অধুনা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সুরটীকে আমাদের সাহিত্যে, তথা, সমাজিকজীবনে একেবারে সর্ব্বোচ্চ স্বরগ্রামে বাহাল রাখিবার উদ্দেশ্যে যে কথা উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযোগ। অবাধগতির নীতি এই শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচকেরাই আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে "আদর্শহীন শিক্ষা ও উদ্দেশ্যহীন গতি ভারতের ছিল না" এবং হইবেও না।

সাহিত্য-সেবক যখন সমাজ-সমালোচনার ভারতীয় আদর্শের অবান্তর পন্থার পন্থী হইয়া উঠেন তখন তাঁহাদের সমাজ সমালোচনার আদর্শ লইয়াই আমাদিগকে তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি যাচাই করিতে হয়। তখন আর তাঁহাদের আর্টের উদ্দেশ্যহীনতারূপ ফাঁকির আপত্তি আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছায় না। ইঁহাদের কাহারও কাহারও মতে সকল সময় সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া চলা priggishness বা আত্মম্ভরিত্ব এবং সাহিত্যে তথা সামাজিক জীবনে সকল সময়ে সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শ লইয়া কালযাপন করা অবিহিত। এই শেষোক্ত-রূপ মতের ফলেই "পয়লা নম্বরের" প্রচলন। পাশ্চাত্যের অনুকরণশীল ভারতীয় জীবনের ইহা পয়লা নম্বরের একটী বিশেষ নিদর্শন বা distinctive trait বটে। Degeneration পুস্তকের রচয়িতা,

জার্ম্মাণির মনস্তত্ত্ববিৎ ডাক্তার Max Nordau নাট্যকার Ibsenএর দৃষ্টান্তে স্ত্রীদিগের এইরূপে স্বামী পরিত্যাগ প্রণালীর নামকরণ করিয়াছেন—departures à la Nora ইহাও তাই। সাহিত্যিক রসশিল্পী কি ইহাকে শুধু উদ্দেশ্যহীন আর্ট বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন? সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইউরোপের সামাজিক বিপ্লববাদ এইরূপেই অতি নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাঙ্গালীর মনে অস্থৈর্য্য ও চাঞ্চল্য আনিয়া দিতেছে। ইহার পরের দফায় হয় ত আমরা দেশের মুটে মজুরদিগকে জীবনে না হউক সাহিত্যে অন্ততঃ ফরাসী Guy de Maupassantর Vagabondএ পরিণত হইতে দেখিব। সাহিত্য রসশিল্পীগণের নিকট হইতে পাইব Strindbergএর Confessions of a fool আর বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিতা রমণীকুলের সাধনার বিষয় হইতে দেখিব Shawএর Mrs. Warren's profession !! আমাদের সমাজেও অনেক বিকৃতি আছে স্বীকার্য্য কিন্তু উচ্চ আদর্শের নামে * অপর দেশের বিকৃতিগুলকেও কল্পনার মনোহারিত্বে ও সরস বর্ণনায় দেশের ও দশের নিকট উপস্থাপিত করিলেই কি সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখান হইল? সাম্যের ভিতর অসীমের সুর কি এইরূপেই শুনা যায়? ভারতীয় আদর্শের ইহা কি শোচনীয় পরিণাম নহে?

* * *

সংস্কৃতশাস্ত্রে ও সাহিত্যে কবিকে বিশ্বস্রষ্টার সহিত উপমিত করা হইয়াছে। ত্রিকালদর্শী, ক্রান্তদর্শী যোগী ও ঋষিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ-

* দেখা যায় যে, art for arts sake এর মত ও একটি উচ্চ ভাবের প্রতিধ্বনি। সম্পূর্ণরূপে রাগ ও কামনাবর্জ্জিত না হইলে শিল্পীর সে অবস্থা সম্ভবপর নহে, এবং তাহা সম্পূর্ণ স্বসংবেদ্য ভাব। ব্যবহারিক জগতে, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে সরূপ ভাবের সমালোচনা কার্য্যকরী হইতে পারে না। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে সকল বস্তুর পরিদর্শনকে Higher contemplative aspect of things বলা যাইতে পারে, তন্নিম্নে নীতিজ্ঞান এবং আর্টের ক্ষেত্রে সৌসামঞ্জস্যের জ্ঞান বা Sense of harmony and proportionই বলবৎ। প্রাতিভাসিক হইলেও এগুলিও সত্য এবং উচ্চতম সত্যের সহিত অবিরোধী।

শ্রেণীর কবি। ইঁহাদিগের জীবনের উপলব্ধির ইঙ্গিতেই ভারতীয় জীবনের সৎসাহিত্য রচিত হইয়াছে। স্মরণ মননের রাজ্যের উপরেও ইঁহারা উঠিয়া থাকেন, ইঁহাদের কথায় "এতাবানস্য মহিমা, অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতম্ দিবি"। আমাদের এই চরাচর বিশ্ব বিশ্বদেবতার অপার সৌন্দর্য্যের এক-চতুর্থাংশমাত্র অবলম্বনেই মহীয়সী, ধন্যা। মানবসাধারণ ইহার কতটুকুই বা জানিতে পারে, কতটুকুর ভাবেই বা সে বিহ্বল হয়! ঋষি যিনি, মন্ত্রদ্রষ্টা যিনি, ইহলোকে বিরাজ করিলেও তাঁহাদিগের দিব্য ও পূতদৃষ্টি এই আপাতদৃশ্যের যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া সেই নিখিলের দেবতায় পরাকাষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এই পরম সত্যের সাক্ষাৎ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। জীবনে ক্রমপরিস্ফুট এক সৎ সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ মানবমাত্রকে পাইয়া বসে। সে আদর্শ কোনরূপেই তাহার মন হইতে বিচ্যুত হইতে চাহে না। পরিদৃশ্যমান্ জগতে নানারূপ অবান্তর চিন্তা ও ভাবের সহিত সম্মিলিত থাকিলেও সেই অসীম সুন্দরকে জীবনে উপলব্ধি করিবার প্রেরণাই তাহাকে ইহজগতের মধ্যে নানারূপে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব অন্বেষণ করাইয়া উপরের দিকে তুলিতে চাহে। কিন্তু এই চেষ্টায় তাহাকে অনেক সময়ে বৃথা ভাবুকতার উদ্দাম গতিকে রোধ করিয়া পার্থিবজীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্পৎগুলির সহিত যোগ রাখিয়া ধাপে ধাপে, সোপানপরম্পরায় সেই সৌন্দর্য্যের ও রসের রাজ্যের উপরে উঠিতে হয়, নতুবা তাহার সৃষ্টি তাহার দর্শন বস্তুতন্ত্রহীন ও মাত্র ভাবগত (merely sentimental) হইয়া পড়ে।† এইরূপে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অনুশীলনের ফলেই তাহার আর্ট অথবা কাব্যকলা ও শিল্পকলা প্রভৃতির সৃষ্টি। সেই 'রসোবৈ সঃ' এর অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত আর্টের সৃষ্টির সার্থকতা ঘটে না। সেইজন্য সামাজিক

---

† ইংরাজ দার্শনিক কবি কোলরিজ কাব্যে চটুল কল্পনাকে Fancy ও সত্যের প্রেরণায় উচ্চভাবকে Imagination আখ্যা দিয়া দুইটিকে স্বতন্ত্র বিভাগে ফেলিয়াছেন। See Coleridge—Biographia Literaria.

জীবনের প্রত্যেক স্তরে উদ্গত আর্টের মাপকাটী স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের পরিসমাপ্তি জীবনের পূর্ণতার মধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ", আর্টিষ্টকে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। সকল উচ্চাঙ্গের আর্টসৃষ্টির মধ্যে আমরা জীবনের এই মহান্ ইঙ্গিত লাভ করি, এবং দেখিতে পাই সকল বিক্ষিপ্ততা ও অস্থিরতার উর্দ্ধে সেই স্থির সত্যের আসন। Hegelএর metaphysics of art এর তত্ত্ব, যাহা বলে "Art is the anticipated triumph of mind over matter" এবং আর্টের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের প্রেক্ষণকে যেরূপে presence of the idea in the united phenomena ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করে, তাহা ভারতীয় ভাবেরই অনুরূপ।

* * *

ভারত ভারতী সেই উচ্চতম উদ্দেশ্যকে জীবনের নানাবিভাগের কার্য্যের ভিতর দিয়া আপনার সম্মুখে ন্যস্ত করে। আর্টের সৃষ্টি হিন্দুর চক্ষে উদ্দেশ্যহীন নহে তাহাও তাহার নিকট জীবনের সাধনা-রূপে আত্মবিকাশ করে,—শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৌন্দর্য্যরূপে নহে, অতীন্দ্রিয় সাধনার দ্বারস্বরূপ হইয়া। কবির জীবনই তখন তাঁহার কাব্য বুঝিবার নির্ণায়ক মান বা Standardরূপে ব্যবহৃত হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিণামে যাহা বৈরাগ্যবান্ হইয়া, ও "উদাসীনো গতব্যথঃ" বৎ করিতে হয় রসসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণে সে জিনিষ আর্টিষ্টেরই মনের অনুরূপ আকৃতি লইয়া বাহির হয়। কাব্য-কলা, আর্টের ব্যক্তপ্রকাশের ভাগ যাহাতে অধিক তাহাতে ইহা যেমন সূচিত হয় তক্ষণ ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যাদিতে সকল সময়ে সেরূপ হয় না। কাব্য ও সাহিত্যরসশিল্পীর নিকট হইতে সেইজন্য পর বা শ্রেষ্ঠ রাগের সহিত অপর বা ইতর রাগের বিশিষ্ট সমন্বয়ের প্রতীক্ষা করা যায়। তদভাবে যাহা হয় অনেক সময় তাহা হইতে শোনা যায় কেবল আপাত-সত্যকেই সত্যের আসনে বসাইয়া পূজার অর্ঘ্য দানের আবাহন। মোহের অন্ধতমসকে দিব্যজ্ঞানের

উজ্জ্বল আলোক বোধে উপাসনা জীবনের সাহিত্যরূপে বিবেচিত হইবার অযোগ্য।

* * * *

যেহেতু আমরা এখনকার ইউরোপীয় মনোভাবের অনুকরণ ও ইউরোপীয় চিন্তার অনুবর্ত্তনেরই প্রয়াসী সেইহেতু আমরা কেবলই এখন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইব্‌সেনের 'প্রেতাত্মা', গলস্‌ওয়ার্দীর 'ঘাতপ্রতিঘাত' অথবা আর একটু উচ্চে উঠিয়া মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা'গণেরই সাক্ষাৎ পাইতেছি, আর পাইতেছি কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচকের লেখনী হইতে বৈষ্ণব কবিতার কুরুচিপূর্ণ অপব্যাখ্যা, ভারতীয় অতীত জীবনের সম্মানার্হ নরনারীগণের অবমাননা, দেশের স্বযত্নপরিপোষিত আদর্শগুলির উপর শ্লেষ ও অবজ্ঞার বিকট বদনবিকৃতি, তাই "পাঁচ হাজার বছরের পুরাণ পুঁথি" যাহা ভারতকে এতদিন বাচাইয়া আসিয়াছে, তাহা আর এখন আমাদিগের নিকট জীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারিতেছে না। জীবনে ক্লীবত্বের সহিত সাহিত্যেও ক্লীবত্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমরা ইউরোপেরও উচ্চচিন্তাশীলগণের পরিত্যক্ত অনিয়ন্ত্রিত অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যময় জীবনবাদ এবং কলা-কুশলৈকলক্ষ্যত্বকে জীবনে অবলম্বন ও সাহিত্যে গায়ত্রীরূপে অভিবন্দনা করিতেছিও তাহারই ভাবে বিভোর হইয়া জীবনকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। ইহাই আমাদের অনুকরণ প্রিয়তা। মনীষী ভিক্টর হিউগো—যাঁহার উচ্চারিত একটী কথার ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যাই art for art's sakeএর theoryএর প্রথম উদ্ভবয়িতা—তৎ-প্রণীত সেক্সপীয়র সমালোচনার একস্থলে লিখিয়াছেন, "উন্নতির উদ্দেশ্য লইয়া যে আর্টের জন্ম তাহা কলামাত্রৈকলক্ষ্যত্ব অপেক্ষা শতগুণে গরীয়ান্।" তবে কি সাহিত্যে শুধু উদ্দেশ্যের রচনাই স্থান পাইবে? তাঁহার মতে আর্ট সেই নীলিমার রাজ্য যেখানকার ধারাসম্পাতে ভূপৃষ্ঠের গোধূম পক্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, জনার, লোহিতাভ হইয়া উঠে, আপেলফলের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়, কমলালেবুর

গাত্র সোণার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠে এবং দ্রাক্ষাতেও মধুর রস সিঞ্চিত হইয়া যায়।" এইরূপ চিন্তারই প্রতিধ্বনি আমরা Matthew Arnold, Bradley, Sharp Dowden প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকগণের এবং এমন কি Taine অথবা Walter Pater এর মধ্যেও পাই।

* * * *

যে উদ্দেশ্য ব্যতীত মানবের জীবনের আর কোনরূপ ব্যাখ্যাই বিবেকিগণের অনুমোদিত হইতে পারে না সেই আকাশের মত আনন্দময় অবস্থা অসীম মহান্ উদ্দেশ্য যখন সাধক-কলাকুশলীর প্রেরণারূপে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহা তন্নিম্ন সত্যের শীর্ষদেশগুলিকেও অর্থাৎ মানবিকতার উচ্চভাব ও আশাগুলিকেও স্বীয় সাফল্যের রশ্মিতে প্রতিফলিত করিয়া সুন্দর সাজায়। হিউগোর আর একটী কথাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য,—তিনি বলিতেছেন, "বিবেকের বাঁধনহারা হইয়া উচ্চ কবিও রসশিল্পী থাকিতে পারেন না, উচ্চ চিন্তার অধীন না হইয়া তিনি কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে একদিকে যেমন সনাতন নৈতিক পন্থাকে দৃঢ় করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিতে হইবে, তাহাদের নূতন ও কালোপযোগী অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, তেমনি আবার জ্ঞানবিচার সাহায্যে নিজের মনের ও প্রাণের আবেগগুলিকেও শোধিত ও সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে।" একথার সমর্থনের জন্য আমাদিগকে বোধ হয় আর ঘরের বাহিরে যাইতে হইবে না। বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের নব জাগরণের দিনে চারিদিক হইতে আমরা আজ নূতন নূতন আদর্শের ও নূতন নূতন ভাবের কথা শুনিতে পাইতেছি এইজন্য আমাদিগকে খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সম্পৎগুলিকে আজ আর আমরা হুবহু তাহাদের সেই পুরাণরূপে পাইব না ইহা সত্য কিন্তু তাহাদের মধ্যে জীবনের যে শিক্ষার কথা অনুস্যূত ছিল—তাহা যেন আজ আমরা না ভুলি।

ইহার জন্যই কি আজ আমাদের সমন্বয়ের গুরু, ভারতের ও জগতের নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থাপনের আচার্য্য সেই "পাঁচহাজার বছর আগেকার পুঁথির" দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন—"একটী আদর্শ কেন? আমরা পঞ্চাশটী আদর্শ অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কখনই নীচু করা উচিত নয়। এইটী আমাদের জীবনের এক বিশেষ বিপদাশঙ্কা। অনেক ব্যক্তি আছেন তাঁহারা আমাদের বৃথা অভাব সকলকে, বৃথা বাসনা সকলকে আদর্শের স্থানে বসাইতে চান আর আমরা মনে করি যে উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ আর আমাদের নাই—তাহা নহে। * * * প্রত্যক্ষ জীবনকেআদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে—বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত করিতে হইবে।"

* * * *

জীবনের পথে সমস্যার মেঘ যখন ঘনাইয়া আসে, পথ যখন দেখা যায় না, সাহিত্য মধ্যে যথার্থ প্রাণের ঝঙ্কার আর যখন শ্রুত হয় না তখন আমাদিগকে ফিরিতে হয় সেই ঋষি ও কবিদিগের অভিমুখে, যাঁহারা প্রাণের সাধনা দিয়া জীবনের মহাকাব্য রচনা করিয়া যান—ফিরিতে হয় তাঁহাদের দিকে যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, যাঁহাদের তৃতীয় নয়ন সর্ব্বদাই সেই পরম সত্যের দিকে উদ্‌ঘাটিত। যাঁহারা পারে যাবার খেয়া মাঝী' তাঁহারাই সেই পারের খবর বলিয়া দিতে পারেন। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"। এই সকল মহৎ জীবনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই জীবনের সাহিত্য রচিত হইবে, মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবাসীর নিকট সত্য ও প্রকৃত কলাকৌশলের সৃষ্টি তাহার জীবনের আলোকেই গড়িয়া উঠিবে। তন্নিম্ন শ্রেণীর উদ্দেশ্য ও প্রণোদনার 'সাহিত্য' যে একেবারে বর্জ্জনীয় তাহাও কখনও হইতে পারে না। নানা রুচিবিশিষ্ট মানব তাহাদের নানাভাবের রচনাকে সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবে। মহৎ জীবনের কষ্টি-পাথরে আজ যদি আমরা সেই সকল তথা-

কথিত 'সাহিত্যের' বিচার করি তাহা হইলেই আমরা তাহাদিগের দোষগুণ দেখিতে পাইব এবং তাহার মধ্যে যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যথার্থ আনন্দপ্রদ সেইগুলিকেই আমরা আমাদের জীবনের সাহিত্যরূপে বরণ করিয়া লইব—অবশিষ্ট যাহা তাহা আমাদিগকে 'পথের ধূলির মত' পথকেই ফিরাইয়া দিতে হইবে।

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

স্বামিজী ও ভক্তিতত্ত্ব।

(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন)

বেদান্ত বলিলেই আমরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ বুঝি। কিন্তু দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য মাত্র। স্বামিজী বলিয়াছেন, "These are the three steps which Vedanta Philosophy has taken."

এই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা কি বুঝি? স্বামিজী বলেন, "In dualism, the universe is conceived as a large machine set going by God." অর্থাৎ দ্বৈতবাদীর মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন অধীশ্বর আছেন—যিনি জগতের নিয়ামক। "In qualified monism it is conceived as an organism, interpenetrated by the Divine Self". বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহস্বরূপ, যাহাতে সেই পরমাত্মা

ওতপ্রোতভাবে আছেন। "You as a body, mind or soul are a dream but what You realy are, is Existence, Knowledge, Bliss. You are the God of this universe, you are creating the whole universe and drawing it in. Thus savs the Advaitist." অর্থাৎ সেই মন-আত্মা-বিশিষ্ট যে তুমি তাহা স্বপ্ন কিন্তু তোমার যথার্থ স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করিতেছ এবং তুমিই প্রলয় করিতেছ।—অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন।

যে অদ্বৈতবাদ মেঘগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিতেছে, "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ", যে অদ্বৈতবাদ বলে, "নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা। নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥" অর্থাৎ যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার বা অংশ নহে সেইরূপ জীবও পরমাত্মা বা ব্রহ্মের বিকার বা অংশ নহে, যে অদ্বৈতবাদ বলে, জীব ব্রহ্ম অভেদ, জীবের মুক্তি সাধনসাপেক্ষ নহে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অনেকেরই বিশ্বাস স্বামিজী সেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন। যে অদ্বৈতবাদী বলে, সিংহশিশু মেষসহবাসে যেমন নিজেকে মেষ মনে করিয়া থাকে সেইরূপ উপাধিসহযোগে জীবও ঈশ্বরভাব ভুলিয়া শোক ও মোহাভিভূত হয়—'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" আবার যেমন কোন দয়ার্দ্রহৃদয় কেশরী সিংহশিশুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া জলে তাহার প্রতিবিম্ব—তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া বলে, "দেখ্ তুই ও আমি এক—তুইও আমারই মত সিংহ।" তখন যেমন তাহার মেষভ্রান্তি যায়, তেমনি যখন কোন সদ্গুরু করুণাপরবশ হইয়া "তত্ত্বমসি' "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽহম্" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতি-মহাবাক্যে তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত করিয়া দেন, তখন সেই জীব তাহার প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন বুঝিতে পারে যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্ বস্তু।" অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই বস্তু। এই অদ্বৈতবাদ যাহা জীব ও ঈশ্বরকে মায়া বিজৃম্ভিত বলে, সেই অদ্বৈতভাব-প্রচারক বৈদান্তিক

স্বামিজী ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সাধারণের বিশ্বাস অদ্বৈতবাদ জ্ঞানীর পথ এবং বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ ভক্তির পথ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক"। স্বামিজীও ভক্তিযোগে তাহাই বলিয়াছেন, "সাধারণতঃ লোকের সংস্কার—জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক বস্তু, বাস্তবিকই তাহা নহে।"

ভক্তি কাহাকে বলে? ঈশ্বরে পরানুরক্তি—পরমপ্রেমই ভক্তি। এই ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও পরা।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, "এত জপ, এত ধ্যান কর্‌বে, এত এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্‌বে, এই এই উপচারে পূজা কর্‌বে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্‌বে—এই সকলের নাম বৈধী ভক্তি।" স্বামিজী তাঁহার ভক্তিযোগে বলিয়াছেন, "সাধারণ পূজা পাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগান্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি।"

পরমভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" অবিবেকীর ইন্দ্রিয়বিষয়ে যে মহান্ প্রীতি বা আসক্তি—তোমাকে স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়। এই যে ভক্তি—মহাপ্রীতি—পরম অনুরাগ একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতিই অর্পিত হইতে পারে। এই শ্রীভগবান্ কে? "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে—যিনি অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ পরম কারুণিক পরম গুরু এবং যিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।

শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মের দুইটী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটী সগুণ—অপরটী নির্গুণ। আমরা সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্ম—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ", সেই বাক্য মনের অতীত পরব্রহ্মের উপাসনা করিব, না, যিনি সগুণ, সক্রিয়

"মনবচনৈকাধার" প্রেমময় ভগবানের ভজনা করিব? স্বামিজী বলিয়াছেন, "সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহে। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণভাব অর্থাৎ পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন।" "ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমন দ্বারা সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি।"

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মুক্ত পুরুষেরাও ত ঈশ্বরের ন্যায় সমগুণবিশিষ্ট হইতে পারেন ও স্বরূপৈক্য লাভ করিতে পারেন? কারণ, মুক্তিলাভের পর তাঁহারাও ত অনন্তশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হন। কিন্তু ভগবান্ ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে বলিতেছেন, "জগদ্ ব্যাপারবর্জ্জম্"* অর্থাৎ কেহই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, কারণ তাহা কেবল ঈশ্বরের।

মুক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরের সমগুণবিশিষ্ট হন—তাঁহারা স্বারাজ্য লাভ করেন—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্।" কিন্তু "ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ।"† "ভোগমাত্রমেষামনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্।" (শঙ্কর।) সে মুক্ত পুরুষেরা ভোগেই মাত্র ঈশ্বরের সমতা লাভ করেন। সুতরাং "সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে।" একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সম্ভব।

রামানুজও তাঁহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, "নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনন্যত্বা-সম্ভবাৎ" অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা অবিদ্যা নিরস্ত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত স্বরূপৈক্য সম্ভব নয়, অবিদ্যাশ্রয়ীর এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি?

শ্রুতিতেও আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন

* ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭

† ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১

জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ যাঁহাতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে সমুদয় প্রবেশ করে তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং মুক্ত পুরুষেরা যত সমত্বলাভই করুন, তাঁহারা কেহ ঈশ্বর হইতে পারেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, এই যে শ্রীভগবান্, ইনি পরমপুরুষ পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল এবং প্রেমময়। ইনি লীলার নিমিত্ত লীলাবশে পঞ্চরূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার সেই পঞ্চরূপ কি? অর্চ্চা—অর্থাৎ প্রতিমাদিতে শ্রীবিগ্রহরূপে অবস্থান করিতেছেন; বিভব—অর্থাৎ অবতারাদি যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি নানারূপে বিরাজিত আছেন; ব্যূহ—অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সূক্ষ্ম—অর্থাৎ ষড়্ গুণ পরব্রহ্ম, যথা "সোঽপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ।" পাপহীনতা, রজঃশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষরত্ব ও সত্যকাম-সত্যসংকল্পত্ব—এই ষড়্ গুণে যিনি প্রকাশিত আছেন এবং অন্তর্যামী অর্থাৎ সকলের নিয়ামকরূপে যিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন।

দ্বৈতবাদ-প্রচারক মধ্বাচার্য্য দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, জীবগণ শ্রীভগবানের সহিত সমতা লাভ করিতে পারে না। দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ীরা বলেন, "শ্রীমন্মধ্বমতে হরিপরতরো নাস্তি সত্যং, তত্ত্বতো ভেদঃ, জীবগণাঃ হরেরনুচরাঃ" ইত্যাদি। অথাৎ বাসুদেবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই—তাঁহার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে—তাঁহার সে জগৎ সত্য—জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ রহিয়াছে, কেন না জীবগণ তাঁহার অনুচর মাত্র।

আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (৪।৪।১৭) বলিয়াছেন, "যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাবলে পরমেশ্বরের সহিত একীভূত হন অথচ যাঁহাদের মন অব্যাহত থাকে—তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সসীম কি অসীম?" এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য

অসীম কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়—'সমুদয় দেবতা তাঁহার পূজা করেন' 'সমুদয় জগতে তাঁহার কামনা পূর্ত্তি হয়।' ইহার উত্তরে ব্যাস বলেন, "জগতের সৃষ্টাদি ব্যতীত মুক্তাত্মাগণ অণিমাদি অন্যান্য শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের। কারণ সৃষ্টি সম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় বচন আছে—সকলগুলিতেই তিনিই কথিত হইয়াছেন। তৎস্থানে মুক্তাত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই পরমপুরুষই কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্টাদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে সকলগুলিই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর 'নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণও প্রদত্ত হইতেছে। আরও শাস্ত্র বলেন যে, অপরের অণিমাদি শক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরান্বেষণ হইতে লব্ধ হয়। (তদন্বেষণ বিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকম্ ইতরেষামাদি মদৈশ্বর্য্যং শ্রুয়তে)। সেই শক্তিগুলি অসীম নহে। সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত্ব বিষয়ে তাঁহাদের কোন স্থান নাই। আবার তাঁহাদের মনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। একজন হয় ত সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই গোল এড়াইবার একমাত্র উপায় সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন হওয়া। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্তপুরুষের ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের অধীন।" স্বামিজী এই দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "As soon as you will think you are a body and a mind, you will have to take the whole. The man who says, here is the world and there is no God (Personal), is a fool ; because if there is a world, there will have to be a cause and that is what is called God. You cannot have an effect without knowing that there is a cause". এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা—তাঁহার প্রতি পরম প্রীতিই ভক্তি বলিয়া উক্ত হয়।

স্বামিজী তাঁহার ভক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, "ভক্তি আমাদের প্রকৃতিস্রোতের সহিত সামঞ্জস্যভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের

মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না।" ভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধন প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে তাঁহার ধ্যান—তাঁহার নাম স্মরণ মনন করা—কায়মনোবাক্যে তাঁহার ভজনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "ভক্তি মানে কি? না, কায়-মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায় অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা—তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য অর্থাৎ তাঁর স্তব স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন—এই সব করা।" যেমন বহির্জ্জগতে বীজ বা চারাগাছ জল, আলোক ও বাতাসের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি ধর্ম্মজগতে শ্রীগুরু সাহায্যে সহজে সাধ্যভাব উপলব্ধি করিয়া সেই অনন্ত প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতে পাবে। স্বামিজী বলেন, "এই সঞ্জীবনী-শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে গুরু বলে এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন—তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।"

কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে, অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় শুভ্র নির্ম্মল না হইলে, সত্যের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা ও দৃঢ় অধ্যবসায়-সম্পন্ন না হইলে প্রকৃত শিষ্যপদবাচ্য হইতে পাবে না। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মতেজসম্পন্ন নিরঞ্জন গুরু না হইলে জীবের যথার্থ ভববন্ধন মোচন হয় না। যেখানে বীজ সতেজ ও ভূমি উর্ব্বর সেখানে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ হয়—আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে।

স্বামিজী দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন "ধর্ম্ম—সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহা ধনবিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নহে—গ্রন্থ হইতেও উহা পাওয়া

যায় না। জগতের সর্ব্বত্র ঢুঁড়িয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি ঘুঁটিয়া আসিতে পার, সমুদ্রের অতল তল আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারি কোণে অথবা গোবি মরুর চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পার, কিন্তু যত দিন না তোমার হৃদয় উহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে ও যত দিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ—কোথাও উহা খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে—অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতায় তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সৌন্দর্য্যের অলৌকিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।"

গুরু শিষ্যের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার করেন, তাহা সচরাচর মন্ত্র দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপণ করেন। এই মন্ত্র কি? নামরূপাত্মক জগতে বাচ্যবাচকভাবব্যাপী স্ফোট বা শব্দব্রহ্ম। স্বামিজী বলিয়াছেন, "সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের নিত্য সমবায়ী উপাদানস্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দারা ভগবান্ এই জগৎ সৃজন করেন, শুধু তাহাই নহে; ভগবান্ প্রথমে আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া, পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান্ জগদ্রূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ ওঙ্কার।"

*"সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন ও সার্ব্বভৌমিক বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তদ্রূপ এই বাচ্যবাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাবসম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সকলগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের সেই বিশেষ খণ্ড ভাবের প্রকাশ করে। যেমন ওঙ্কার অখণ্ড ব্রহ্মবাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেই পরমপুরুষের খণ্ড ভাবগুলির বাচক। এই সকলগুলিই ভগবৎ ধ্যান ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়।"

সাধক গুরু-সহায়ে মন্ত্র জপ ও ধ্যানের দ্বারা স্বীয় ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হন। তিনি অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ করিবেন না। কারণ তিনি বুঝিতে পারেন, "নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥"

অর্থাৎ লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে, লোকে তোমাকে যেন ভিন্ন ভিন্ন নামের দ্বারা বহুভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, ঐ প্রত্যেক নামেই তোমার পূর্ণশক্তি অর্পিত রহিযাছে। তোমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে স্মরণ করিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। হে ভগবন্! তোমার এতাদৃশ করুণা কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব, তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

এক রাম তাঁহার হাজার নাম, এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিয়া সাধক, ভক্তশিরোমণি মূর্ত্তিমান্ দাস্যভাবঘনবিগ্রহ শ্রীহনুমানজীর মত বলিবেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।

তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥'

যদিও শ্রীনাথ ও জানকীনাথ পরমাত্মারূপে অভেদ তথাপি কমল-লোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব, এই মনে করিয়া সাধক ইষ্টের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ কোরে জলের উপর ভাসে কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল মুখে পড়্‌লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায় আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেইরূপ গুরুমন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায় আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।" স্বামিজী তাঁহার ভক্তি-যোগে বলিয়াছেন, "যদি ভক্ত সাধক অকপট হন তবে গুরুদত্ত বীজ-মন্ত্র প্রভাবেই পরাভক্তি ও পরম জ্ঞানরূপ সুবৃহৎ বটবিটপী উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্ম্মরূপ

সুবৃহৎ ক্ষেত্রকে আচ্ছাদন করিবে। তখনি প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন, তাঁহার নিজেরই ইষ্টদেবতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত হইতেছেন।"

এখন দেখা যাউক পরাভক্তি কাহাকে বলে।

ইহা পরম প্রেমের অবস্থা। বৈধীভক্তি যখন ঘনীভূত হয়, ভগবানের প্রতি যখন ভক্ত সাধকের তীব্র অনুরাগ হয়, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যখন প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হয়—শ্রীভগবানের অদর্শনে উন্মত্তের মত হয়, তখন রাগানুগা ভক্তির আরম্ভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ নামের আর্ত্তি—তাঁহার সেই প্রেমবিহ্বল অবস্থা—কৃষ্ণবিরহে কখনও মৃত্তিকায় মুখ ঘষিতেছেন, কখনও হা কৃষ্ণ বলিয়া নয়নজলে প্লাবিত হইয়া ধুলায় লুটাইতেছেন—তখন তাঁহার যে দৈন্য, যে বিহ্বলতা, যে ভাবস্ফূর্ত্তি—প্রেমের সেই জলন্ত ছবিই পরাভক্তির উদাহরণ স্থল। সে দিন পঞ্চবটীমূলে বসিয়া যে মহাপুরুষ "মা, মা, দেখা দে মা" বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন—আবার কখনও "মা! আমাকে দীনের দীন, হীনের হীন ক'রে দে মা, আমার অহং জ্ঞান নাশ ক'রে দে মা, তোর পাদপদ্মে অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি দে মা—এই যে আর্ত্তি, এই যে ব্যাকুলতা ইহা প্রেমজগতের অপূর্ব্ব আলেখ্য—ইহাই পরাভক্তি। বৈধীভক্তির আন্তরিক সাধনায় যখন সাধক সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি পরাভক্তিলাভের অধিকারী হন। পরাভক্তিলাভ করিলে তখন বিধি সব অবিধি হইয়া যায়। এই পরাভক্তি শুধু ভাবপ্রবণতা নহে—সুধু প্রেমোন্মত্ততা নহে—ইহা পরম প্রেমের অবস্থা। এই পরাভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসদের বলিয়াছেন "শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।" স্বামিজী ভক্তিযোগে বলিয়াছেন "এইরূপে যখন পরাভক্তি প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ঐ ভক্তির বিরোধী বিষয় সম্বন্ধে মনে বিরক্তি হইতে থাকে। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। তাঁহার বিষয়, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা

ত্যাগ কর। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।" যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন তাহারা তাঁহার পক্ষে শত্রুরূপে প্রতীয়মান হন। যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে যে এই শরীরধারণ কেবল একমাত্র তাঁহার উপাসনার জন্য, তখন তিনি ভক্তির আর এক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। তখন উহা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয় আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখ বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম তদর্থপ্রাণস্থান তদীয়তা। ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন তখন এই তদীয়তা আসে।"

এই তদীয়তা প্রেমের চরম স্ফূর্ত্তি।

এই প্রেম সম্ভোগ করিবার জন্য মহাপুরুষেরা ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ আস্বাদন করেন। মায়ের ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ তাই বলিয়াছিলেন "চিনি হতে চাই না, মা, চিনি খেতে ভালবাসি।" শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"আত্মারামশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থাঽপুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

হে রাজন্। হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে যাঁহারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন—যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে—তাঁহারাও ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই পরম প্রেমের খেলা—ভাবের লীলা—অহৈতুকী ভক্তির লীলাবিলাস—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—একাধারে এই পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়। এই প্রেমলীলা মানবীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সংসারে যে পঞ্চরস, যে পঞ্চভাবের খেলা দেখিতেছি—যে খেলায় জীব ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া "ত্রাহি মাং মধুসূদন" করিতেছে—

সেই পঞ্চরসে ভক্তিসাধক শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া কি অপূর্ব্ব প্রেমমাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিশাস্ত্রে সেই পরম সুন্দর চিরকিশোরকে নানাভাবে ভজনা করিতেছে। এখানে শাস্ত্রবিচার নাই, নিয়মের গণ্ডী নাই, স্বার্থের পঙ্কিলতা নাই, অহঙ্কারের মাদকতা নাই—এমন কি ভালবাসার বিচার নাই। এখানে শুধু সেই প্রেমমাধুর্য্য সম্ভোগ। এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"যারা মরম না জানে ধরম বাখানে
এমতি আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥
সেই আলার ভিতরে কালাটী রয়েছে
চৌকী রয়েছে সেথা।
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
বাজিবে মরমে ব্যথা।

এখানে অন্যকথা শুনিলে বিরক্তি বোধ হয় যে বলে তাহাকে শত্রু মনে হয়, তাহারাই ঘরের শাশুড়ী ননদী—জটিলা কুটিলা। ভক্ত শুধু মধুর ভাবের রসেই তৃপ্ত হন নাই—তিনি পরকীয়া রসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। স্বামিজী বলিয়াছেন "মনুষ্য-হৃদয়ের সব ভালবাসা সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই একমাত্র প্রেমের পাত্র। এই মনুষ্য-হৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনি পরম সুন্দর পরম মহৎ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর কে আছে? তিনি ব্যতীত জগতে আর স্বামী হইবার উপযুক্ত কে? জগতে ভালবাসার পাত্র

আর কে আছেন? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে ভগবদ্ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা উহাকে বর্ণনা করিবার উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও বুঝিবে না, তাহারা কেবল উহা জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটী মাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান।' প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও, যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া তোলে। ভগবান্ একবার যাঁহাকে অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন তাঁহার সমুদায় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়—তাহার পক্ষে সূর্য্য চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না—আর সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিশাইয়া যায়। ইহা প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা। প্রকৃত ভগবৎ প্রেমিক আবার ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদকর বোধ হয় না ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়া) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল, উহার অবৈধতা তাহাদের লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে যতই উহা বাধা পায় ততই উহা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন যেন কোন বালিকা তাহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত আর তাহার পিতা মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উহা প্রবলভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত হইয়া ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার সাড়া পাইবা-

মাত্র গোপীরা সমুদায় ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া—জগতের সব বন্ধন, জাগতিক কর্ত্তব্য, ইহার সমুদায় সুখ দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত—মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ঐশ্বরিক প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পার। তোমার কি মন মুখ এক? যেখানে রাম আছেন—সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম—সেখানে রাম থাকিতে পারেন না।"

সুতরাং সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হইলে কেহ পরাভক্তির—মধুর প্রেমের আলোচনার অধিকারী হইতে পারেন না। ভক্তিযোগের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, স্বামিজী যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা অপর কোন বাদ বা মতকে খণ্ডন করেন নাই—তিনি সকলের মধ্যে এক সমন্বয়-সূত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সেই সমন্বয় ধর্ম্মের বেদ। আমরা যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হইতেছি, আত্মার মহিমা ভুলিয়া জড়ের পূজার দিকে ধাবিত হইতেছি, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি ও কপটতা আচরণ করিয়া আসিতেছি, আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি অদ্বৈততত্ত্বের আত্মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং দ্বৈতবাদীর নারায়ণ পূজা—সেবা-ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যে নারায়ণ প্রতিদ্বারে ভিখারীর বেশে, পথে আতুরের বেশে, প্রতি গৃহে মূর্খের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন সেই নারায়ণের সেবা করিবার জন্য আমাদের বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। ভিতরে ঘোর বিষয়মত্ততা, লোককে প্রবঞ্চনার জন্য জল্পনা করিতেছে আবার এদিকে হরিনামে কপটাশ্রু ফেলিয়া নিজকে লোকের নিকট দীনহীন ভাবে দেখাইয়া পরম ভক্ত নামে প্রচারিত হইবার জন্য জাহির করিতেছে—এই সব কপটতা ও অধর্ম্মকে দমন করিবার জন্য তিনি তীব্র ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাই অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া থাকি—মনে করি তিনি ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব

জীবন দেখিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত ভগবদ্বাণী শুনিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন, তিনি পরম প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ ছিলেন—ভক্তির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়া জীব কল্যাণের জন্য প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "নরেনের নিগুর্ণে ভক্তি।" এই ভক্তি বিরল দৃষ্টিগোচর হয়।" স্বামিজী নিজেই ভক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মের নিগুর্ণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে।" কিরূপ উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিলে এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ হয় তাহা শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, আমাদের ন্যায় সামান্য অধিকারী তাহা ধারণা করিতে অক্ষম।

সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যোহসৌ স্মৃতঃ।

"সেই বিষ্ণু সগুণ ও নিগুর্ণ—তিনি জ্ঞানগম্য বলিয়া উক্ত হন।" শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্।
নান্যৎ তদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্॥

হে ভূমা! তুমি সগুণ ও নিগুর্ণ; তুমিই সমস্ত। মনোবাক্যে তুমি ছাড়া আর কিছুই নাই। যিনি "অচল ঘন গহন গুণ গায় তোমারি" গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন তিনিই আবার "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই" গাহিতে গাহিতে উক্ত ভজনের শেষ দুই চরণে আসিয়া—"বিহরত রঘুরাজ সখা সুহৃদ সরযূতীর। তুলসীদাস হরষে নিরখে চরণরজঃ পাই।"—ভাবাবিষ্ট হইয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেন! একবার বরাহনগর মঠে তিনি ভেকধারী বৈষ্ণবভাবে রঙ্গরস করিতে করিতে "নিতাই আমার নাম এনেছে রে" এইকলি গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনানন্দে এত উন্মত্ত ও বিভোর হইয়াছিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যখন পরম ভক্ত স্বর্গীয় নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠাকালে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া

কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া নবগোপাল বাবুর গৃহাভিমুখে গিয়াছিলেন—তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। যেবার পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব হইয়াছিল সেবার উৎসবস্থলে সালিখাদলের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাকে নৃত্য করিতে বহু লোকে দেখিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন স্বামিজী ভক্তিধর্ম্ম ও কীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা যে শুধু সত্যের অপলাপ করেন তাহা নহে তাঁহারা মহাপুরুষের ভাব বিকৃত করিয়া থাকেন। স্বামিজী স্পষ্ট বলিয়াছেন—

শোন বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য সার,
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার।
মন্ত্র তন্ত্র প্রাণ নিয়মন, মতামত দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন॥

স্বামিজী এই প্রেমধর্ম্ম কি ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন -

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—অর্থাৎ এই আত্মা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা এবং বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য হন না। ইনি যাহাকে বরণ করেন তাঁহারই লভ্য হন, তাহারই নিকট আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। রামানুজ বলেন, "যোঽয়ং মুমুক্ষুঃ বেদান্তবিহিত-বেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি।"

অর্থাৎ যখন বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানরূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর সেই ধ্যানে সুমহতী প্রীতির অনুভব হয় তখনই তিনি সেই পরম-পুরুষকে লাভ করেন।

কলিযুগে যখন জীব কঠোর সাধনায় অপারগ ও বিমুখ হইল, যখন ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদি ত্যাগ করিয়া মানুষ ধর্ম্মকে শুধু বাগ্‌জালে পরিণত করিল, তখন পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। এই নাম সাধন নাম জপ হইতে ধ্যানাদি সহজে আসিবে বলিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নামমাহাত্ম্য প্রচার করেন। কিন্তু অধুনা পাশ্চাত্য জড়বাদ প্রচারের সঙ্গে আমরা এরূপ জড়বৎ হইয়াছি যে, সে নাম সাধন করিতেও আমরা বিমুখ ও অশক্ত। কোটী কোটী লোকের মধ্যে বিবেক বৈরাগ্যবান্ ঈশ্বরলুব্ধ সাধক বিরল দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আর দেবমন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া নির্ম্মিত হয় না, সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনিতে ভক্ত গৃহস্থের ঠাকুরঘর আর পূর্ব্বের মত মুখরিত হয় না; এমন কি এখন আমরা এতদূর অধঃপতিত হইয়াছি যে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী দূরে যাক, আপনার সহোদর এমন কি পিতামাতার সহিতও একসঙ্গে প্রীতির সহিত বাস করিতে পারি না, কেন না কেবল ভোগাভিলাষী আত্ম-সুখান্বেষণে ব্যস্তচিত্ত হইয়া কাম-কাঞ্চনের পূজায় আসক্ত হইয়াছি। দেশহিত, লোকহিত, পরহিত সব এখন অভিমান ও যশোলিপ্সার নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুজনহিতার্থে সামান্য ত্যাগ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।" অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। এখন সে অনাসক্ত কর্ম্ম কোথায়? এই অনাসক্ত কর্ম্ম করিতে কে সক্ষম? যাঁহার মন বুদ্ধি শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়াছে, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ও নিরভিমান—তিনিই যথার্থ দেশ ও সমাজের হিতকারী। ভারতের সনাতন আদর্শ ইহাই ছিল। আজকাল ভারতের শোচনীয় পরিণাম ও পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ কলুষিত হইতে দেখিয়া স্বামিজী ত্রিতাপদগ্ধ জীবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট সেবাধর্ম্ম প্রচার দ্বারা প্রত্যেককে নারায়ণজ্ঞানে সেবাধর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া সেই প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় সনাতন পদ প্রাপ্ত হন।

সুতরাং সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্ত অব্যয় শাশ্বত পদ লাভ করিতে পারেন। এই সকল কর্ম্ম কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে গীতায় শ্রীভগবান্ তাহাও বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু করিবে—অশন, যজন, দান, তপস্যা—সবই আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে। সুতরাং নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচরণ তাহা বলা বাহুল্য। যেমন নাম সাধনে জপ ধ্যান সমাধি আপনা আপনি আসিয়া থাকে—যেমন নাম জপ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি এই সেবাধর্ম্মে—এই নারায়ণ পূজায় ভাব ভক্তি প্রেম প্রভৃতি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইবে। সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় আমরা সেই পরম কারুণিক ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

ব্রজ-ভ্রমণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৃন্দাবনে অনেক দর্শনীয় স্থান ও দেবালয় আছে—তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত স্থান বা দেবালয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়পুর রাজার প্রতিষ্ঠিত নুতন রাধাগোবিন্দের মন্দির—মথুরা যাইবার পাকা রাস্তার বামদিকে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের কারুকার্য্য ও মন্দিরসংযুক্ত বাগান অতি রমণীয়।

রাধাবিনোদের মন্দির ও রাধাবিনোদবাগ—তরাসের রাজা রায় বনমালী রায় বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রায় বাহাদুর এই দেব-সেবার জন্য বিস্তর ভূমি ও বিত্ত দান করিয়াছেন। এই মন্দির ও বাগান জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে ও মথুরার রাস্তার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বড় রাস্তা হইতে প্রায় ১ পোয়া ভূমি তফাতে রাজা বাহাদুরের সুবৃহৎ বাটীও আছে।

বড় রাস্তা হইতে ½ মাইল দূরে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিদ্যালয়—২০।২২ জন বালককে এই আশ্রমে রাখিয়া বিদ্যা দান করা হয়। স্থানটি অতি নির্জ্জন, নানাবিধ তরুরাজি ইহার চারিধার বেষ্টন করিয়া আশ্রমটিকে একটি রমণীয় কুঞ্জে পরিণত করিয়াছে। এখানে আসিলেই পুরাণ-বর্ণিত তাপসগণের আশ্রমের কথা মনে পড়ে। স্নিগ্ধ বনশোভা ও হরিৎ লতা-বিতানগুলি দর্শন করিয়া প্রাণে এক নির্ম্মল শান্তি আসিয়া থাকে। সহরের মধ্যে মণ্ডি বাজারের ধারে ইঁহাদের সমাজগৃহও আছে।

কেশীঘাটের নিকট কৃষ্ণকালীর মন্দির—দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুচক্রে তাঁহার শরীর ৫২

অংশে বিভক্ত হয় ও সেই অংশগুলি যে যে স্থানে পতিত হয় সেই স্থানগুলি এক একটি পীঠস্থানরূপে পূজিত হইতেছে। এখানে সতীর কেশ পড়িয়াছিল—সেইজন্য দেবী 'কেশী-কালী'রূপে বিরাজিতা আছেন।

দর্শক ও যাত্রিগণ যে কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার ভাড়া পৃথক দিতে হয় না। বৃন্দাপূজার ভেট ও উপকরণাদি সেই কুঞ্জের প্রাপ্য এবং উহাতেই কুঞ্জস্বামীর ভাড়া পোষাইয়া যায়।

বৃন্দাবনে সকল সময়েই যাত্রি-সমাগম হইয়া থাকে—বিশেষতঃ দোল, ঝুলন ও অন্নকূট-যাত্রায় লোকসমাগম অধিক হয়। বৈশাখ মাসে "ফুলদোল" দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হয়। মাসব্যাপী প্রতি মন্দিরের ফুলসজ্জা এখানকার একটি দেখিবার জিনিষ। প্রত্যেক মন্দিরে নানাবিধ সুগন্ধি ফুলে ছোট বড় বাঙ্গলা ও গৃহ রচিত হইয়া বিগ্রহগুলি স্থাপিত হয়। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড তাপে অবসন্ন শরীর ও মন এই সময়ে সন্ধ্যার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে মৃদুমন্দ পবন প্রত্যেক মন্দিরের ফুলসজ্জার স্নিগ্ধমধুর গন্ধ আহরণ করিয়া সারা সহরে বিলাইতে থাকে। দর্শকগণ এই সময় বিচিত্র বেশে ভূষিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে হাস্যকোলাহলে রাজপথগুলি মুখরিত করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের অপূর্ব্ব ফুলসজ্জা দর্শন করিয়া বেড়ায়। শেঠের মন্দিরে ফুলসজ্জা দর্শনযোগ্য। অন্নকূট ও ঝুলনযাত্রাই এখানকার প্রধান উৎসব—সেই সময় প্রতি মন্দিরেই সাজ সজ্জার আতিশয্য লক্ষিত হয়। নানাপ্রকার বিচিত্র হিন্দোলায় মণিমুক্তা-ভূষিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিয়া ভক্তের হৃদয়মন যে মোহিত হইবে আনন্দে আপ্লুত হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এই ঝুলনযাত্রা শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত থাকে।

বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ পরিক্রম প্রতি একাদশীতেই হইয়া থাকে। আজকাল যমুনা বৃন্দাবনের অনেক স্থান গ্রাস করিয়া তিন ক্রোশ মাত্র পরিক্রমার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই দিন ভক্তেরা অন্ন আহার করেন না, সেই জন্য পরিক্রমা-রাস্তায় অনেক দানশীল

ব্যক্তি স্থানে স্থানে পরিক্রমাকারীকে ফলমূল ও পানীয় দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রচণ্ড উত্তাপে বৃন্দাবনের বালীর রাস্তায় পদব্রজে ভ্রমণ করা যে কি প্রকার কষ্টদায়ক তাহা যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং যাঁহারা এই সময় পরিক্রমাকারীদের সুশীতল পানীয় ও ফলমূলাদি দান করেন তাঁহারা প্রকৃত সেবাই করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, আমরা এখন পুনরায় পূর্ব্ব প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা দুই বন্ধুতে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিলিত হইলাম ও ঘন ঘন হরিধ্বনি ও সংকীর্ত্তনের সহিত বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে লাগিলাম। এই পরিক্রমা কেশী-ঘাট হইতে আরম্ভ হইল। পরিক্রমা-রাস্তায় যে স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল—

কেশীঘাট এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এই স্থানে রামজীর একটি মন্দিরও আছে। মূলুকদাসী সম্প্রদায়ের ইহাই কুঞ্জ। স্বামী হরিদাসের ভক্তি ও শান্তিবাদ ইঁহারা গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রকেই ভজনা করিয়া থাকেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

প্রেম-মহাবিদ্যালয়—ইহা হাত্রাস-রাজের একটি বিশাল কীর্ত্তি। ইনি দেশের অভাব, দরিদ্রের ক্রন্দন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া উহার মোচনকল্পে যে মহানুভবতার ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। কেশীঘাটে এই রাজার একটি সুবৃহৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিল এবং বিগ্রহের নিত্যপূজারও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান রাজা এই পূজার পরিবর্ত্তে নিত্য জীবন্ত দেবতার পূজার আয়োজন করিয়া প্রেম-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিগ্রহ অন্যত্র একটি মন্দিরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালকগণকে বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামোপযোগী নানাবিধ বিদ্যাদানের জন্য বিদেশ হইতে বহু অর্থব্যয়ে কলকব্জাদি আনীত হইয়াছে এবং রাজা

স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের একজন অন্যতম তত্ত্বাবধারক। বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তিনি অনেক টাকার সম্পত্তিও দান করিয়াছেন। এখানে বয়ন শিক্ষা, লোহার কাজ, টাইপ রাইটিং, সর্ট হ্যাণ্ড, ছুতার মিস্ত্রির কাজ, Mechanical Engineering, চিত্রাঙ্কন বিদ্যা প্রভৃতি বিনাব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি এইরূপ সুবৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু কি উপায়ে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে এবং কিরূপ শিক্ষা এই বিদ্যালয়ের উপযোগী দেখিবার জন্য ইউরোপ গমন করেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় তিনি জার্ম্মাণীতে আটক পড়িয়াছেন। আজকাল এই বিদ্যালয়-পরিচালনার্থ অনেক ধনী অগ্রসর হইয়াছেন। বৃন্দাবন-বিহারীর কৃপায় এই মহৎ অনুষ্ঠান দিন দিন সফলতা লাভ করুক।

ধীর সমার—এইখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন এবং পবনদেব মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন।

বংশীবট—এইখানে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিবার মানসে বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিতেন এবং সেই বেণুরবে আকুল হইয়া গোপিনীরা গভীর রাত্রে অভিসারে বাহির হইয়া প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতেন। এখনও নিত্য প্রাতঃকালে ব্রজ-বালকগণ রাসলীলা করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেব—বংশীবটের নিকটেই ইঁহার মন্দির। বৃন্দাবন প্রদক্ষিণকালে ও বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার সময় ইঁহার দর্শন এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। যদি কেহ তাহা না করে তবে ইনি সেই হতভাগ্যের সমুদায় পুণ্য অপহরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীবটে রাসলীলা করিতেন তখন শ্রীমহাদেব গোপীরূপে উপস্থিত হইয়া সেই আনন্দে যোগ দিতেন. দুই তিন দিন এইরূপ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারেন এবং সেই গোপিকারূপিণী মহাদেবকে "গোপীশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করেন। গোপীগণ নিজ নিজ অভীষ্ট

পূর্ণ করিবার কামনায় তাঁহাকে এই স্থানে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

যমুনা-পুলিন—এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া মহারাস করিয়াছিলেন। আজকাল পুলিনের চতুর্দ্দিকে বিস্তর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে টিকারীর মহারাণীর মন্দির ও কাশীমবাজারের মহারাজার মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই পুলিনেই একদিন রাধাবিনোদিনী শ্যামবিরহে রোদন করিয়াছিলেন। এইখানেই শ্যামের বেণুরবে উদ্‌ভ্রান্ত ব্রজ-গোপীরা আলুথালুবেশে শ্যামসম্মিলিতা হইতেন। আর উচ্ছ্বসিত যমুনার কাল জল রাধাবিনোদের পদযুগল ধৌত করিয়া তালে তালে নৃত্য ও অবিরাম সুমধুর কলধ্বনি করিতে করিতে সেই মহারাসের মিলনগাথা দেশে দেশে বহন করিয়া ভাবুক ভক্তের হৃদয় মধুর উল্লাসে পূর্ণ করিত!—কত প্রেমিক কতই না প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইতেন!

অক্রূরঘাট—ভক্তরাজ অক্রূর কংশের আদেশে কৃষ্ণ বলরামকে নন্দালয় হইতে মথুরায় কংশযজ্ঞে লইয়া যাইতে আগমন করিলেন কিন্তু এই সুকুমার বালকদ্বয়কে কি বলিয়া, কোন পাষাণপ্রাণে, দুষ্ট কংশের কূট মন্ত্রণা জানিয়াও মথুরাপুরীতে লইয়া যাইবেন তাহা ভাবিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজেই মথুরা যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও অক্রূরকে রথ আনিবার আজ্ঞা করিয়া স্নেহময় পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাম-কৃষ্ণগত প্রাণ নন্দ ও যশোদা কিছুতেই তাঁহাদের নয়নপুতলিদুটিকে কংশের যজ্ঞে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক যুক্তি ও তর্ক-সহায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মত করাইলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া পরদিবস অতি প্রত্যুষে রথারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রামপ্রান্তে আসিয়া দেখিলেন যে গোপাঙ্গনাগণ তাঁহারই দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রথ ধীরে ধীরে ব্রজবালাগণের নিকটে আসিল, অমনি সেই কিশোরীগণ—কেহ রথের চাকা কেহ বা অশ্বের বল্গা ধরিল, কেহ বা পথের মাঝেই শুইয়া

পড়িয়া পথরোধ করিল আবার কেহ বা তাঁহার পীতবস্ত্র আকর্ষণ-পূর্ব্বক কেমন করিয়া এত নিষ্ঠুরপ্রাণে তাহাদের—কৃষ্ণগত-প্রাণা উন্মাদিনী ব্রজগোপীদের—ত্যাগ করিয়া তিনি চোরের মত চুপি চুপি পলাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই গোপীদের অতি মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু অদূরে লতাবিতানে ঐ যে অভি-মানিনী বালা ধূলায় লুণ্ঠিতা হইতেছেন, উহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন? অভিমানিনী—তাঁহারই প্রেমে পাগলিনী প্যারীর নিকট বিদায় না লইয়া চুপে চুপে যে এতটা পথ চলিয়া আসিয়াছেন তাহারই বা জ্ঞানপূর্ব্বক কি কৈফিয়ৎ দিবেন? মানিনীর মান ভঞ্জন করিয়া মিষ্ট কথায় বিদায় লইতেই হইবে—নতুবা তাঁহার যে এক পা নড়িবার শক্তি নাই! তিনি ধীরে অতি সন্তর্পণে কিশোরীর নিকট আসিলেন ও মানিনীর মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সপ্রেম কটাক্ষে সেই মধুর ভুবনভুলান হাসি হাসিয়া প্রিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! যে হাসিতে যে কটাক্ষে ত্রিভুবন পাগল হয়—সেই ক্রূর কটাক্ষে—তদ্গতপ্রাণা বিরহিনী যে আকুল হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাহার পর কত মান কত অভিমান—কত চোখের জল সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ প্লাবিত করিল—অতৃপ্তি তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল! কত অনুনয় বিনয়ের পর বিদায়মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল—পরস্পরে বিদায় লইলেন। রথ চলিতে লাগিল। কিশোরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদাসপ্রাণে ধীরে ধীরে ব্রজের পথে ফিরিয়া গেলেন।

দ্বিপ্রহরে অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে লইয়া যমুনা তীরে উপস্থিত হইলেন এবং নিকটবর্ত্তী কালিন্দী হ্রদে স্নানপূজাদির জন্য রথ থামাইলেন ও কৃষ্ণ-বলরামকে রথেই উপবেশন করিতে বলিয়া—জলে নামিয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়াই শ্রীভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই হ্রদের অপর দিকে জলে নামিয়া জলখেলা করিতেছেন; এই দৃশ্য

দেখিয়া তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন ও শীঘ্র জল হইতে উঠিয়া রথের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে দুই বালকে অতি নিবিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছে—জলে নামিবার কোন চিহ্নই নাই। দৃষ্টির ভ্রম মনে করিয়া তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ও পূজায় নিবিষ্ট হইলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে নিজের পার্শ্বেই জলে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিতে পাইলেন। এবারও রথের নিকট আসিয়া দুই ভাইকে পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হ্রদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে কৃষ্ণ বলরাম পূর্ব্বের মত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, ভগবান্ যে তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই বার বার এইরূপ করিতেছেন। তিনি সেই হ্রদের তীরেই কৃষ্ণ-বলরামকে আবাহন করিয়া পূজা করিলেন। সেই অবধি এই স্থান বৈষ্ণব ভক্তগণ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে এখানে হ্রদ বিদ্যমান থাকিলেও এখন উহার আর চিহ্নমাত্রও নাই।

ভোজনস্থলী—একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য রাখাল-বালক-গণের সহিত গোচারণ করতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দ্বিপ্রহরে যখন মার্ত্তণ্ডদেব প্রবল কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তাপিত করিতেছিলেন তখনও বালকগণের আহার হয় নাই। গোপশিশুবৃন্দ ক্ষুধায় অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল যে, তাহারা আর বসিতে পারিতেছে না—ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণের শুষ্ক মুখ দেখিয়া তিনি তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং উহারই মধ্যে দুই তিনটি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বালককে নিকটবর্ত্তী মথুরা গ্রাম হইতে—যেখানে মুনিগণ কৃষ্ণযজ্ঞ করিতেছিলেন—অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিতে পরামর্শ দিলেন। বালকগণ পুলকিতচিত্তে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল ও মুনিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল, কিন্তু তৎকালে মুনিরা যজ্ঞ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বালকগণের প্রার্থনায় কোনও উত্তর করিলেন না এবং ভিক্ষাও দিতে পারিলেন না। হতাশ হইয়া ম্লানমুখে বালকগণ ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে মুনি-

৭

পত্নীরা তাহাদের শুষ্কমুখ দেখিতে পাইয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ উত্তম উত্তম আহার্য্যে পাত্র সাজাইয়া কৃষ্ণ বলরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মাতৃভাবে অনুপ্রাণিতমুনিপত্নীগণ এই দুইটি সুকুমার বালককে ও অন্যান্য রাখালবালকগণকে অতি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। এই দুইটি আশ্চর্য্য বালকের রূপ ও গুণাবলি বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মুনিপত্নীগণের বহুদিন হইতেই এই অদ্ভুত বালকদ্বয়কে দেখিবার বাসনা হইয়াছিল—আজ তাঁহাদের সেই বাসনা যে এমনভাবে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে মাতৃত্বের চরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা করিবে তাহা কে জানিত? মুনিপত্নীগণ স্নেহসিক্ত হইয়া নিজ নিজ সন্তানসদৃশ এই বালকদ্বয়কে ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানকে ভোজনস্থলী বলে।

দাবানলকুণ্ড—কালিন্দীর হ্রদে কালীয় নাগ দমন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইলে অন্যান্য রাখালবালকেরা ভীত হইয়া পুরবাসিগণকে ও রাজারাণীকে সংবাদ প্রদান করিল। বৃন্দাবনগৌরবকে চিরতরে হারাইবার আশঙ্কায় ব্রজবাসিগণ ও উন্মাদিনীপ্রায় মাতা যশোদা ছুটিয়া হ্রদের নিকট আসিলেন এবং নয়নের মণি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করিয়া ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্পূজিত হইয়া জল হইতে কূলে আসিলেন ও পিতামাতার চরণ বন্দনা ও অন্যান্য গোপগণকে সান্ত্বনা করিলেন। সন্ধ্যা তখন আগতপ্রায়। কৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাণী গোপালের কল্যাণে সেই স্থানেই উৎসব ও রাত্রিবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাণীর আদেশে তৎক্ষণাৎ স্থান পরিষ্কৃত হইল ও খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইল। নানাবিধ আমোদ প্রমোদে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইলে সকলেই যে যেখানে পাইল শয়ন করিল ও কর্ম্মক্লান্ত দেহ শীঘ্রই নিদ্রার কোলে ঢুলিয়া পড়িল। ব্রজবাসিগণ যখন সুষুপ্তি-মগ্ন হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিল তখন

নিকটস্থ বন হইতে সহসা প্রজ্জ্বলিত ভীষণ দাবানল সমগ্র ব্রজমণ্ডল গ্রাস করিবার জন্যই যেন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে ও শব্দে ব্রজবাসিগণ জাগরিত, ভীত, চকিত ও ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। রাণী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়—তাঁহার সর্ব্বস্বধন কানাই বলাইকে এই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি হইতে কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অনন্তশক্তি-ধারী শ্রীকৃষ্ণ মাতার ও অন্যান্য গোপবৃন্দের ব্যাকুলতা দর্শনে সেই ভীষণ অগ্নি পান করিয়া ফেলিলেন এবং নিকটস্থ কুণ্ডে মুখ প্রক্ষালন করিয়া স্মিতহাস্যে সকলকে অভিনন্দন করিলেন। গৌরবে রাণীর মুখ উদ্ভাসিত হইল, তিনি সস্নেহে প্রিয়তম পুত্রকে কোলে টানিয়া অজস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করিলেন। পুত্রজ্ঞানে মুগ্ধা মাতা ক্ষণিকের জন্যও বুঝিতে পারিলেন না যে এ কোন অত্যাশ্চর্য্য শক্তি-ধারী বালক তাঁহাকে পুত্ররূপে মুগ্ধ করিতেছে! প্রভাতে সকলেই মহা উল্লাসে বৃন্দাবনে ফিরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিনির্ব্বাণ করিয়া এই কুণ্ডে মুখ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহাকে দাবানলকুণ্ড বলে।

কালীদহ—এই হ্রদে কালীয় নাগ বাস করিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য রাখালবালক-সহ গোচারণ করিতে করিতে এই হ্রদের নিকট-বর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে হ্রদের নির্ম্মল স্বচ্ছ জল দেখিয়া অনেকেই উক্ত জলে পিপাসা নিবারণ করিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু হ্রদের নিকট আসিয়া বালকগণ দেখিল, জল বিবর্ণ ও বিষাক্ত—পিপাসায় জল পান করিতে না পারিয়া সকলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জল পান না করিতে পারিবার কারণ জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ কারণ অনু-সন্ধান করিতে হ্রদসন্নিহিত কদম্ব বৃক্ষ হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই কালীয় ও অন্যান্য বিষধর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হ্রদের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাখালবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্পকর্ত্তৃক বেষ্টিত ও জলমধ্যে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া মহা ভীত হইয়া বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক ব্রজবাসীদের উক্ত সংবাদ প্রদান করিল।

ব্রজবাসী গোপগোপিকাগণ বালকগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়

হ্রদে প্রবেশের বার্ত্তা শুনিয়া সকলেই হ্রদের নিকট আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিতা ও অন্যান্য গোপগণের আগমন জানিতে পারিয়া শীঘ্র দুষ্ট সর্পকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সর্পকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। সর্প কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিষ্পেষিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইল ও তাঁহাকেই স্তব করিতে লাগিল। নাগরাজকে ভীত ও দমিত দেখিয়া, তাহার প্রতি কৃপাবেশে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহস্রফণাযুক্ত মস্তকে দাঁড়াইলেন ও মধুর বংশীধ্বনি করিতে করিতে জল হইতে কূলে আসিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই অবধি এই হ্রদ বৃন্দাবনের অন্যতম তীর্থরূপে পূজিত হইতেছে।

আদিত্য তীর্থ বা সূর্য্যঘাট—শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর পুরাতন মন্দিরের নিকট যমুনার ঘাটগুলিকে সূর্য্যঘাট বলে। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিবার জন্য বহুক্ষণ জলমধ্যে ছিলেন তজ্জন্য শীতার্ত্ত হইয়া এই-স্থানে রৌদ্র উপভোগ করিতে আসেন এবং দ্বাদশ আদিত্য নিজ নিজ তেজ দ্বারা তাঁহাকে সেবা করেন। ইহার অপর নাম পুষ্কন্দন তীর্থ।

সিঙ্গার বট—এইস্থানে নানাবিধ ফলফুলে শোভিত কুঞ্জমধ্যে একটি বটবৃক্ষ ছিল—এই গাছের তলায় বসিয়া কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী রাই নিজ হস্তে প্রেমাস্পদের তৃপ্তির নিমিত্ত সিঙ্গার অর্থাৎ বেশ করিতেন। মুরলীমোহনের অমৃতস্রাবী প্রাণগলান বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য কৃষ্ণ-গতপ্রাণা গোপবালারা আত্মহারা হইয়া গোপনে ছুটিয়া আসিতেন এবং শিথিল কবরী বন্ধন করিয়া নানা ফুলে ও বিচিত্র বেশে সজ্জিতা হইয়া এই স্থানেই কালাচাঁদের অপেক্ষা করিতেন।

হায়! এখন সেই অতীতের কোনই চিহ্ন নাই—আছে শুধু মুগ্ধস্মৃতি! সিঙ্গারবট হইতে পুনরায় কেশীঘাটে আসিলেই পরিক্রমা পূর্ণ হইল।

পরিক্রমা পূর্ণ করিয়া আমরা জয়পুর রাজার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম ও সেই রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস সকালে অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

হরিদেব।

(শ্রীরমণীকান্ত বসু

পাটবাউসীর সন্নিকটে নারায়ণপুর জনপদে অজনাভ নামক জনৈক সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অজনাভের শাস্ত্রে যেরূপে অসাধারণ অধিকার ছিল, সর্ব্বমূলাধার জগদীশ্বরেও সেইরূপে পরানুরক্তি ছিল। তাঁহার ভার্য্যার নাম পারিজাতী। ব্রাহ্মণ-দম্পতী বহুকাল পুত্র-মুখ-দর্শন সুখে বঞ্চিত ছিলেন। কথিত আছে, একদা অজনাভ স্বপ্নে দর্শন করিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতবসন মুরারি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভক্ত অজনাভ, শীঘ্রই তুমি মহাগুণসম্পন্ন এক পুত্র লাভ করিবে"। অজনাভের হৃদয় আশায় নৃত্য করিতে লাগিল। যথাসময়ে তাঁহার আশাতরুতে ফল ফলিল। পারিজাতী অন্তঃস্বত্ত্বা হইলেন। ১৪১৫ শকের ভাদ্র কৃষ্ণাপঞ্চমীতে পারিজাতী দেবী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইনিই শীর্ষদেশোল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক হরিদেব।

হরিদেব বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগান্তর তিনি একান্ত মনে শ্রীহরির ধ্যানে নিবিষ্ট হন। তিনি যতই হরিনাম সুধা পান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তৎপানাগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন।

রাজোপদ্রববশতঃ হরিদেব পূর্ব্বাবাসস্থানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া হাজো গমন করেন ও তৎপর মালীপারায় উপস্থিত হন। এই স্থানে খাগরামালী নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি হরিদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া পরম ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেবা করেন। হরিদেব সুপ্রসন্ন হইয়া খাগরামালীকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করেন। অতঃপর জগন্নাথ দর্শনার্থ তিনি শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের দ্বারে তাঁহার সহিত শ্রীশঙ্করের সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া হরিদেব প্রথমতঃ বরলু চুঙ্ (পাটবাউসী) ও তৎপর দন্তপুরে গমন করেন। তিনি অতিশয় অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। অতিথিসেবা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সমূহের অন্যতম রূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে যে স্থলে বাস করিতেছিলেন, তথায় অতিথি সেবার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। উক্ত কারণে তিনি অবিলম্বে তৎস্থান ত্যাগ করিলেন—

অতিথি সেবাত জানা সব ধর্ম্ম পাই।
আকে জানি ঐত থাকিবাক নুজুয়াই॥

হরিদেবের বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তিলোত্তমা নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণ তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তিলোত্তমাদেবীর গর্ভে ভুবনেশ্বরী ও বনমালা নামে দুইটী কন্যা এবং দামোদর নামক একটী পুত্রের জন্ম হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র দমোদরের অকালে অপমৃত্যু হয়।

হরিদেব বহরী গ্রামের সন্নিকটে নৈসর্গিক শোভা সমাযুক্ত এক স্থলে প্রথম সত্র স্থাপন করেন। এই সত্র "মানেরী সত্র" নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, সভক্ত শঙ্করদেব ও দামোদর দেব একদা হরিদেবের বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক কোন কার্য্য দ্বারা তাঁহার মান বর্দ্ধন করেন। উক্ত মহাপুরুষগণ হরিদেবের এইরূপে মান বর্দ্ধন করায় ঐ সত্রের নাম "মানেরী সত্র" হয়। অতঃপর হরিদেব আরও নানাস্থলে সত্র স্থাপন করিয়া দেশ মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই "মানেরী সত্র" হইতে পাটবাউসীতে ধার্ম্মিক প্রবর শঙ্করের নিকট গমন করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণ এইরূপে পবিত্র ধর্ম্মালোচনা দ্বারা স্বর্গীয় সুখে কালাপনয়ন করিতেন।

একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ হরিদেবের পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিষ পান করিতে অনুরোধ করে। ঐ ব্রাহ্মণগণ আরও কতিপয় সাধুপুরুষকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা উহাতে সম্মত হন নাই। হরিদেবও প্রথমতঃ বিষপান করিতে অসম্মত

হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে অবশেষে ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে বিষপান করিয়া ফেলিলেন। ফলে তিনি কিয়ৎকাল বিলুপ্তসংজ্ঞ ছিলেন। যাহা হউক পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিস্ময় উৎপাদন করেন।

হরিদেবের ধর্ম্মমত নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতে সংক্ষিপ্ত রূপে অবজ্ঞাত হওয়া যায়।—

হরির একান্ত ভক্ত আছে নিরন্তর।
হরি হেন মানি তাঙ্ক করিয়া আদর॥
স্নান করি মাধবব স্তোত্রক বুলিবা।
পঞ্চ উপচারে হরি পূজাক করিবা॥
তাত পরে মাধবক করি স্তুতি নতি।
শিরে নমস্কার করি করিবা ভকতি॥
নির্ম্মাল্য তুলসী লই প্রসাদ ভুঞ্জিবা।
আনন্দ করিয়া হরি কীর্ত্তন করিবা॥
শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্ম্ম করিবা সদায়।
ভাগবত ধর্ম্মব এহি সে অভিপ্রায়॥
বেদব বিহিত কর্ম্ম সদায় করিবা।
কদাচিতো মহন্তক নিন্দা ন করিবা॥
প্রাণী হিংসা ন করিবা কৈলো সারে সার।
প্রাণী হিংসাও পরে পাপ নাহি আর॥

সৎকথা।

যতদিন না গুরুর উপর ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস হয়, ততদিন যার তার কাছে উপদেশ নিতে যেতে নেই। তাতে গুরুর উপর সংশয় আস্‌বার সম্ভাবনা, একবার গুরুতে সংশয় এলে তা দূর করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততদিন ইষ্ট ও গুরু এক বোধ হবেই না, হাজার বিচার কর আর বুদ্ধি খাটাও সংশয় আসবেই আসবে। কিন্তু একবার যদি কখনও আত্মসাক্ষাৎকার হয় তখন সমস্ত সংশয় নাশ হয়ে যায় এবং গুরু ও ইষ্ট এক বলে বোধ হয়।

*　　*　　*　　*

কিছুদিন জপধ্যান করে, ভগবান্ লাভ বা আত্মোন্নতি হল না বলে জপধ্যান ছেড়ে দিতে নাই। ছেড়ে দিলেই তুমি গোঁড়া নাস্তিক হয়ে দাঁড়াবে। মনের অবস্থা যখন ঐরূপ হয় তখন বড় বড় মহাজনদের কর্ম্ম দেখতে হয়, মনকে বুঝাতে হয় তাঁরা যখন ঐ উপায়ে ভগবান্ লাভ করেছিলেন তখন আমিই বা লাভ করব না কেন? তাঁদের জীবন আদর্শ করে আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যেতে হয়। অধ্যবসায়ে কি না হয়।

*　　*　　*　　*

জপধ্যান করতে করতে আলস্য, জড়তা, তন্দ্রা এসে থাকে—ওটা শরীরেরই ধর্ম্ম। এই সব জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে—না হয় একটু আধটু পায়চারি করলে—আলস্য চলে গেলে তখন আবার বসলে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সব আপদ্ চলে যায়।

*　　*　　*　　*

মুখে অনেকেই বলে থাকে যে তারা ইচ্ছা করলেই তাদের কুসংস্কারগুলো নাশ করে ফেলতে পারে, কিন্তু সংস্কার নাশ করনেওয়ালা ত একটা দেখি না! যার সংস্কার নাশ হয়েছে সেই অন্যের সংস্কার নাশ করতে পারে। এই জন্যই ঐরূপ সৎসঙ্গের দরকার হয়। কেবল তাঁদের কাছেই গেলে তাঁদের সদ্‌গুণে কুসংস্কার-সমূহ আস্তে আস্তে চলে যায় এবং সুসংস্কার প্রবল হয়ে উঠে।

*　　*　　*　　*

তবে শুধু বৈদ্যের বাড়ী গেলে কি হবে; ঔষধ এনে খেতে হবে, তবে না রোগ সারবে। কেবল সাধুর কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি

হবে, তাঁদের কাছে থেকে উপদেশ পেয়ে তদনুরূপ কর্ম্ম করতে হয়, তবে ত হয়।

* * * *

ভগবান্ জীবের কর্ম্ম দেখেন, জন্ম দেখেন না। বামুনের ঘরে জন্মে যদি সৎকর্ম্ম না করে তাতে কি হবে? নীচ ঘরে জন্মে যে সৎকর্ম্ম করে, ভগবানকে ভক্তি বিশ্বাস করে তার জন্ম সার্থক।

* * * *

পরের অনিষ্ট ও হিংসা করে জীব আনন্দ পায় তাই ত অনিষ্ট ও হিংসা করে। যে পরের হিংসা বা অনিষ্ট না করে আনন্দ পায় তার আনন্দই ঠিক আনন্দ। ঐরূপ হতে গেলে ভগবানের বিশেষ দয়া থাকা চাই।

* * * *

পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে ছিলেন তখন একদিন দুর্ব্বাসা মুনি দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করলেন কখন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দুর্য্যোধন কপটভাবে দুর্ব্বাসা মুনিকে বললেন, সন্ধ্যার পর দেখা করতে যাবেন। কারণ, দুর্য্যোধন জানত যে দুর্ব্বাসা মুনি অতি কোপনস্বভাব, পাণ্ডবেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করছে; সন্ধ্যার সময় আহারাদি শেষ হয়ে যাবে তখন আর তারা মুনিকে অহারাদি দিয়ে অতিথি সৎকারে সমর্থ হবে না। কিন্তু দুর্ব্বাসামুনি অত না বুঝে মনে করলেন যে, পাণ্ডবেরা হয়ত দিনের বেলায় শিকারে যাবে সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র থাকবে তাই দুর্য্যোধন তাঁকে সন্ধ্যার সময় যেতে বললেন। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার সময় দেখা করতে গেলেন। দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিবামাত্র যুধিষ্ঠির ত কাঁপতে লাগলেন—আজ বুঝি পাণ্ডবকুল ধ্বংশ হল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দেখে দুর্ব্বাসা মুনি নর্ম্মদাতীরে সন্ধ্যা করতে গেলেন এবং বলে গেলেন আজ আমি এখানে আহার করব। যুধিষ্ঠির তখন ত তাঁকে 'আমার মহাভাগ্য' বলে আপ্যায়িত করিলেন! সেদিন আবার দ্বাদশী; মুনি একাদশীর দিন থেকে উপবাসী

আছেন। অথচ গৃহে কিছু আহার্য্য নাই! যুধিষ্ঠির এইরূপ অবস্থা স্মরণ করে সখা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন. এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডাকে স্থির থাকতে না পেরে দ্রৌপদীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। দ্রৌপদী কিন্তু দুর্ব্বাসার ব্যাপার কিছুই জানেন না—তিনি সখাকে দেখে রঙ্গরস আরম্ভ করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বল্লেন আমার রঙ্গরস ভাল লাগ্‌ছে না—আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে ঘরে যদি কিছু থাকে ত দাও। দ্রৌপদী বল্লেন, সখা ঘরে যে কিছু নেই। তা যাই হোক যা একটু ছিল তাই দিয়ে জল খেয়ে ঢেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে চলে গেলেন।

এদিকে দুর্বাসামুনির দেরী হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁর খবর আনতে পাঠালেন। ভীম গিয়ে দেখে যে দুর্বাসা মুনি ঘুমুচ্ছেন। ভীমকে তিনি বলে দিলেন আজ শরীরটা বড় ক্লান্ত, আজ আর কিছু খাব না কাল উপবাসের পারণ করব। এই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভাব্‌তে লাগ্‌লেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের খেলা।

এইরূপ যাঁরাই ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁদের আর কোনও বিপদ্ আপদ্ উপস্থিত হয় না। আরও বোঝা যায় যে, ভগবান যার উপর সন্তুষ্ট সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

বিদ্যাদানের শুভযোগোদয়।

রমণীগণের জীবন ভারতে বর্ত্তমানকালে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত—পাশ্চাত্য মহিলাগণ সমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা জ্ঞান করিতেছেন ভারতের কন্যাগণকে সেই সকলের কতদূর প্রদান কর্ত্তব্য,—প্রভৃতি সমস্যা সকলের মীমাংসাস্থলে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন—

"স্ত্রীজাতির জীবন ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা

রমণীগণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়াই উচিত কারণ, তাঁহাদিগের ন্যায্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেক স্থলে নিঃস্বার্থ পুরুষগণেরও সামর্থ্যে কুলায় না। অতএব বৈদিকযুগে রমণীদিগকে পুরুষের ন্যায় যেরূপে সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত এখনও ঐরূপ করিয়া অন্য সকল বিষয়ে আমাদিগের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। উহাতে সুশিক্ষিতা স্বার্থপরিশূন্যা মহিলামণ্ডলী,—সীতা সাবিত্রী-প্রমুখ ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নারীজীবন নিয়মিত করিবার বর্ত্তমান যুগোপযোগী নিয়মাবলী নিরূপণপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন ”

শিক্ষা কাহাকে বলে —এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন,—

"অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম,—প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ঐ কথা অন্য প্রকারে এই ভাবে বলা যাইতে পারে—মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখন জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল তাহার অন্তরে কোন প্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্ব্বজ্ঞ এবং জগৎ-সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তুলে। অতএব ঐ আবরণসমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায় সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করিবার যোগ্য।"

স্বামিজীর শিক্ষাসম্বন্ধী পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া বেলুড়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীস্থ বসুপাড়া লেনে, ১৭ নং ভাড়াটিয়া বাটীতে, বালিকা ও অন্তঃপুরচারিকাগণের

সেবাকল্পে শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বিগত পঞ্চদশবর্ষকাল উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের কল্যাণসাধনে আজীবন ব্রতধারিণী, গুরুগতপ্রাণা পরমবিদুষী সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার ক্রিষ্টিনা নাম্নী পাশ্চাত্য ব্রহ্মচারিণীদ্বয় সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া ঐ মন্দিরে আরাধ্য দেবতার উদ্বোধন, আবাহন ও প্রাণদান পুরঃসর অন্তর্ব্বিহিত পূজায় সতত নিযুক্ত থাকিয়া ঐ দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন। আবার বিদ্যা-রূপিনী দেবীর আসন ও প্রসন্নতা এক্ষণে ঐ স্থানে বহুজনহিতায় চির-কালের নিমিত্ত অচল অটল রাখিবার কামনায় ভারতের পুত্রকন্যাগণের প্রকৃত ভগ্নীস্থানিয়া, পূতস্বভাবা নিবেদিতা, সহচরী সিষ্টার ক্রিষ্টিনার হস্তে কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক নিজ জীবন ঐ যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতিস্বরূপে প্রদান করিয়াছেন।

ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যাপ্রভাবে শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিচয় বিগত পঞ্চদশবর্ষের কার্য্য-সাফল্যে পাওয়া যাইতেছে। আকাশবৃত্তি অবলম্বনে নীরবে এতকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেও সাতশতের অধিকসংখ্যক বালিকাজীবন উহার সহায়ে বিদ্যার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। আন্দাজ তিনশত অন্তঃপুরচারিণী রমণী এই মন্দিরে সমাগতা হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভে ধন্যা হইয়াছেন। এবং দুইশত দরিদ্রা কুলকামিনী শিল্পাদি কার্য্য-সহায়ে জীবিকা অর্জ্জনের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনাদিগের ও সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থা হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কতক-গুলি মহিলা এই বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপনান্তে অন্যত্র শিক্ষয়িত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন; কতকগুলি এই শিক্ষামন্দিরে ঐ পদ গ্রহণপূর্ব্বক পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং একজন কলিকাতার লেডী ডাফ্রীন হাঁসপাতালে তিন চারি বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া পীড়িতের সেবা ও ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হইয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষিতা করিতে এবং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে যত্নবতী হইয়াছেন। অপর কেহ কেহ

এখানে শিক্ষালাভের পরে এইরূপ শিক্ষামন্দির অন্যত্র স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বালিগ্রামে এই বিদ্যালয়ের শাখারূপে পরিগণিত যে বিদ্যালয় গত সাত বৎসর আন্দাজ কাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঐরূপে ভারতের জাতীয় রমণীজীবনাদর্শ সর্ব্বতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই মন্দিরের পরিচালকগণ বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান ও তৎসম্মত শিক্ষাপ্রণালী উহার সহিত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করিয়া নবভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন অনুরাগ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ত্যাগ, তপস্যা, সংযম এবং পরহিতে জীবনোৎসর্গকরারূপ ব্রত স্বয়ং অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহারা তাহাদিগকে বৈদিকযুগের ব্রহ্মচারিণীদিগের ন্যায় উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন অন্যপক্ষে সেইরূপ সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম অটুট রাখিয়া যাহাতে তাহারা আবশ্যক হইলে আপনার ভার আপন স্কন্ধে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তদ্রূপ কলা ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন।

যে বিদ্যামন্দির ঐরূপে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের জীবন অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করিতে এতকাল ধরিয়া সচেষ্ট রহিয়াছে, জটিল জীবিকা সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যাহা অনেকগুলি দরিদ্রা কুলকামিনীপ্রাণে আশার সঞ্চার উপস্থিত করিয়াছে এবং আপনার ও অপরের যথার্থ উন্নতিসাধন ব্রতী করিয়া ঐ পথের সকল বাধা-বিঘ্নকে কঠোর ধৈর্য্য ও সংযম সহায়ে জয় করিতে যাহা ছাত্রীগণকে সমর্থা করিয়াছে—তাহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে আমরা অদ্য সকল নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। হে পাঠক, ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রতীকস্বরূপা মাতা, ভগিনী, জায়া ও দুহিতা প্রভৃতি আত্মীয়া রমণীগণের নিকটে যে স্নেহ, আদর, সেবা ও ভালবাসা আজীবন লাভ করিয়াছ তাহা স্মরণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ

হৃদয়ে তাঁহাদিগের জাতির উন্নতিসাধনে অগ্রসর হও! হে পাঠিকা, শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান যদি তোমাকে ধন-জন-সম্পদে ভূষিতা করিয়া থাকে তবে দেশের, দশের এবং বিশেষতঃ নিজ জাতির কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া এই কার্য্যে সহায়তা কর। উপযুক্ত স্থানে এবং ভবনে এই শিক্ষামন্দির চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। হে ভ্রাতা ও ভগিনিগণ, তোমাদের বদান্যতার উপরে নির্ভর করিয়াই আমরা এই বিদ্যালয়ের জন্য বাগবাজার পল্লীর নিবেদিতা লেনের অন্তর্গত আঠার কাঠা আন্দাজ ভূমি উনত্রিশ সহস্র মুদ্রায় (২৯০০০৲ টাকা) ক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ঐ জমি হস্তগত হইলে কলিকাতার 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় এই শিক্ষা মন্দিরের জন্য যে ৮০০০৲ টাকা আমাদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাহার সহায়ে বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিব। দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া যাহা দান করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক দান এবং অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদানের বিশেষ মহিমা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐরূপ সাত্ত্বিকদানের শুভাবসর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমরা আজ তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। যাহার যথাশক্তি প্রদানপূর্ব্বক অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ে ধন্য হও, কৃতকৃতার্থ হও। জানিও এই শুভানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তোমরা যাহা প্রদান করিবে তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে সামাজিক কল্যাণরূপে তোমরা অচিরে ফিরাইয়া পাইবে। পরমকারুণিক শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা তিনি দাতা এবং গৃহীতা—আমাদিগের উভয়কে, এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন।* ইতি

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

---

*বিবেকানন্দ-পুরস্ত্রীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে যাঁহার যাহা দেয় তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে—

(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুড়,হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

কটক রামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায়ের অষ্টম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী (১৯১৬-১৭) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেবকসম্প্রদায় একটী ভাড়াটিয়া-বাটীতে 'রামকৃষ্ণ কটেজ' নামক একটী ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বালকগণ স্বল্পব্যয়ে সহরে থাকিয়া বিদ্যা-লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই কটেজটী স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এইরূপ ১৫টী বালক 'কটেজে' স্থান পাইয়াছে। স্থানাভাব ও অর্থাভাববশতঃ কটেজের কর্তৃপক্ষগণ অনেক আবেদন-কারীকে স্থান দান করিতে পারেন নাই—স্থানাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা কটেজের নিজস্ব একটী বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একটী বিল্ডিং ফণ্ড খুলিয়াছেন—উহাতে যাঁহার যাহা অভিরুচি তাহা দান করিতে পারেন।

আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের সকলের পক্ষে সহরের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পড়া শুনা করা অসম্ভব। গরীব হইলেও শিক্ষালাভ করিয়া নিজের উন্নতি সাধন করিব, মানুষ হইব, দেশের ও দশের একজন হইব এরূপ ইচ্ছা কাহার না হয়? কিন্তু তাহাদের এই সৎ উদ্দেশ্যের বিষয় ভাবিবার বা সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোক অল্প। এইরূপ ক্ষেত্রে কটেজের কর্তৃপক্ষগণ যে ১৫টী ছেলেরই শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তাঁহাদের এই অনুষ্ঠান প্রসারতা লাভ করুক এবং এই সৎ-দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই গরীবের জন্য ছাত্রাবাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই আমাদের ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা।

বোষ্টন (আমেরিকা যুক্তপ্রদেশ) বেদান্ত-প্রচার-কেন্দ্রের কার্য্য স্বামী পরমানন্দের তত্ত্বাবধানে অতি সুচারুরূপেই চলিতেছে, তিনি যে 'এমার্সন এবং বেদান্ত' ও 'প্লেটো এবং বৈদিক অধ্যাত্মবাদ'

সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন, তাহাতে যাহারা উপস্থিত হইতেন তাহাদের মধ্যে যাঁহারা উক্ত কেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন না, তাহাদেরই সংখ্যা অধিক ছিল। তিনি বর্ত্তমানে লস এন্‌জেলিসে গমন করিয়াছেন ও তথাকার উপাসনার ও ক্লাসগুলির ভার পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। বোষ্টন কেন্দ্রের রবিবাসরীয় উপাসনাদ্বয় এবং মঙ্গলবারের সন্ধ্যা ক্লাসটী সিষ্টার দেবমাতার তত্ত্বাবধানেই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সেপ্টেম্বর মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত আগষ্ট মাসের ১২ জন ব্যতীত, আলোচ্য মাসে আরও ৩৯ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ২ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, ১ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছে ও ২১ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৫৭৯ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৯০ জন নূতন এবং ১৯৮৬ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

ঐ মাসে ৪ জন রোগকে তাহাদের নিজ বাটীতে ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা সাহার্য্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৬৯৷৷০ এককালীন দান ১৯৷৷০ মোট ৮৯৲। ব্যয় হিসাবে, সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ১৪৮।৶০ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে খরচ ১০৮৷৷১০।

অগ্রহায়ণ, ১৯শ বর্ষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(১)

(স্বামী সারদানন্দ)

ঠাকুরের জন্য যে বাটিখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটিতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর রক দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্ব্বদিকে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—এবং বামে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকখানা' ঘর নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাণ্ডা প্রশস্ততর ছিল—এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর—একখানিতে ভক্তদিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পপরিসর বারাণ্ডা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্ব্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার

দরজার পার্শ্বে চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাদ্র মাসের শেষার্দ্ধের কোন সময়ে, ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ঠাকুর, বলরামের বাটি হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার দুই এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুরের বাটিতে আসিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ পূর্ব্ব-পরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আনয়ন করিল। মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সামান্যভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, ঐ জন্য কাহাকে দেখিতে আসিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্তু ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু যত্নে পরীক্ষা ও রোগনির্ণয়পূর্ব্বক ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কালিবাটি সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্ম্মালাপে স্বল্পকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার নিকটে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ আছে, ডাক্তার ঐদিন ভক্তগণকে প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন এবং যাইবার কালে তাঁহারা তাঁহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া যখন তিনি কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনয়নপূর্ব্বক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে তখন তাহাদিগের গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না—

বলিলেন, 'আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্য্যে সহায়তা করিব।'

ঐরূপে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তা লাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত করিবার এবং দিবসের ন্যায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের আবশ্যক মত সেবা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কেবল মাত্র ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ঐ দুই অভাবের একটিও যথাযথ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া তাহারা তখন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্ব্বক প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক ভক্তগণের সহায়তায় দ্বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ স্থির করিল। ঐ অভাবদ্বয়ের ঐরূপে নিরাকরণের পথে কিন্তু বিষম অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্দরমহল না থাকায় শ্রীশ্রীমা এখানে কিরূপে একাকী আসিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইল, এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র বালক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া নিত্য রাত্র-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষম অসন্তোষের উদয় হইবে, একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়াও ভক্তগণের অনেকে তাঁহার আগমন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন। দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের উত্তরের নহবৎখানায় এতকাল অবস্থানপূর্ব্বক ঠাকুরের নিত্য সেবায় নিযুক্তা থাকিলেও দুই চারি জন বালক-ভক্ত—যাহাদিগের সহিত ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে পরিচিতা করাইয়া দিয়াছিলেন—তাহারা ভিন্ন অপর কেহ কখন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই। ঐ স্বল্পপরিসর স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্য সকল দুই বেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেও ঐ স্থানে কেহ যে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা বাজিবার স্বল্পকাল পরে অন্য কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে প্রতিদিন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক

শৌচ-স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি সেই যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন সমস্ত দিবস আর বহির্গত হইতেন না—নীরবে, নিঃশব্দে অদ্ভুত ত্রস্ততার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা, জপ ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি একদিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন—কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপরে শয়ন করিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়ে! তদবধি সঙ্গে আলোক না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না।

এতকাল ঐ স্থানে থাকিয়াও যিনি ঐরূপে কখন কাহারও দৃষ্টি-মুখে পতিতা হয়েন নাই, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ ও লজ্জা সহসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি কিরূপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে আসিয়া সর্ব্বক্ষণ বাস করিবেন ইহা ভক্তগণের কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অথচ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে বাধ্য হইল। ঠাকুর তাহাতে শ্রীশ্রীমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন 'সে কি এখানে আসিয়া থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সকল কথা জানিয়া শুনিয়া সে আসিতে চাহে ত আসুক্।' দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিত হইল।

'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন'—ঠাকুর বলিতেন ঐরূপে দেশ-কাল-পাত্র ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক সংসারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে পারিলে শান্তি লাভে অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সর্ব্বথা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি সংস্কার ও অভ্যাসের আবরণসমূহ হইতে আপনাকে নিষ্ক্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথাগথ

আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন তাহা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের বিবরণে এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে—

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জয়রামবাটি ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে আসিতে হইত। ঐরূপে আসিতে হইলে জাহানাবাদ (আরামবাগ) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলো ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া ৺তারকেশ্বরে, এবং তথা হইতে বৈদ্যবাটিতে আসিয়া গঙ্গা পার হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন ডাকাইতগণের ঘাটি ছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, প্রদোষে, অনেক পথিকের এখানে তাহাদিগের হস্তে প্রাণ হারাইবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক ক্ষুদ্র গ্রামদ্বয়ের এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে প্রান্তরের মধ্যভাগে, করালবদনা, সুভীষণা এক ৺কালীমূর্ত্তির এখনও দর্শন মিলিয়া থাকে। জনসাধারণের নিকটে ইনি তেঁলোভেলোর ডাকাতে কালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইঁহাকে পূজা করিয়া ডাকাইতেরা নরহত্যারূপ নৃশংস কার্য্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথিকেরা ঐসময়ে দলবদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তরদ্বয় অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীপুরুষের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলো এবং কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্তি অনুভব করিলেও শ্রীশ্রীমা তজ্জন্য ঐ বিষয় কাহাকেও না বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুইক্রোশ পথ যাইতে না যাইতে দেখা গেল, তিনি সঙ্গীদিগের সহিত সমভাবে

চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন। তখন তাঁহার নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং তিনি নিকটে আসিলে তাঁহাকে দ্রুত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। অনন্তর প্রান্তর মধ্যে আসিয়া তাহারা দেখিল তিনি আবার সকলের বহু পশ্চাতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। আবার তাহারা তাঁহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং তিনি নিকটে আসিলে বলিল, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা একেবারে ৺তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগের সহিত তথায় মিলিতা হইতেছি।' বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাঁহার ঐকথার উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইল।

শ্রীশ্রীমা তখন যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ যষ্টি স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পশ্চাতে দূরে তাহার সঙ্গীর ন্যায় এক ব্যক্তিও আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা বৃথা বুঝিয়া শ্রীশ্রীমা তখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের আগমন সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ পুরুষ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করিল, 'কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?' শ্রীশ্রীমা তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক একেবারে

তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভুলিয়াছি, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তাহাদিগের নিকটে পৌঁছাইয়া দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালিবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" ঐ কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীমা দেখিলেন সে পুরুষ নহে রমণী, প্রথমাগত পুরুষের পত্নী। ঐ রমণীকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিয়া যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম, ভাগ্যে বাবা ও তুমি আসিয়া পড়িলে, নতুবা কি করিতাম বলিতে পারি না।"

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তাহার পত্নীর প্রাণ এককালে বিগলিত হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভুলিয়া তাহারা সত্য সত্যই আপনাদিগের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। পরে তাঁহার শারীরিক অবসন্নতার কথা আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না দিয়া সমীপবর্ত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া যাইয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল। রমণী, নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিল, এবং পুরুষ, দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিল। ঐরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যূষে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া দুই চারি দণ্ড বেলা হইলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল। অনন্তর রমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

আমার মেয়ে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার (৺তারক-নাথের) পূজাদি শীঘ্র সারিয়া বাজার হইতে মাছ, তরিতরকারি লইয়া আইস, আজ তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে।'

পুরুষ ঐসকল কর্ম্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, 'ইঁহারা আসিয়া আমাকে না রক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।' অনন্তর পূজা, রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ঐস্থানে বিশ্রামপূর্ব্বক সকলে বৈদ্যবাটি অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে বিদায় গ্রহণ কালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্ব্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণী পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাই-শুঁটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা, সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাইবে তখন এইগুলি দিয়া খাইও।' পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা

পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল একথা কিন্তু এখনও আমার মনে হয়।”

ডাক্তারের উপদেশমত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী আপনার থাকিবার সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া এখানে তিন মাস অবস্থানপূর্ব্বক তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্নানাদি করিবার একটিমাত্র স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ৩টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক তিনি কখন যে ঐসকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া যথা সময়ে ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুতপূর্ব্বক তিনি (অধুনা পরলোকগত) বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ অথবা স্বামী অদ্ভুতানন্দের দ্বারা ঐ সংবাদ নিম্নে প্রেরণ করিতেন—তখন সুবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাঁহাকে উহা আনয়নপূর্ব্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই উহা লইয়া আসিতাম। মধ্যাহ্নে তিনি ঐস্থানেই স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময় সকলে নিদ্রিত হইলে ঐস্থান হইতে নামিয়া দ্বিতলে তাঁহার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। ঠাকুরকে রোগ-মুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন ঐরূপে কাটাইয়া দিতেন এবং এরূপ নীরবে, নিঃশব্দে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন যে যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা যাওয়া করিত তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

পথ্যের বিষয় ঐরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের

সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ঐবিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপ করিতে আকৃষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাঁহার অসীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পূত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢ়সংকল্প করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন ঐকথা বুঝিতে না পারিল ততদিন পর্য্যন্ত শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা সেবা কার্য্যে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটিতে আহার করিতে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিল তখন তাঁহাদিগের প্রাণে প্রথমে সন্দেহ এবং পরে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য ন্যায্য অন্যায্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐসকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্যপথে কখনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাহুল্য। ঐরূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে চারি পাঁচ জন মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার পূর্ণানুষ্ঠান-কালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামিজীর মৃত্যুসম্বন্ধীয় শিক্ষা।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

আমাদের আচার্য্যদেব যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী উপায় এই ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই নীরবে শিষ্যের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিত। সে সকল জিনিসকে যে চক্ষে দেখিত, সেই দৃষ্টিটাই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, সে যেন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবে একেবারে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইত, অথবা সহসা দেখিত যে, তাহার কোন বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার সমস্ত অভ্যাসটাই চলিয়া গিয়াছে, এবং তৎস্থলে একটী নূতন মতের উদ্ভব হইয়াছে—অথচ ঐ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটী কথারও আদান প্রদান হয় নাই। লোকের মনে হইত, যেন শুধু তাঁহার নিকটে থাকা হেতুই কোন জিনিস তর্কযুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আপনা হইতে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। এইরূপেই রুচি ও মূল্য-ঘটিত নানা প্রশ্ন আর মনকে আন্দোলিত করিতে পারিত না। এইরূপেই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে ত্যাগের বাসনা জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। আর, তাঁহার নিকটে থাকিলে লোকের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধারণা সঞ্চারিত হইত, তৎ-সম্বন্ধে একথা যেমন খাটে এমন আর কিছুর সম্বন্ধেই নহে।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি দিন দিন এ বিষয়ে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নির্দ্দেশ করার বিপক্ষে হইয়াছিলেন। কেহ এই অনাদি অনন্ত সমস্যাটির মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা

করিলে তিনি উত্তর দিতেন, "আমার মনে হয় এইরূপ; আমি বলিতে পারি না।" তিনি সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, একটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকারের স্বার্থপরতা ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর স্বপ্ন দেখা; এবং তিনি দেহত্যাগের পরের অবস্থাসমূহের উপর ঝোঁক দিয়া লোকের বাসনাজনিত অজ্ঞানতার বৃদ্ধি করিতে ভয় পাইতেন। তাঁহার নিজের পক্ষে জীবনে ও মরণে ঈশ্বরই একমাত্র উপায় এবং নির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে সর্ব্বোচ্চ সমাধিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, বাকী যাহা কিছু সমস্তই ইন্দ্রিয়সেবা। তথাপি এই ঘটনা হইতেই স্পষ্টরূপভাবে বুঝা যায়, কিরূপে তাঁহার শিক্ষায় লোকের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত; এবং যে দুই তিন খানি পত্রে নিজ অনুভব ও সহানুভূতি, এই উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে এতৎ সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশে বাধ্য করিয়াছিল, এই ঘটনাই সেগুলিকে সমধিক মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, যখন আমি স্বামিজীকে প্রথম দেখি, তখন অনেক বৎসর ধরিয়া আমার এই ধারণা প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, শরীর ত্যাগের পরও যে আমাদের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন বাস্তব কারণ নাই। এরূপ ব্যাপার হয় অসম্ভব না হয় অচিন্তনীয়। যদি মন না থাকিলে আমাদের শরীরের অনুভূতি না হয় (কারণ মন দ্বারাই আমরা ঐ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি), তাহা হইলে ইহাও তেমনি সত্য যে, শরীর না থাকিলে আমরা মনের অস্তিত্বও আদৌ কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং যদি মন বাস্তবিক শরীরেরই পরিণামস্বরূপ নাও হয়—"বীণার তারে যেমন আওয়াজ হইয়া থাকে"—তাহা হইলেও আমাদিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর মন উভয়েই একই বস্তুর বিপরীত সীমা বা প্রান্ত (Poles) মাত্র। উভয়ে—'শরীর' ও মন, 'জড়পদার্থ' ও মন নহে—একই জিনিস,

এবং মৃত্যুর পরও যে ব্যক্তিত্ব থাকিবে, এ ধারণা জৈবসংস্কারপ্রসূত একটা ছায়া মাত্র। নীতিসম্মত আচরণ, এমন কি উহার চরম পরিণতি যে পূর্ণ আত্মত্যাগ তাহা পর্যন্ত, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সমাজের হিতকর ভাগগুলিকে গ্রহণ করা রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।*

ভারতীয় মনীষিবৃন্দ মনকেই জীবনের কেন্দ্রস্থানীয় কালক-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহারই উপর যত জোর দিয়া থাকেন—উহাই তাঁহাদের অভ্যাস। আমার নিজের সম্বন্ধে, পূর্বকথিত ধারণা-সকল তাঁহাদের এইরূপ চিন্তা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ একটা দেহ এখানে

* উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা কতকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে। একজন মনীষী বলিতেছেন 'আত্মা কি বীণার তারে উৎপন্ন আওয়াজের মত, অথবা নৌকার উপরিস্থ দাঁড়ীর মত? জড়পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আজকাল যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষেও "একটা পরিণামাবস্থা (Cycle) কল্পনা করা—উহাকে মন বলিতে পার—সহজ হইয়া পড়িতেছে যাহাতে জড়পদার্থ এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।" কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্যদেশবাসীদের জন্য ইহা বিশেষভাবে দেখাইতে হইবে, কিরূপে ব্যষ্টি শরীর মন, এই জড়পদার্থ ও মনো সমষ্টিকে আশ্রয় করে, যাহাতে উভয়েই একাকার হইয়া যায়। এখানে ইহা বলিবার অভিপ্রায় নহে যে, সকল ধর্ম্মে নীতিসম্মত আচরণ অবশেষে আত্মার অমরত্ববিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। এখানে শুধু অজ্ঞেয়বাদী ও হিন্দু মতের বৈপরীত্য প্রদর্শন করা হইতেছে। অজ্ঞেয়বাদী নীচে হইতে উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, হিন্দুগণ বলেন যে, আমাদের দেহবুদ্ধি বিচার করিয়া দেখিলে, আধ্যাত্মিক জীবনের একটা স্থূল বিকাশ ও আবরণ মাত্র। এই আধ্যাত্মিক জীবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আত্মরক্ষার জন্য নহে, আত্মবলিদানের জন্য। আধুনিকগণ দৃশ্য হইতে বিচার দ্বারা অদৃশ্যে পৌঁছাইতে চান, বিশেষ হইতে সামান্যে উপনীত হন। হিন্দুগণ সাধারণ বা সার্ব্বজনীন হইতে বিশেষের বিচার করেন, এবং বলেন যে, মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিতে হইলে উহাই প্রকৃষ্ট বিচারপন্থা, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা একমাত্র আত্মার জীবন সম্বন্ধেই জ্ঞাত আছি।—নিবেদিতা।

প্রাচ্য পণ্ডিতগণ একেবারে তাঁহাদের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করেন—ঐরূপ সংস্কারই প্রাচ্যদিগের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ বলে যে, মানুষ একটা দেহ, এবং তাহার একটী আত্মা আছে; কিন্তু প্রাচ্য ভাষা-সমূহ বলে যে, মানুষ আত্মা, এবং তাহার একটী দেহ আছে।"

এই নূতন ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ আমি লোকদের সহিত কথা কহিবার কালে প্রথমে নিজেকে এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, যেন আমি তাহাদের বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে ভিতর-কার মনটীর সহিতই কথা কহিতেছি। ইহাতে যে বিপুল পরিমাণে অধিক প্রত্যুত্তর পাইলাম, তাহাই আমাকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে আমি সহসা দেখিলাম যে, আমার মনকেই মুখ্য জ্ঞান করিবার অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে; তখন আর আমি শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিনাশ কল্পনা করিতে পারিলাম না। যত নূতন নূতন চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই ক্রমশঃ আমার ধারণা হইয়া গেল যে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বাস্তবিকই মনঃপ্রসূত; এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে (যেমন, দেহত্যাগ) চিন্তারাজ্যে কোন আকস্মিক মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু স্বামিজীর ঐ বিষয়ক চিন্তা অনেক অধিক দূর অবগাহিনী ছিল। তিনি সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিতেন, যাহাতে ভ্রমেও কদাপি দেহাত্মবুদ্ধি না আসিতে পারে। তিনি 'আমি' শব্দটী কখনও এমন ভাবে প্রয়োগ করিতেন না, যাহাতে লোকে ঐরূপ অর্থই করিতে পারে; তৎপরিবর্ত্তে তিনি ঈষৎ অঙ্গভঙ্গীসহকারে "এইটা" বা "এই সব" বলিয়া শরীরটীকে লক্ষ্য করিতেন। অবশ্য উহা পাশ্চাত্যবাসী-দিগের কর্ণে একটু অদ্ভুত শুনাইত। কিন্তু তিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের জীবনকে জীবন বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহিতেন না, কেন না উহাতে নানা আপত্তি উঠিতে পারে। জয় পরাজয়, ভালবাসা, ঘৃণা, উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা—এ সকল প্রভেদকেই

ব্রহ্মের এক একটী আংশিক প্রকাশ বলিয়া সকলে মিলিয়া কখনও সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে পারে না। যেমন স্বামিজী বলিতেন, আমাদের বর্ত্তমান জীবনের মত শত শত জীবন, যাহার যথাকালে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তদ্দ্বারা কখনও আমাদের অমৃতত্ব-পিপাসার নিবৃত্তি হইতে পারে না। তজ্জন্য মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ ব্যতীত অপর কিছুই চলিবে না, এবং এ কথা কখনই বলা যায় না যে, এই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবনেরই বহুশঃ পুনরাবৃত্তি বা তাহারই কিঞ্চিৎ বিকশিত অবস্থা মাত্র। এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইতে হইলে ঐ অমৃতত্ব ইহজীবনেই লাভ করা চাই, নতুবা অন্য কি উপায়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে যে, আমরা শরীরানুভূতির বাহিরে গিয়াছি। পাশ্চাত্য-বাদীরা বলিয়া থাকেন, 'আত্মা আসেন এবং যান'.—এইরূপে তাঁহারা দেহাত্মবুদ্ধি-প্রবণতারই পরিচয় দিয়া বসেন, যখন তাঁহারা এক উচ্চতর সত্তার আগম নির্গম লক্ষ্য করিতেছেন। কেণ্টপ্রদেশবাসী যে Druid প্রাচীনকালের পুরোহিতবিশেষ। সেণ্ট অগাষ্টিনকে অভি-নন্দন করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতাই এক শ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা বলেন জগৎ যেন একটী উষ্ণ, আলোকিত বৃহৎ কক্ষ, এবং আত্মা যেন একটী পক্ষী, বাহিরের শীত ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য তথায় আশ্রয় লইয়াছে। তথাপি এই ধারণাতেও ইহার বিপরীত ধারণাটীতে যতগুলি, ঠিক ততগুলি বিষয়ই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি বিচার দ্বারা দৃঢ়ভাবে এই ধারণায় উপনীত হন যে, আমরা আদৌ দেহসমষ্টি নহি কিন্তু তাহাদের সীমানার বাহিরে অবস্থিত চৈতন্যস্বরূপ, এবং তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি যিনি এইরূপ ভাবেন, তাঁহার নিকট ইহাও তেমনি সত্য যে, আমরা বাস্তবিক শুধু এইমাত্র জানি যে, "দেহই আসে এবং যায়।"

এইরূপে ক্রমাগত মানুষকে শরীর না বলিয়া আত্মা বলায়, যাঁহারা স্বামিজীর সঙ্গ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা আর মৃত্যুকে একটা অবশ্য-ম্ভাবী অন্তিম অবস্থা (যাহার পর আর কিছু নাই) বলিয়া মনে

করিতে পারেন না ; তাঁহারা দেখেন, উহা আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ শৃঙ্খলের একটা আংটা মাত্র। এইরূপে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিকেন্দ্র বদলাইয়া গেল। এই জীবন আলোকিত কক্ষ না হইয়া বরং আমাদের নিকট মোহ ও অজ্ঞানময় কারাগার, অথবা মাঝে মাঝে ক্ষণিক চেতনাবিশিষ্ট স্বপ্নসঞ্চরণ তুল্য হইয়া দাঁড়াইল। কি! বাক্যোচ্চারণ কি চিরকাল মানবীয় ভাষার গণ্ডীর মধ্যেই পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ থাকিবে? মাঝে মাঝে কি আমরা এই সকলের পারে অবস্থিত একটা কিছুর ঝাঁকি আভাস প্রাপ্ত হই না, এমন একটা জিনিস, যাহা বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদিগকে বলপূর্বক কার্য্য করায়, যাহা বাহ্য শিক্ষার সাহায্য না লইয়া জ্ঞানালোক প্রদান করে— যাহা অপরোক্ষ, গভীর, প্রাণে প্রাণে অনুভবস্বরূপ? জ্ঞান কি চিরকালই সসীম, এবং অস্পষ্ট, মামুলি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিসমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এবং চিরকাল আচরণরূপ কঠোর ও সঙ্কীর্ণ বর্ত্মেই আত্মপ্রকাশ করিবে? স্বামিজী একটী নিউইয়র্ক বক্তৃতায় যেন প্রাণের গভীর কাতরতা হইতেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বপ্নদ্রষ্টা যে মানুষ, সে কিনা সান্ত, পরিচ্ছিন্ন স্বপ্ন দেখিবে!"—ইহা অতি সত্য কথা।

এইপ্রকার ধারণাসমূহকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, নিজে সর্ব্বদা মৌনী হইয়া নগ্নবেশে গঙ্গার ধারে ধারে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করা, সমাধি অবস্থা লাভই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা এবং জীবনের সম্বন্ধনিচয়কে আত্মার স্বাধীনতার পক্ষে বন্ধন ও বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া নিজে জ্ঞান করা, এই সকল উপায়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভক্তগণের হস্তে, প্রকৃত সত্তা কি তাহা নিরূপণ করিবার যেন একটা মাপকাটী দিয়া গিয়াছিলেন। ফলে, শরীরের নাশ হইবামাত্র যে ঐ সত্তাতেও একটা গুরু পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, এ কথা তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের এই ধারণা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, জীবনের আনুষঙ্গিক সুখদুঃখাদি একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের বাহ্য অবয়ব মাত্র, এবং

আমরা ইহা স্পষ্ট বোধ করিতাম যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমরা, যেমন চলিতেছিলাম, তাহার পরেও অনেকটা সেইরূপই চলিতে থাকিব; শুধু এইটুকু তফাৎ হইবে যে, তখন আমরা যে সূক্ষ্ম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইব, তাহার ফলে আমাদের গতির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি হইবে। আর এ কথাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতাম যে, তিনি যেমন বলিয়াছিলেন,—ইহজীবনের কর্ম্মপ্রসূত 'অনন্ত' স্বর্গ বা নরক একটা কথার কথা মাত্র, কেন না সান্ত কারণ কোন উপায়েই অনন্ত ফল প্রসব করিতে পারে না।

তথাপি স্বামিজী এবিষয়ে লোকের মানিয়া লইবার জন্য কোন বাঁধা ধরা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিতেন তাঁহাদিগকে তিনি, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা যতদূর পারেন, নিজের দর্শনের বলে এবং দৃষ্ট সত্যটীকে ভাষায় প্রকাশ করিতে যে চেষ্টা করিতেন তাহারই শক্তি প্রভাবে, ততদূর লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি কোন অপরিবর্ত্তনীয় মতামতের ধার ধারিতেন না, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ পাকা কথা দেওয়ার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। যেমন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "আমি বলিতে পারি না"—ইহাই, যত দিন যাইতে লাগিল ততই 'মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয়' এই প্রশ্নের তাঁহার একমাত্র উত্তর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মতে, প্রত্যেককে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিজের বিশ্বাস গঠন করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার মুখের কোন কথা যেন তাহাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাধীনভাবে পরিণতি লাভের পথে বাধা প্রদান না করে।

তবে কয়েকটী জিনিস আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পর যে আমরা আমাদের পূর্ব্বগদিগের সহিত মিলিত হই এবং ইহজগতের নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া থাকি—লোকের এই সাধারণ বিশ্বাস তাঁহারও ছিল বলিয়া মনে হইত। অতি কোমলতাপূর্ণ অথচ খেয়ালী ভাষায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "যখন আমি বুড়ার সাম্‌নে দাঁড়াইব, তখন যেন আমাকে জবাবদিহি

করিতে না হয়।” আমি তাঁহাকে এই ধারণার বিরুদ্ধে কোনরূপ গুরুর আপত্তি করিতে শুনি নাই। তিনি ইহাকে সাদা সিধা ভাবে, জীবনের নানা সত্য ঘটনার অন্যতমরূপে গ্রহণ করিতেন।

যিনি একবার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছেন, তিনি তথায় পৌঁছিবার পথে নিশ্চয়ই অনেক মানসিক অবস্থার পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবেন, যাহা অশরীরী অবস্থারই অনুরূপ। ঐকালে তিনি নিশ্চয়ই এমন অনেক অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিবেন, যাহা হইতে আমরা সচরাচর বঞ্চিত হইয়া থাকি। স্বামিজী বিশ্বাস করিতেন যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মৃতব্যক্তিগণের আত্মার সহিত দেখাশুনা ও কথা-বার্ত্তা হইয়াছে। একজন তাঁহাকে ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে স্বীয় ভয় জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ইহা কাল্পনিক মাত্র। যে দিন তুমি সত্য সত্যই একটা ভূত দেখিবে, তখন আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না।” তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ গল্প করিয়া থাকেন যে, মান্দ্রাজে তাঁহার নিকট কতকগুলি আত্মঘাতীর প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের দলভুক্ত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, এবং তাঁহার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ বিচলিত করিয়াছিল। অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার মাতা কুশলে আছেন জ্ঞাত হইয়া, তিনি ঐ সকল প্রেতাত্মাকে মিথ্যাভাষণের জন্য তিরস্কার করেন। তাহারা উত্তর দিয়াছিল যে তাহারা এখন এত অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে রহিয়াছে যে, তাহারা সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহা তাহাদের খেয়ালেই আসিতেছে না। তাহারা তাঁহাকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনিও রাত্রিতে তাহাদের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। কিন্তু যখন তিনি শ্রাদ্ধকর্ম্মে যেখানে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে সেই অংশে আসিলেন তখন তিনি পিণ্ড দিবার মত কোন সামগ্রীই নিকটে নাই দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন! তৎপরে তাঁহার একখানি প্রাচীন শাস্ত্রের বচন মনে পড়িল যে, অন্য পিণ্ডের অভাবে বালুকার পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে। তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া বালুকা গ্রহণ করিয়া

সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মৃতব্যক্তিগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সাগরজলে ঐ পিণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল প্রেতাত্মাও শান্তিলাভ করিয়াছিল। তাহারা আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই।

(ক্রমশঃ)

কঃ পন্থা ?

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া স্তবকে স্তবকে একটীর পর আর একটী উঠিয়া দর্শকের ভয়বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে—পার্ব্বত্য নদী শিলা বক্ষে করিয়া নানা গম্ভীর মধুর রাগরাগিণীতে সমতলের উদ্দেশে ছুটিয়াছে—তন্মধ্যে প্রকৃতির ভীষণ-মধুর লীলারঙ্গের মধ্যে—দেবদারু প্রভৃতি নানা পার্ব্বত্য বৃক্ষশোভিত শান্তিপ্রদ আশ্রম। কর্ম্মক্লান্ত মানব এক একবার সংসারের দাবদাহে জ্বলিয়া সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া এইরূপ শান্তিময় স্থানের দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য নদীতীরে বসিয়া উহার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া প্রাণকে অনন্তে মিশাইয়া দিতে কত আনন্দ! এ আনন্দে বিভোর হইলে সংসার স্বপ্নতুল্য হইয়া যায়—যেন কোন্ দূর অতীত রাজ্যে উহা পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। মন গভীর হইতে গভীরতর সমাধির রাজ্যে ডুবিতে থাকে। বাসনা থাকে না, কামনা থাকে না, মন অনন্তের নেশায় ভরপুর হইয়া যায়।

এই নেশা যদি চিরস্থায়ী হইত, যদি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে বলিতাম, ইহার চেয়ে উচ্চাবস্থা আর নাই। কিন্তু নামিতে হয়—দেহবুদ্ধি আবার আসে, সেই সমাধিরাজ্য

স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হয় এবং যে জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহাকেই আবার কঠোর-সত্য বলিয়া বোধ হয়। শরীর আছে—শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, শরীরের স্বাস্থ্য ব্যাধি আছে, সেই সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয়। ক্রমে অল্প হইতে প্রবল বাসনা আসিয়া চতুর্দ্দিকে জাল বিস্তার করে—জালে বদ্ধ বিহঙ্গম তখন সেই শান্তির আবাস ছাড়িয়া আবার অশান্তির রাজ্যে ছোটে, আবার নিজেকে কর্ম্মজালে জড়িত করে, শেষে আবার অশান্তিতে ছটফট করিতে করিতে আবার শান্তির রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লয়।

ইহাই সাধারণতঃ সংসারী মানবের নিয়তি—ইহার পরিণাম কোথায়?

একটী প্রশ্ন মানবের স্বতঃই উদিত হয়,—শান্তিলাভ করিতে হইলে তবে কি কর্ম্মকোলাহলময় সংসার ত্যাগ করা ব্যতীত উপায় নাই?

সাধারণতঃ আমরা লোক মুখে শুনিতে পাই যে, সংসারে ধর্ম্ম হয় না। একথা সাধুসন্ন্যাসীর মুখে শুধু শুনিয়াছি, তাহা নহে, অনেক ঘোর সংসারীর মুখেও একথা শুনিয়াছি। কিন্তু সংসারত্যাগের অর্থ কি? বাহ্যকর্ম্ম ত্যাগ করা, স্ত্রীপুত্রাদির দায়িত্বভার, পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা ত্যাগ করা যদি সংসারত্যাগের অর্থ হয়, তবে বলিব, সংসারত্যাগী অপেক্ষা ঘোর অধার্ম্মিক কেহ নাই। সম্পূর্ণ হৃদয়-বিহীন পশুবৎ জড়পিণ্ডপ্রায় না হইলে কেহ এরূপে সংসারত্যাগ করিতে পারে না এবং ঐপ্রকার সংসারত্যাগের ফলে আত্মোন্নতির পরিবর্ত্তে ঘোর আত্মাবনতিই ঘটিয়া থাকে। তবে সংসারত্যাগ কাহাকে বলিব?

আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য,—এ সংসারত্যাগের কথা আসে কোথা হইতে? যাহা আছে, যাহা পাইয়াছি, তাহা ছাড়িতে যাইব কেন? যে ত্যাগী, সে ত মহা নির্ব্বোধের মত কার্য্য করে। আমার এতটুকু আছে, আরও লইব, আমার অধিকার আরও বাড়াইব—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর আমার অধিকার বিস্তার করিব। তবে ও

তৃপ্তি তবে ত শান্তি! তবে লোকে ত্যাগের কথা কহে কেন? কি ত্যাগ করিতে হইবে? ত্যাগ করিবার কি বিষয় আমার আছে?

জীবনের গতিটাকে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যদি অধিকারের অর্থ বহির্দ্দিকে আমার অধিকারের সীমা বিস্তার করিয়া যাওয়া হয়, তবে ভাবিয়া দেখ, উহার চরম পরিণতি কোথায়? বড় বড় দিগ্বিজয়ী যথা নেপোলিয়ন, আলেক্জাণ্ডার প্রভৃতির জীবনে আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। এরূপে অনন্তরাজ্য অধিকার করা যায় না। এ একটা বৃথা মত্ত চেষ্টা মাত্র। আসল চেষ্টা —ভিতরের দিকের রাজ্য অধিকার। যখন মানুষ এই চেষ্টায় প্রাণ-পণে প্রবৃত্ত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার বাহিরের চেষ্টা কমিয়া যায় দেখা যায়, তাহাতে লোকে ভ্রমক্রমে মনে করে, এ ত সমুদয় ত্যাগ করিবার পথে চলিয়াছে। কিন্তু সে যে প্রকৃতপক্ষে মহাকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছে? এইটী না বুঝার দরুণই নানারূপ গোলযোগ হয়।

অতএব বুঝা যাইতেছে, কর্ম্ম জিনিষটাকে আমাদিগের ত্যাগের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম করিতেই হইবে—তবে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, তাহার উপায় জানা আবশ্যক। এই বিষয়টী বুঝিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত ভগবদ্গীতা আমাদিগকে যতটা সাহায্য করে, আর কিছুই তত নহে। ঐ মহাগ্রন্থে উপদিষ্ট ভগবদুক্তিগুলি খুব মনোযোগসহকারে বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই কয়েকটী কথা পাইতে পারি।

১। কর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করা সাধারণতঃ উচিত নহে।

২। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা যে কোনরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ সকাম কর্ম্মও শ্রেয়ঃ।

৩। সকাম কর্ম্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

৪। সকাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম হিসাবে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু পার্থক্য ভাব লইয়া। নিষ্কাম অর্থে ধন ঐশ্বর্য্য মান

যশ প্রভৃতি বাহ্য কামনা হইতে মনকে ঘুরাইয়া আনিয়া মুক্তি কামনা বা ঈশ্বর কামনা করা। মুক্তিকামনা, ভক্তিকামনা, বা ঈশ্বরকামনা 'কামনা' নামে গণ্য নহে। এখানে বুঝা উচিত, অনেকে নিষ্কাম অর্থে সর্ব্বকামনাবিরহিত অবস্থা মনে করেন কিন্তু এক সিদ্ধাবস্থা বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অবতার-পুরুষগণের কার্য্য ব্যতীত সম্পূর্ণ কামনারহিত অবস্থায় কর্ম্ম করা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

৫। নিষ্কাম কর্ম্ম বা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন চিত্ত ধ্যানধারণাযোগাদির উপযুক্ত হয়। যখন জীবের নিষ্কামকর্ম্ম করার কতকটা অভ্যাস হইয়াছে, তখন সময়ে সময়ে ধ্যানধারণাদির অভ্যাসের জন্য বাহ্যকর্ম্মত্যাগের স্বভাবতঃই প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাকে কর্ম্মত্যাগই বলা যাইতে পারে না।

শেষোক্ত বিষয়টা একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই জানেন, ধ্যানধারণার চেষ্টারূপ কর্ম্ম অন্য কর্ম্ম হইতে কত কঠিন। হাত পায়ের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করা যায়, সে সকল ত উহার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু একবার চুপ করিয়া বসিয়া মনকে একস্থানে স্থির করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে মনের ছুটাছুটি কিরূপ অধিক এবং উহাকে একস্থানে বসাইতে কত বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে। মনের স্থৈর্য্যের অর্থ কি? মনের নিদ্রা বা অকর্ম্মণ্যতার অবস্থা হইতে উহার পার্থক্য কোন্‌খানে? সাধারণতঃ মানব-মনকে দুই অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়—একটী ক্রিয়াশীলতা, অপরটী জড়াবস্থা। ধ্যানাবস্থা কি প্রকার? যাহার ধ্যানাবস্থা কখনও হয় নাই, তাহাকে উহা বুঝাইতে গেলে উপায় কি? কোন অজ্ঞাত বিষয়কে বুঝাইতে গেলে জ্ঞাত বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাহা বুঝান সম্ভব নহে। এক্ষণে মনের ক্রিয়াশীলাবস্থা ও জড়াবস্থা এই দুইটী আমাদের জ্ঞাত। এই দুইটীর যে কোনটীর সহিত সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া ধ্যানাবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝান যাইতে পারে। সাধারণতঃ উহাকে জড়াবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বুঝান হইয়া

থাকে। কারণ, নিদ্রা বা মূর্চ্ছাবস্থার সহিত ধ্যানাবস্থার বাহ্যসাদৃশ্য কতকটা দেখা যায়। কিন্তু শুধু উক্ত সাদৃশ্য দেখিয়া উহাকে বুঝিতে হইলে উহার স্বরূপ কিছুই বুঝান হয় না উহার একটা পারিপার্শ্বিক অবস্থামাত্র জ্ঞাপন করা হয়। সেই জন্য উহাকে বুঝাইবার আর একটী প্রণালী আছে। সেই প্রণালী এই যে, উহাকে ক্রিয়াশীলতার ভিতর দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা। সাধারণতঃ, বাহ্যবিষয়োপলব্ধির সময় উহা যেরূপ ক্রিয়াশীল হয়, কল্পনা কর, উক্ত ধ্যানাবস্থা তদপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল অবস্থা। মোট কথ, জড়াবস্থা হইতে ক্রিয়াশীল অবস্থা শ্রেষ্ঠ এবং ক্রিয়াশীলতা হইতে ধ্যানাবস্থা উচ্চতর। কল্পনা কর চুপ করিয় বসিয়া আছ, মনের অস্থিরতা নাই, অথচ উহা জড়া-বস্থাপন্ন নহে, শান্ত ও প্রসন্ন। বাহ্য বিষয় অনুভব যতদুর সম্ভব কমিয়াছে, অথচ ভিতরের জ্ঞানজ্যোতিঃ যেন বিষয়জ্ঞানাবস্থার অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইযা উঠিয়াছে - ইহাকেই ধ্যানাবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস বলা যাইতে পারে। এই অবস্থা কঠোর সাধনের বস্তু - বহুদিনের অভ্যাসসাপেক্ষ।

এখন দোষ হয় এই যে, লোকে উক্ত ধ্যানাভ্যাসের কিছুমাত্র অধিকারী না হইয়াই প্রথমেই সহজবোধে কর্ম্মত্যাগের দিকে ছুটিয়া থাকে। মনে করে বাহ্যকর্ম্মত্যাগেই বুঝি আপনা আপনি শান্তি আসিবে, আপনা আপনি চিত্তপ্রসাদ আসিবে। সেই জন্য প্রশস্ত পন্থা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই 'কর্ম্মযোগ'।

এখন 'কর্ম্মযোগ' কথাটীও ভাল করিযা বুঝা আবশ্যক। নহিলে কর্ম্মাবস্থার সহিত উপরোক্ত ধ্যানাবস্থার সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। প্রথমতঃ, শব্দটীর দিকে লক্ষ্য কর—উপদেশ 'কর্ম্মযোগের' শুধু 'কর্ম্মের' নহে। কর্ম্ম সকলেই অল্প বিস্তর করিয়া থাকে —নানাবিধ ভাল, মন্দ ও ভালমন্দমিশ্রিত কর্ম্ম আমরা সদা সর্ব্বদা করিতেছি। কিন্তু আমরা কি সকলেই কর্ম্মযোগী? কর্ম্মযোগী হইতে হইলে কর্ম্ম ব্যতীত আরও কিছু চাই, আর সেটী বাহ্য নহে, মানসিক ব্যাপার। কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে ভাবনার আবশ্যক। কি ভাবনা?

সদা সর্ব্বদা কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা ভাবিতে হইবে। মনে কর, আমি অর্থোপার্জ্জনরূপ কর্ম্ম করিতেছি। এক্ষণে মনকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, অর্থোপার্জ্জন কেন? মন যদি উত্তর দেয়—ইন্দ্রিয়-সুখ প্রচুর পরিমাণে ভোগের জন্য, তখন মনকে শাস্ত্র ও গুরূপদেশ-সহায়ে বুঝাইতে হইবে—মন, এ অর্থোপার্জ্জন তোমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য নহে। নিজের ও পরিবারবর্গের দেহধারণ-মাত্রোপযোগী অর্থেই তোমার অধিকার, বক্রী উদ্বৃত্ত যাহা কিছু সবই তোমার দরিদ্র ভ্রাতার জন্য। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, মনের এরূপ নিষ্কাম অবস্থা একেবারে কিরূপে হইবে? একেবারে হইবে একথা তোমায় কে বলিল?

শাস্ত্রে বলে, সকল মানবই স্বাভাবিক কতকগুলি কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঐসকল কর্ম্ম কেবলই ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন অথচ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র সকাম ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। যে কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য উন্মত্ত, সে যথেচ্ছাচারী, সে শাস্ত্র মানে না, ঈশ্বর মানে না, আত্মা মানে না, দেবতা মানে না, পরলোক মানে না। মৃত্যুর পর যে আর কোন সত্তা থাকে, এ বিশ্বাস এ ধারণা তাহার নাই। সুতরাং সেইরূপ ব্যক্তি যদি কোনরূপ ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠান করে, সে লোকাচার বা সামাজিক অনুষ্ঠান ভাবিয়াই করে, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রাণ সেই সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নাই। কিন্তু যাহার পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে যথার্থভাবে বিশ্বাস করিতে পারে, এই এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বা এই এই দেবতার উপাসনা করিয়া আমি পরলোকে এই এই সুখ পাইব এখন বাস্তবিক এই সকল দেবতার অস্তিত্ব আছে কি না, বা সেই সেই কর্ম্মের দ্বারা ঠিক ঠিক সেই সেই ঐহিক বা পারলৌকিক কাম্য ফল লাভ হয় কি না, এ বিচার ছাড়িয়া যদি আমরা উক্ত কর্ম্মগুলির জীবনের উপর, চরিত্রের উপর প্রভাব কি, তাহা বিচার করি, তবে দেখিব, ঐরূপ কর্ম্ম সকাম নামে

অভিহিত হইলেও, উহা প্রবৃত্তিমার্গ নামে পরিচিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা নিষ্কামকর্ম্মে আরোহণের প্রথম সোপান। যজ্ঞের শাস্ত্রীয় লক্ষণ--দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ গীতা বলিতেছেন, এই যজ্ঞের শেষ অমৃত ভোগ করিতে হইবে। এইখানেই ত নিষ্কাম আসিয়া পড়িল। নিষ্কাম কর্ম্মের একটী সোপান পাইলেন? এখন তথা-কথিত এই সকাম কর্ম্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম্মে আরোহণেরও বহু সোপান আছে। আমি নিষ্কাম কর্ম্ম করিব সংকল্প করিলাম—মন ছুটিতেছে কামনার দিকে—কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে ?—ক্রমে। অভ্যাসের ফলে, মানসিক চেষ্টার ফলে, সাধনার ফলে। ক্রমে অভ্যাস পরিপক্ক হইলে এমন অবস্থা আসিবে যখন কর্ম্ম করিবার কারণ আর বাহ্য কাম্যবস্তুর আকর্ষণ থাকিবে না, ভগবদাকর্ষণ, মুমুক্ষুতাই তখন কর্ম্মের জনক হইবে। কেহ কেহ বলেন, যদি কোন বাহ্য কামনাই না থাকে, তবে ত কর্ম্মের জন্য তাদৃশ আগ্রহ থাকিবে না। কেন আগ্রহ থাকিবে না? যদি বিশ্বাস থাকে, এই কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিব, এই কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি পাইব তবে কেন আগ্রহ থাকিবে না? বরং আগ্রহ শতসহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে। বাস্তবিক বিভিন্ন কর্ম্মে বড় প্রভেদ নাই ভাবানুযায়ীই কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার। কথায় বলে, 'যেমন ভাব, তেমন লাভ'।

এখানে একটী সন্দেহ আসিতে পারে -যদি আজীবন কর্ম্মযোগেরই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য হয়, তবে কি সন্ন্যাস আশ্রমের কোন সার্থকতা নাই? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা ধ্যানাবস্থা বা সন্ন্যাস অবস্থা যে কর্ম্মযোগের পরিণতি ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং সে অবস্থা লাভ যে অতীব কঠিন ও তাহা যে একটা খুব উচ্চাবস্থা, তাহাও বুঝান হইয়াছে কিন্তু সন্ন্যাস অবস্থায় সম্পূর্ণ না পঁহুছিয়াও কি ঐ অবস্থাই বিশেষভাবে সাধনের জন্য সাধারণ গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত কোন আশ্রম নাই? অথবা যদি স্বীকার করা যায়, ঐ আশ্রম আছে, তাহা হইলেও কি ঐ আশ্রম কেবল সংসারে বহুকাল অবস্থিতির পর

বার্দ্ধক্যাবস্থায়ই অবলম্বন করা যাইতে পারে, অথবা অল্প বয়সেও ইহার অবলম্বন সম্ভব

উপনিষদ্ আলোচনা করিলে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহার মধ্যে বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনেরই প্রায় অধিকাংশ উল্লেখ—যাজ্ঞবল্ক্য দুই পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন — বোধ হয় অধিক বয়সে সন্ন্যাসাশ্রমের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তাহা অবলম্বন করেন গার্গীনাম্নী বিদুষী মহিলা ও অবিবাহিতা বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু আর কোথাও বড় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের দৃষ্টান্ত দেখি না। দৃষ্টান্ত অধিক না থাকিলেও সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের উপদেশও কোন কোন প্রাচীন উপনিষদে দেখা যায় বটে। বুদ্ধদেব অল্পবয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে অল্পবয়সেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করাইয়া ছিলেন এবং তদনুকরণে শঙ্করাচার্য্যও অন্যান্য আশ্রম অবলম্বন না করিয়াও সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্যও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অল্পবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে গিয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাবালোপনিষদের 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' ইত্যাদি বাক্য ব্যতীত প্রাচীন উপনিষদের বিশেষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসাশ্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মপ্রচার, পরোপকার প্রভৃতি কর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়।

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদী এবং তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে উপনিষদ্-গীতাদির দোহাই দিয়া উহাকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিবারও চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অবশ্য অনুপযুক্তাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের ফলে যে সর্ব্বদেশেই বহু অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বকথিত যুক্তিগুলির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের একথাও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে

যে, । মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি সন্ন্যাসাবস্থায়—কারণ, কর্ম্মযোগ হইতে অগ্রসর হইয়া যতই মানুষ ধ্যানযোগে আরোহণ করে, ততই তাহার বাহ্য কর্ম্ম কমিয়া আসে। ভগবান্ গীতায় এ তত্বটী একস্থানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন —

'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।'

যাঁহারা গীতার শাঙ্করভাষ্য উত্তমরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে, আপাততঃ কেবল কর্ম্মবাদ-সমর্থক গীতার ভিতর কিরূপে সন্ন্যাসের ভাবও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' 'অনিকেতঃ' প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ব্যাখ্যায় শঙ্কর উক্ত ভাবটী বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং ঐ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনাদুষ্ট প্রতীয়মান না হইয়া সহজ ব্যাখ্যা বলিয়াই বোধ হয়।

যাহাহউক, জীবনপরিচালন কিভাবে করা উচিত, এই প্রশ্নের বিচার করিয়া আমরা ক্রমশঃ যে সিদ্ধান্তে পঁহুছিতেছি, তাহাতে আমাদের প্রাচীনকালে প্রচলিত আশ্রম-ধর্ম্মকেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলের পক্ষে অনিবার্য্যরূপে অবলম্বনীয়। ঐ অবস্থায় ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংসারযাত্রোপযোগী লৌকিক বিদ্যা শিখান অবশ্যকর্ত্তব্য। তৎপরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে প্রবৃত্তি ও শিক্ষার পরিপক্বতা হিসাবে কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন, কেহ বা ধ্যানাভ্যাসই জীবনের উচ্চ লক্ষ্য জানিয়া বানপ্রস্থ সন্ন্যাসাশ্রমাদিতে প্রবিষ্ট হইবেন। কিন্তু যাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে যে, চরমে আমাদিগের পক্ষেও এই উভয় আশ্রম অবলম্বনীয়। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া এই আশ্রমচতুষ্টয়েরও পরিবর্ত্তন সাধন এবং ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কিন্তু আশ্রমচতুষ্টয়ের যে মূলভাব, সেটীর সর্ব্বথা অনুসরণ করিতেই হইবে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সাধন করিতে হইলে সমাজযন্ত্রের আমূল

পরিবর্ত্তন যত দিন না হইতেছে, ততদিন কিছুই হইবে না ; এবং উক্ত ব্যাপার সাধন করিতে মহাশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য পুরুষগণের বহুদিনব্যাপী প্রচারকর্য্য আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে কে কোন্ পথে জীবনের উন্নতি-সাধনপথে অগ্রসর হইবে, তন্নির্ণয়ের উপায় কি?

উপায় —স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বিচারের দ্বারা পথনির্ণয়ের চেষ্টা, অন্তর হইতে অন্তর্যামীর নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই অন্তরের ভিতর প্রেরণার দ্বারা বুঝাইয়া দেন, কোন্ পথ অবলম্বনীয়। শেষ উপায়—যদি তোমার কাহারও উপর এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, তাঁহার বাক্য তোমার রুচিবিরুদ্ধ হইলেও তুমি অবিচারিত-ভাবে মানিয়া লইতে পার, এরূপ ব্যক্তির উপর তোমার পথনির্ণয়ের ভারপ্রদান।

কারণ, সাধারণ ভাবে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, কাহারও কাহারও প্রথম অবস্থা হইতেই সাংসারিক সংস্রব হইতে পৃথক্ থাকিয়া মনকে সংযমের চেষ্টা করিতে হইবে আবার কাহাকেও বা সংসারের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের জন্য কোন এক পথ হইতে পারে না, কিন্তু যে পথ দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাক, শেষে জীবনের যে পূর্ণ পরিণতি হয়, তাহাকে ধ্যানাবস্থা, কর্ম্মত্যাগাবস্থা বা সন্ন্যাসাবস্থা বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেরই পথ কর্ম্মের ভিতর দিয়া। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ সাংসারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি হইতে পৃথক্ না হইয়াও যে সন্ন্যাসাবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, ইহা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য নহে।

কিন্তু একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যাঁহারা সংসারের রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে ব্রহ্মলীলা আস্বাদন করা যায় বলেন এবং সংসারকে মায়া বলিতে ভয় পান, তাঁহাদের উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা উচিত—আদর্শকে নিজ মনের খেয়ালানুযায়ী গঠন করিবার প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে—মনকে আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মোট কথা, আদর্শ টীকে পরিষ্কারভাবে ধারণা করিতে হইবে এবং উহাকে যে পথ দিয়াই হউক না কেন, ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তোমার উক্ত আদর্শ-লাভের প্রতিকূল বোধ হয়, উহাকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে পার, অথবা প্রাণপণ চেষ্টায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে আদর্শলাভের উপযোগী করিয়া লইতে পার। কিন্তু আদর্শকে নিজ দুর্ব্বল মনের অনুযায়ী গঠন করিয়া উহাকে খাটো করিও না অথবা কোন অবস্থায় বলিও না যে, অবস্থা বাধ্য করিয়া আমাকে আদর্শ লাভ করিতে দিতেছে না। আত্মা স্বাধীন—উঁহা কোন অবস্থার অধীন নহে। তুমি বিশ্বাস কর যে, অবস্থার দাস নহ, অবস্থা তোমার দাস। তুমি মনে করিলেই নিজ উপযোগী অবস্থাচক্র গঠন করিয়া লইতে পার অথবা সর্ব্বাবস্থার অতীতও হইতে পার। তুমি সিংহশাবক—আপনাকে মেষশাবক ভ্রমে নিজ মহিমা ম্লান করিয়া বসিয়া আছ। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

অহল্যা পাষাণী।

(শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী)

ধরণী উঠিল কাঁপি লাজে শিহরিয়া,
দ্বিপ্রহরে অন্ধকার,
চারিদিকে হাহাকার,
অসময়ে সূর্য্য গেল বিশ্বজ্যোতি নিয়া।
দিবসে তামসী নিশি,
ছাইয়া ফেলিল দিশি,

প্রতিধ্বনি কলরোলে ক্রন্দনবাহিনী,
দিগ্ দিগন্তরে ছুটি,
অবনীতে পড়ে লুটি,
উচ্চরবে কাঁদি কহে অপূর্ব্ব কাহিনী।
নীরব নিস্তব্ধ ভব,
বাক্যহীন জীব সব,
শব্দ শোভা বর্ণ গন্ধ কিছু নাহি আর,
জমাট আঁধার যেন,
বসুধার অঙ্গ হেন,
পাষাণ-কারার মত রুদ্ধ চারিধার।
সতীত্ব-গৌরব নাশ,
স্বর্গ মর্ত্তে মহাত্রাস,
"অহল্যা পাষাণী" হয়ে পড়িল ভূতলে।
পৃথিবী সকল সয়,
শিলা দেহ বক্ষে লয়,
চেতনা বিলুপ্ত কায়ে হৃদয় উথলে।
প্রস্তর তনুর মাঝে,
অনুভব সদা রাজে,
স্নেহ মায়া ভালবাসা অনুতাপানলে
পুড়িয়া হইল ছাই,
প্রকাশের শক্তি নাই,
চৈতন্য রহিল জাগি সুপ্ত দেহতলে।
কি বেদনা হৃদে জাগে,
সান্ত্বনা কভু না মাগে,
নির্ব্বাণ মুকতি সুধু চাহে চিরতরে।
পাষাণ পাষাণই রয়,
জন্ম পুনঃ নাহি হয়,

কলঙ্ক-কালিমা মুছি যাক পৃথ্বী পরে,
ভস্ম হয়ে যাক্ হিয়া,
স্মৃতি নাহি জাগাইয়া
তোলে পূর্ব্ব শোক আর অভাগীর প্রাণে,
নররূপী নারায়ণ,
করবেন বিমোচন
অহল্যার সর্ব্বতাপ পদছায়া দানে।
যুগে যুগে ভগবান্,
পাতকী তরায়ে যান,
শরীরী মূরতি ধরি ধরাতলে নামি,
রামচন্দ্র অবতার,
শাপমুক্তি অহল্যার,
চরণ পরশ দেন বৈকুণ্ঠের স্বামী।

ব্রজ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

অতি প্রত্যূষে যখন প্রকৃতি ভাল করিয়া চোখ মেলে নাই—কাক কোকিল যখনও নিজেদের নীড় ত্যাগ করে নাই—সেই সময়ে সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত মধুর শ্যামনাম যে কি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া সেই ;বিপুল জনস্রোতকে টানিয়া লইয়া চলিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সহস্র সহস্র নরনারী উচ্চকণ্ঠে যশোদা-দুলালকে আবাহন করিতে করিতে আনন্দে পথ অতিবাহন করিতে

লাগিল। সাধুবৈষ্ণবগণ দলের অগ্রে অগ্রে মধুর কীর্ত্তনে সমগ্র বন ও রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। রাস্তার দুইধার হইতে দুই একটা হরিণ এদিক ওদিক করিয়া পলাইতে লাগিল। আমরা ৬॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মথুরা সহরের পশ্চিমে ভূতেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইস্থান হইতেই চৌবাশী ক্রোশ যাত্রা আরম্ভ হইল। এখানে প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর ৺পাতাল দেবী ও ভোলানাথের আশীর্ব্বাদ লইয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল।

আমরা এইবার পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া ॥ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া মধুবনে আসিলাম। পথে মধুবনের ১ মাইল পূর্ব্বদিকে ধ্রুবের তপস্থাস্থল "ধ্রুবটীলা" দেখিয়া আসিলাম। দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাঁচ বছরের শিশু হরিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া এইস্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া এইস্থান হইতেই বিজয়ী বালক মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। স্থানটি প্রকৃতই তপস্যা করিবার উপযুক্ত। চারিদিকে উচ্চতরু-রাজিবেষ্টিত সুউচ্চ মাটির টীলার উপর শ্রীহরির মন্দির, নিম্নে সুবৃহৎ পুষ্করিণী আর তাহার চারিদিকে অনন্ত বিস্তৃত মাঠ—দেখিলেই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

মধুবন মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে এইখানে আসেন এবং দৈত্যরক্ষিত মধুবনের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বলদেব মধুপান করিতে থাকিলে দৈত্য তাহা জানিতে পারিয়া বলদেবকে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া অগ্রজকে রক্ষা করেন। এখানে একটি বাঁধান সরোবর আছে, উহাকে মধুকুণ্ড বলে—যাত্রীরা এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ আসন অথবা তাঁব খাটাইয়া সেই রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করেন। মধুবনে আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দলের প্রধান পাণ্ডার আজ্ঞানুসারে যাত্রিগণ সেই স্থানে আহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহারান্তে সময় থাকিলে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য লীলাস্থল-

গুলিও দর্শন করিয়া যাত্রিগণকে সে রাত্রে সেই স্থানেই বাস করিতে হইবে।

বনে যে সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাত্রিবাস করিতে হয় তাহার অধিকাংশ স্থানেই বাসোপযুক্ত গৃহাদি পাওয়া যায় না। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপযুক্ত তাঁবু ও উহার সরঞ্জামাদি লইতে হয়। যাহারা বনযাত্রায় পদব্রজে যাইতে পারে না তাহারা পাল্কি অথবা ডুলি ভাড়া করিয়া গমন করে। বনে দই দুধ, লুচি সন্দেশ, চাল ডাল, আটা তরকারি—সাধারণতঃ সমস্ত খাবার জিনিষই পাওয়া যায়। যাত্রীদের সহিত বৃন্দাবন ও মথুরা হইতে দোকানদারেরা গরুর গাড়ি করিয়া নিজ নিজ দোকান পাট লইয়া যায়, সুতরাং সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই কিনিতে পাওয়া যায়। ভূতেশ্বর হইতে আসিবার সময় আমাদের সহিত আরও তিন জন সাধু মিলিত হইয়াছিল। আমরা ৫ জনে মধুকুণ্ডে স্নান ও শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক দর্শন করিয়া উপযুক্ত আশ্রয়স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। সে দিন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও গৃহ অথবা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার স্থান পাইলাম না, অগত্যা একটি ঘনপত্রসন্নিবিষ্ট গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম ও নিজ নিজ কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমে যাত্রীদের রান্না হইল এবং আমরা পাঁচজনে যথেষ্ট মাধুকরি সংগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের নীচে পরমানন্দে ভোজন করিলাম। আহারান্তে মধুবনগ্রাম ও অন্যান্য স্থানগুলি দর্শন করিতে বাহির হইলাম। এক শত অথবা কিছু বেশী ঘর লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রাম, গৃহগুলি প্রায়ই দ্বিতল, সমস্তই মাটির ছাদ। এদিকে বর্ষা বেশী হয় না—পরন্তু গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের এত বেশী তাপ হয় যে আমাদের দেশের মত ছাদ তৈয়ার করিলে ফাটিয়া যায়। সেই জন্যই এদিকে এইরূপ মাটির ছাদ তৈয়ার করিবার রীতি। বর্ষাকালে বৃষ্টিও এত বেশী হয় না যে মাটি ধুইয়া যাইবে। গ্রামের মোড়লের গৃহও এই রকম মাটির ছাদে আবৃত—কেবল গৃহের দেয়ালগুলি ইঁটের ও পাকা গাঁথুনি। ইহাদের প্রধান আহার "জনার" অথবা

"মাতুয়াব" আটার রুটি —গমের আটার রুটি ও ভাত প্রায়ই খায় না। ডালের মধ্যে ছোলা ও কলাই। রবিশস্য যথেষ্টই হয়, কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া তাহারা লবণ, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতির সংস্থান করে। রমণীরা ঘাঘরা ব্যবহার করে কাপড় প্রায়ই পরে না। বালকবালিকারা ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত দিগম্বরই থাকে। তাহার পর পিতা অথবা মাতার পরিত্যক্ত কাপড় কিংবা ঘাঘরা ব্যবহার করিতে পায়। প্রত্যেক গ্রামবাসীরই যথেষ্ট গো মহিষ আছে। বনযাত্রার সময় যাত্রীদের নিকট দুধ ঘি বেচিয়া বেশ দু' পয়সা রোজগারও করিয়া থাকে, কিন্তু সব সময়ে নয়। নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী অতিথিসৎকারে ইহাদের আগ্রহ বড় কম নয়। বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ ইহাদের দানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিতে সমর্থ হয়। এই সরলচিত্ত অধিবাসীদের সহিত কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া তালবন দর্শন করিতে প্রস্থান করিলাম।

তালবন—পূর্ব্বে এইস্থান তালবৃক্ষ দ্বারা বষ্টিত ছিল এবং ইহার সুপক্ক ফলগুলি গর্দ্দভাকার 'ধেনুক' অসুরের ভয়ে পক্ষী পর্য্যন্ত কোনও তালবৃক্ষে বসিতে সাহস করিত না। গোচারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ বলরাম সখাগণসহ একদিন এই তালবনের নিকটে আসিয়া সুপক্ক তালের লোভে আকৃষ্ট হইলেন, এবং গোপালগণকে দুই চারিটি তাল আনিতে অনুরোধ করিলে তাহারা অতি পুলকিতচিত্তে তালবনের দিকে ধাবিত হইল এবং বনের মধ্যে বিকটাকার অসুরকে দেখিতে পাইয়া সভয়ে পলাইয়া আসিয়া কৃষ্ণবলরামকে নিবেদন করিল। তখন মহাবলী বলরাম বালকগণসহ সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ কম্পিত করিতে লাগিলেন। ফলগুলি সশব্দে নীচে পড়িতে লাগিল। সেই শব্দে চমকিত অসুর যখন দেখিল যে কতকগুলি বালক তাহার সযত্নরক্ষিত বৃক্ষ হইতে তাল পাড়িতেছে, তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলরামকে আক্রমণ করিল। মহাবলী বলরাম সেই গর্দ্দভাকৃতি অসুরের পিছনের পা দুটি ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন, এবং সবলে

তাহাকে সেই তালবৃক্ষেই নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই অসুর পঞ্চত্ব পাইল। অসুরের দেহাঘাতে তালবৃক্ষটী ভাঙ্গিয়া অপর গাছের উপর পড়িল, এইরূপে সমস্ত গাছগুলিই পড়িয়া গেল। বালকেরা কৃষ্ণ-বলরামসহ আনন্দে তাল ভক্ষণ করিতে লাগিল। পাণ্ডারা বলে যে, সেই অবধি একটিও বৃক্ষ জন্মে নাই। এইস্থানে শ্রীশ্রীবলদেবজীর মন্দির আছে এবং মন্দিরের নিকটে তালবনকুণ্ড নামে একটি সরোবরও আছে। এই সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া তবে শ্রীশ্রীবলদেবজীকে দর্শন করিতে হয়।

তালবন দর্শন করিয়া আমরা কুমুদবনে আসিলাম। এখানেও কুমুদকুণ্ড নামে একটি মনোহর সরোবর আছে—জল অতি গভীর ও নির্ম্মল। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বিহার ও জলক্রীড়া করিতেন। মহামুনি কপিলদেবের প্রতিমূর্ত্তিও একটি মন্দিরে দেখিতে পাইলাম কথিত আছে যে, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া কপিলদেবকে দর্শন করিলে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কুমুদবন দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা মধুবনে রাত্রি যাপনের জন্য ফিরিয়া আসিলাম।

মধুবনে আসিয়া দেখিলাম যে যাত্রীদের বাস করিবার স্থানটির চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল মশালের আলোকে আলোকিত করা হইয়াছে, এবং পাণ্ডারা বড় বড় বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া উহার চারিধারে পাহারা দিতেছে। প্রাচীনকালে এখানে চোর দস্যুগণের খুবই উপদ্রব ছিল, এবং যাত্রী ও পাণ্ডারা রাজকীয় সাহায্য ব্যতীত বনভ্রমণে যাইতে সাহস করিত না। সেই জন্য জয়পুররাজ এই বনভ্রমণের সময় রাজসরকার হইতে সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পাঠাইতেন। বর্ত্তমান ইংরাজশাসনে চোর দস্যুর অত্যাচার প্রশমিত হওয়ায় জয়পুররাজ তাঁহার পুলিস প্রহরী উঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রায় ১৯ মাইল স্থান ভ্রমণ করিয়া যখন সন্ধ্যায় মধুকুণ্ডে সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলাম তখন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে—কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহ ও মন আর কিছুতেই ভিক্ষা করিতে চাহিল না। কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া নিদ্রাদেবীর শরণ লইলাম। সহসা

কাহারও হস্তস্পর্শে চমকিত হইয়া উঠিয়া দেখিলাম যে একটি বৈষ্ণব বাবাজি আমাদের সকলকে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং অতি বিনীতভাবে এইরূপ অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে, আজ দ্বিপ্রহরে যখন আমরা স্নানান্তে শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের গদী দর্শন করিতে যাই তখন তিনি আমাদের দেখিয়াছিলেন, তাহার পর আমরা মাধুকরি করিয়া বৃক্ষতলে ভোজন করিয়াছি তাহাও তিনি জানেন—কিন্তু সন্ধ্যার সময় আমাদের ভিক্ষা করিতে না দেখিয়া আমাদের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া পড়েন—তাহার পর লোক পাঠাইয়া আমাদের সন্ধানও করেন। তাঁহার লোকটি আমাদিগকে এই স্থানে নিদ্রিত দেখিয়া যায় ও তাঁহাকে সংবাদ দেয়। আমাদের কিছুই আহার হয় নাই অনুমান করিয়া তিনি নিজ হস্তে কয়েকটি রুটী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন ও সেই জন্যই ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছেন বলিয়া তিনি অতি দুঃখিত—ইত্যাদি। দেখিলাম তাঁহার হস্তে একটি পাত্র রহিয়াছে। আহারের আশা ত্যাগ করিয়াই আমরা শয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অযাচিতভাবে রুটিগুলি পাইয়া আমরা যাঁহার নাম করিয়া পথে বাহির হইয়াছি তাঁহাকে মনে পড়িয়া গেল—তখনি ভক্তিনম্র শিব তাঁহারই শ্রীপদে বার বার লুণ্ঠিত হইল। আমাদের দৃঢ় ধারণা হইল যে, বনে আমরা কখন কোনও প্রকার কষ্ট পাইব না। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা যথেষ্টই ছিল। সেই রুটিগুলি একটু চাটনীযোগে অনতিকাল মধ্যেই নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈষ্ণব বাবাজী নিঃশব্দে একধারে দাঁড়াইয়া আমাদের আহার দেখিতে লাগিলেন—সেই সময় তাঁহার নয়নে কি এক গভীর করুণা ও তৃপ্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আজও মনে পড়ে। ভোজন শেষে তিনি আমাদের তাঁহার আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। টিপি টিপি বৃষ্টি সমস্ত দিনই পড়িতেছিল। গভীর রাত্রে আরও বেশী বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহাও আকাশ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। তাই বাবাজীর আমন্ত্রণে অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার

অর্দ্ধেক ছাদশূন্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম যে আমাদের মত অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তিনি আমাদের অনুযোগ সত্বেও তাঁহার ভগ্ন তক্তাপোষ ছাড়িয়া দিলেন এবং শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া কোথায় যে প্রস্থান করিলেন তাহার আর খোঁজই পাইলাম না। অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম যে দীনতার প্রতিমূর্ত্তি—সেই বাবাজী ভগ্ন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া জোড়করে তাঁহার কুটীরে আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রিগণকে বিদায়সম্ভাষণ করিতেছেন। উষার স্নিগ্ধ আলোকে তাঁহার সেই দীনমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় ভরিয়া উঠিল। আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিলিত হইলাম। আজ আকাশ নির্ম্মল। পূর্ব্বদিনের মত আজও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সেই বিশাল জনসঙ্ঘ সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। অদ্য ৮ মাইল ভ্রমণ করিয়া বেহুলাবনে রাত্রিবাস করিতে হইবে।

মধুবন হইতে উত্তরদিকে চারি মাইল দূরে শান্তনুকুণ্ডে (দেশী নাম সাঁতোয়া) আসিলাম। এই রমণীয় স্থানে শান্তনু মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের উত্তর পাড়ে কতকগুলি মন্দির ও ধর্ম্মশালা আছে। পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ বিশ্রাম করেন। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি মাটির পাহাড়ের উপর শ্রীশ্রীবিহারিজীর মন্দির, অপর নাম শ্রীসূর্য্যমন্দির। সরোবরের পূর্ব্বপাড়ে বাঁধান ঘাট। ঘাট হইতে পাহাড়ে যাইবার কাঠের পুল। আমরা যে সময়ে মন্দিরে দেবতা দর্শন করিতেছিলাম—সেই সময় চারিদিকে হঠাৎ গোলমাল হইয়া উঠিল। অন্যান্য যাত্রিগণ প্রায় সকলেই মন্দির হইতে ব্যস্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কারণ অনুসন্ধান করিতে বাহিরে আসিবামাত্র আমাদের মধ্যে একজন টলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, এবং মন্দিরের একদিককার দেয়ালের কতক অংশ খসিয়া পড়িল। আমরাও টলিয়া উঠিলাম। তখন বুঝিতে

পারিলাম যে ভূমিকম্প হইতেছে। চারিবার কম্পন অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পর সব স্থির হইলে আবার যাত্রীর হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। আমরা চলিয়া আসিলাম। ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া নানারূপ আলোচনা শুনিতেছি এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আমাদের একজন সঙ্গী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল -তাহার চীৎকারে আমরা নিকটে আসিলাম। বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাদের কতকগুলা সিদ্ধ ছোলা ও গুড় দেখাইয়া বলিল, "একটি রামায়েৎ সাধু এই গুলির ভাণ্ডারা করিতেছে, বেশ জলযোগ চলে।" সকাল হইতে হাঁটিয়া আসিতেছি—বিশেষতঃ স্নান করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক যে না হইয়াছিল তাহাও নহে। আমরা সকলেই সাধুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সাধুটি বৃদ্ধ, দীর্ঘ পাকা চুল ও দাড়িতে তাঁহার প্রায় সমস্ত উপরার্দ্ধ আবৃত, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। আমাদের বেশ যত্ন করিয়া একখণ্ড চট পাতিয়া বসিতে বলিলেন এবং একটি পাতার ঠোঙ্গায় করিয়া ছোলা সিদ্ধ ও কতকটা গুড় দিলেন আর নিজে যষ্টি হস্তে নিকটে বসিয়া বড় বড় বাঁদর—যাদের আমরা লক্ষ্যাই করিনি—তাড়াইতে লাগিলেন। বেচারা বাঁদরগুলি অনন্যোপায় হইয়া আমাদের কিছু তফাতে বসিয়া রহিল এবং মধ্যে মধ্যে হতাশভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, যদি কোনও উপায়ে ঠোঙ্গাটি কাড়িয়া লইতে পারে। আমরা জলযোগ শেষ করিয়া সাধুজীকে ধন্যবাদ ও প্রণামপূর্ব্বক এই সাঁতোয়া গ্রামের ঈশানকোণস্থিত "গনেস্র" গ্রামে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবী দর্শন ও গন্ধেশ্বরকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া বেহুলাবনাভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ ১২টার সময় বেহুলাবনে বেহুলাকুণ্ডের ধারে আসিয়া এক প্রকাণ্ড নিম গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম। পথে আসিবার সময় যাত্রিবাহিনির সর্দ্দার পাণ্ডা আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—সেইজন্য বেশ সুস্থমনে সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রন্ধন সমাপ্ত হইলে পাণ্ডাজী ডাকিয়া লইবে কিন্তু ৩টা বাজিয়া গেলেও কেহ ডাকিল না দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলাম। তখন আমাদের মধ্যে একজন পাণ্ডাজীর নিকট গমন করিয়া জানিল যে, আমাদের ডাকিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। যোগাড় করিতেই হইবে, কারণ ক্ষুধার উদ্রেক যথেষ্টই হইয়াছিল। এমন অসময়ে কাহার নিকট ভিক্ষা করিব চিন্তা করিতেছি এমন সময় চুঁচুড়াবাসী একটি ভদ্রলোক তাঁহার একজন সঙ্গীর অসুখ করায় আমাদের নিকট ঔষধ লইতে আসিলেন। সকলেরই শুষ্ক মুখ দেখিয়া প্রবীণ ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন যে আজ আমাদের আহার জোটে নাই। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং আমরা দোকানের পুরি ও মিঠাই খাইব কি না জানিতে চাহিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে উক্ত ভদ্রলোক লুচি, চাটনী ও মিঠাই-ই নামক চিনির সন্দেশ লইয়া আসিলেন। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে বন, গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য লীলাস্থলী দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। প্রথমে কুণ্ডের তীরে 'বহুলা' গাভীর স্থান। বহুলা নামে একটি গাভীকে এই বনে বাঘে আক্রমণ করিয়াছিল। গাভীটি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলে শ্রীকৃষ্ণ বাঘ মারিয়া গরুটিকে উদ্ধার করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই স্থান দর্শন করিতে আসিলে অনেকগুলি গরু তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহার অঙ্গ লেহন করিতে করিতে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছিল। বৈষ্ণবগণ এই স্থানটি অতি পবিত্র বোধে পূজা করিয়া থাকেন। কুণ্ডের উত্তর তীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক (বহুলাগ্রামের ব্রজবাসীরা এই গ্রামকে বাটীগ্রাম বলে)—পূর্ব্বদিকে শ্রীবলরাম কুণ্ড। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে "মান সরোবর" প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাত্রি এক প্রহরে বহুলাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

(ব্রহ্মচারী ধ্রুবচৈতন্য)

বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রসার হওয়ায় অনেকেই আজ কাল ঐ ধর্ম্ম লইয়া বিচারাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য সুরে সুর মিলাইয়া বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভুঁই-ফোঁড়, অতীত ইতিহাসের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, বৈদিক ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং পৌরোহিত্যের অত্যাচার চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব—ইহার দর্শন স্বতন্ত্র, ইহার সাধনপ্রণালী স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ ইহার সঙ্ঘের সন্ন্যাসিমণ্ডলী জগতে একেবারে নূতন। ইহার প্রমাণস্থলগুলি উদ্ধৃত করা যাউক ঃ—

"In its origin one of the sublimest and most radical of all reactions in favour of the common human rights of individuals against the grinding tyranny of the so-called divine rights of birth and rank. It was the work of a single man who rebelled against the Brahmanic priests in the beginning of the Sixth Century B.C. and by the simplicity and moral power of his teaching brought the Indian people to a complete breach with its own past".—Weber, Indische Streifen, I p 130.

"উৎপত্তির দিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বত্বস্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তিত্ববুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ব্বথা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলির ইহা অন্যতম। ইহা সেই একজন লোকের কর্ম্ম, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও স্বীয় সরল ও নীতিগর্ভ শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় জনসঙ্ঘকে তাহাদের অতীত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"In the doctrine of Buddha—the Philosophy of the Indians...... had broken with results of the history of the Aryans on the Indus and the Ganges, with the development of a thousand years ..... And this doctrine, which annihilated the entire ancient religion and the basis of existing society ......rested solely on the dicta of a man who declared that he had discovered truth by his own power and maintained that every man could find it. That such a doctrine found adherence and ever increasing adherence is a fact—without a parallel in history"—Max Duncker, History of Antiquity Vol. IV. p. 455

"বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মমতের ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদ্ভূত আর্য্যেতিহাস হইতে, সহস্র বৎসরের অনুশীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া একমাত্র তাঁহারই কথার উপর ইহা গড়িয়া উঠিল, যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তিবলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছেন—এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলন।

"The deliverer of a priest-ridden, caste-ridden nation,—the courageous reformer and innovator who dared to attempt what doubtless others had long felt, was necessary, namely, the breaking down of an intolerable ecclesiastical monopoly by proclaiming absolute free-trade in religious opinions and the abolition of all caste privileges".—Prof. Monier Williams—Indian Wisdom, p. 55.

"পৌরোহিত্যোন্মোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিত্রাতা, সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি অপরের বহুকালের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভাবটিকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণা করিয়া যাজককুলের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সকল জাতিগত

উচ্চাধিকারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।"

দুই একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ, অশোকস্তম্ভ এবং গিরিলিপিগুলির আলোচনা করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপিত এবং উপরোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মন্তব্যগুলি মিথ্যা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। বৌদ্ধ সাহিত্যের পবর্ত্তক আলোচকদিগের জানা উচিত যে অশোকস্তম্ভ এবং গিরিলিপিগুলির আবিষ্কারের পরে উল্লিখিত মতগুলির আর কোনই মূল্য নাই। "Rebelled against the Brahmanic priest" (ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল), "annihilated the entire ancient religion" (সমগ্র সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল), "abolition of all caste privileges" (সর্ব্বপ্রকার জাত্যাধিকারের বিলোপ সাধন করিয়াছিল), প্রভৃতি কথাগুলির যে কোন সার্থকতা আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। অনুশাসনগুলি হইতে কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে :—

(ক) "ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার"—গির্ণার ৪।

(খ) "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান"—গির্ণার ৮।

(গ) "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধু কার্য্য বলে"—গির্ণার ৯।

(ঘ) "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান"—গির্ণার ১১।

(ঙ) "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মানসহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না—যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্যসংযম—কিরূপ? সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে যেন আদৌ না হয় এবং বিষয়বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগেরও পূজা করা

কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়; এরূপ না করিলে সধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই ভাল।—কিরূপ? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন। কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়নসম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বলা উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সারবৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয় দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত নানাবিধ ধর্ম্ম মহামাত্র বচভূমিকেরা ও অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্‌সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ"—গির্ণার ১২।

এই অনুশাসনগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ধৃত পাশ্চাত্য মতগুলি কতদূর সত্য। পুনশ্চ প্রিয়দর্শী অশোক যে ঐ অনুশাসনগুলি প্রজারঞ্জনের জন্য ক্ষোদিত করিয়াছিলেন এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। কারণ তিনি যে একজন বৌদ্ধসঙ্ঘপরিচালিত গোঁড়া ভক্তিমান রাজা ছিলেন তাহা "ভাবড়া-লিপি" হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয়:—

"প্রিয়দর্শী রাজা, বিঘ্নহীন ও সুখে বিরাজমান মগধদেশীয় সঙ্ঘকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতেছেন, হে ভদন্তগণ বুদ্ধে, ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে আমার কিরূপ ভক্তি ও গৌরব আছে তাহা আপনারা জানেন। হে ভদন্তগণ, ভগবান্‌ বুদ্ধ যাহা কিছু কহিয়াছেন সকলই সুভাষিত। ভদন্তগণ, কিরূপে আমার দ্বারা এই সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে, তাহা আপনাদিগকে অবগত করান কর্ত্তব্য মনে করি।"

হিন্দুর যেমন "গীতা" বৌদ্ধের তেমনি "ধম্মপদ"; আবার এই ধম্মপদের [illegible] অংশের নাম "ব্রাহ্মণ বগ্‌গো"—এই অংশে ব্রাহ্মণকেই

আদর্শ করা হইয়াছে। তবে এই ব্রাহ্মণ জাতিগত নয়, গীতার "গুণকর্ম্ম বিভাগসঃ।"

"জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যে ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী সে শুচি এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

ধম্মপদ, ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১১।

"ব্রাহ্মণজাতিতে উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণগর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহা হইলে কেবল ভোগবাদী হইবে। কিন্তু সে আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপী হইলে তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"Which annihilated the entire ancient religion and the basis of existing society" (যাহারা সমগ্র সনাতন ধর্ম্মের ও তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোৎসাদন করিয়াছিল) কথাটি কতদূর সত্য ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। আর "Reactions in favour of the common human rights" (সর্ব্বসাধারণের মানব-ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষে প্রতিক্রিয়া) "breaking down of the intolerable ecclesiastical monopoly by proclaiming absolute free trade in religious opinion" (ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তনে দুঃসহ পৌরোহিত্যশক্তির অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তির উপর হস্তক্ষেপ), প্রভৃতি democratic element (গণতন্ত্রী উপাদনসূচক লক্ষণের কথা) বুদ্ধদেব কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই এবং ইহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পুনরায় জাতিবিভাগ যদি বৌদ্ধদের নিকট এতই দোষের তবে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের সহিত জাতিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় কেন?—সংস্কারকেরা একেবারে উহা সমাজ হইতে মুছি ফেলিলেন না কেন? ডাক্তার Kuenen-এর মতে বৌদ্ধগণ ইহা তথায় প্রচলন করিয়াছিল কি না তাহাও জিজ্ঞাস্য। শুধু ইহাই নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের নানা স্থানে উচ্চ ও নীচ জাতির বিচার দেখিতে পাওয়া যায় এমন কি সকল বুদ্ধই হয় না হয় ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের

তৃতীয় অধ্যায়ে শাক্য বুদ্ধের জন্ম লইয়াই বহু বিচার করা হইয়াছে। "জম্বু ভূভাগের সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বিষয় তিনি অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে এক নিষ্কলুষ শাক্যবংশ ব্যতীত অপর সকল গুলিই দোষবিশিষ্ট।" কথিত আছে, বুদ্ধদেব নাকি স্ত্রীজাতির হীনত্ব সম্বন্ধেও কটাক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মাতা ও স্ত্রীকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত কবিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

দর্শন ও ধর্ম্ম মূলতঃ একই কারণের উপব স্থাপিত। দর্শনের কার্য্য স্বধর্ম্মকে বিচারের দ্বারা স্থাপিত করা। সময় সময় এই দর্শনশাস্ত্র বিদেশেব এবং অপর ধর্ম্মীর চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনে অপর কোনও বিজাতীয় চিন্তার ছাপ পড়ে নাই। কাজে কাজেই যদি আমরা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির সাহত প্রাচানতর বৈদিকধর্ম্মের তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্বরূপ গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ আর একটি নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে। সে ধারা নিজ সঙ্কীর্ণ জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতের অনুর্ব্বর ভূমি সরস করিয়াছে, অজ্ঞানীর শুষ্ক জিহ্বায় অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছে। পঞ্চ দুঃখ, কর্ম্মবাদ, শূন্যবাদ, প্রভৃতি অমূল্য মণি বৈদিক ধর্ম্মেব খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল শ্রীবুদ্ধদেব পুনরায় তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে নূতন ভাষায় নূতন ভাবে সেই তত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন—যে দেবতা অরণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাঁহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কার্য্য ভারতে নূতন নহে। ভারতের ভগবান্ বহুবার মূর্চ্ছাপন্ন এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই ভারতের একটি অপূর্ব্ব প্রথা, গোঁড়ারা নিজ নিজ সম্প্রদায় বা ইষ্ট লইয়া হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ ভাবেই ইচ্ছা শাস্ত্র ও ভাষ্য তৈয়ার করে করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥"

—প্রভৃতি হিন্দুদর্শনসূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতির "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্যই "অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।" এই শ্রীবুদ্ধ-বাক্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥" কঠোপনিষদ্।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহি না জায়তৈকং ॥ ৩ ॥
ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূঃ।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।"

—প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষায় পুনঃ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতাযা এতদধিবচনম্।"

"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি।"

"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।"

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।

ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"

বৌদ্ধধর্ম্মে "শূন্যম্" "গম্ভীরম্' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে তাহাই "পূর্ণম্", "সৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে মাত্র।

জাতক গ্রন্থের পুনর্জ্জন্মবাদও শ্রুতিতেই বীজানুকারে, কখনও বা স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তৃতীয় বরে বলিতেছেন :—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

"মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন 'আছে' কেহ কেহ বলেন 'নাই', আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি ; আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর।"

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ঈশ।

"আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে॥"

বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীও নবাবিষ্কৃত ব্যাপার নহে ইহার অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারটি পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে পাওয়া যায়। অপস্তম্ব এবং গৌতমসূত্র, যাহা মনু অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া কথিত আছে, তাহাতে সন্ন্যাসীর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত

হইয়াছে। "তিনি (সন্ন্যাসী) নিরগ্নি, নিগৃহ, নিবৃত্ত ও নিরালম্ব হইয়া কালযাপন করিবেন। কেবল প্রতিদিন স্বাধ্যায়ের সময় মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত অপর সকল সময়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে থাকিবেন। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন গ্রাম হইতে মাত্র ততটুকু ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক ইহামুত্রবিরাগী হইয়া সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন।"

"সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ, বেদের অনুশাসন এবং ইহলোক ও পরলোকসম্বন্ধীয় সকল দ্বন্দ্ব পরিহারপূর্ব্বক তিনি পরমাত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন।"

আবার উভয় ধর্ম্মগ্রন্থসকল পড়িলে ইহাও বোধগম্য হয় যে বৈদিক তপোবন বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্ম অরণ্য হইতে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যোগশাস্ত্রও বহু পূর্ব্ব হইতেই কঠ, শ্বেতাশ্বতর, গীতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুশীলীকৃত হইয়াছিল।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি বৈদিকধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয়, এত বিসদৃশ হইয়া পড়িল কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে প্রচারকের অভাব। শ্রীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটি বিশাল নব তরঙ্গ, শ্রীশঙ্কর আর একটি। প্রথমটি হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নিঃসৃত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিয়াছিল কিন্তু অপরটির সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে যখন পুনরায় নব তরঙ্গের উত্থান হইল তখন সে তরঙ্গ আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌঁছিল না। কারণ বাষ্পীয় পোত, তড়িৎ-বার্ত্তাবহ, সংবাদ পত্র এবং সর্ব্বোপরি প্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং তত্তৎ দেশীয় মনীষীরা তাহার উপর নব যুক্তি ও তথ্যের আবিষ্কার করিয়া উহাকে মাতৃভূমি হইতে

একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অন্ধকারে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাই বিদেশের বুদ্ধ এত উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে আর একখানি আসন পাতিয়া দিল—অসংখ্য আলোকমালার মধ্যে যেন আর একটী আলোক ফুটিয়া উঠিল। ভারতবাসী তাঁহাকে পূজা করে—অবতার বলিয়া মানে কিন্তু তাঁহার পথ যে একমাত্র পথ তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শ্রীভগবান্ মানবের অবস্থা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান্ মানবের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন মাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, শ্রীবুদ্ধদেব যদি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে ভারতীয় ধর্ম্মবীরদিগের প্রকৃতি ঐরূপ।—তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকে বহুবার এতদ্দেশীয় আস্তিক বা নাস্তিক দার্শনিকেরা আক্রমণ করিয়াছেন যথা, ঋষি যজ্ঞ করিতে আসিয়া হবিঃহস্তে বলিয়া ফেলিলেন ঃ—

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায হবিষা বিধেম ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূঃ, ৫ম মন্ত্র।

এখন সায়ন যে ভাবেই ইহার ভাষ্য করেন করুন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ প্রথম মুণ্ডক, ৪, ৫।

গীতায় আছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতা পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২,২ অ।
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫, ২অ।

চার্ব্বাক্ দর্শনে আছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে—

নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥

২য় উল্লাস, ১৫ শ্লোক।

যাহা হউক আমরা এখন বৃদ্ধ Max Mullerএর সহিত সমস্বরে বলিতে চাই যে, "বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্কুরোৎপত্তির স্থান উপনিষদের মধ্যেই নিবদ্ধ। উপনিষদ্‌প্রোক্ত ধর্ম্মাভিমতগুলিকে চরম বিকাশের পথে পৌঁছাইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক তাহা নহে পরন্তু—ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি সহায়ে একটি নূতন সামাজিক শৃঙ্খলারও বিন্যাস করিয়াছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের সম্যক্‌সম্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী যাহা ভিক্ষুও তাহাই, তবে সে ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থিগণের নীরস আত্ম-সংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্ত্তব্যভার ও ব্রাহ্মণ প্রব্রজিত-গণের নানারূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত। সন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রাতৃমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি—সেই মণ্ডলীর দ্বার, তরুণ কিম্বা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র, ধনী কিম্বা দরিদ্র জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট অবারিত। বস্তুতঃ বৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত সম্পর্কশূন্য নহে—উভয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা

বর্ত্তমান এবং আপাতদৃষ্টিতে তীব্র বিরোধসমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের পার্থক্য আমরা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও উপনিষদের মধ্যে অন্বেষ্টব্য।"

— —

বিশু দাদা।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

তথাকথিত বিজ্ঞ লোকেরা তাকে দেখলে উপেক্ষার হাসি হাসত, কেন না স্বার্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ! তাঁর ধীর সহিষ্ণু ভাব দেখলে মনে হ'ত, যেন দুঃখকষ্টগুলিকে আগ্রহভরে বরণ কর্‌বার জন্য তাঁর দৃঢ়হৃদয় সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে আছে। সময় সময় অতিরিক্ত উদার ব্যবহারের জন্য তাকে যথেষ্ট বিব্রত হ'তে হ'ত, কিন্তু তথাপি তাঁর স্বাভাবিক চিত্তপ্রশান্তি ভঙ্গ হ'ত না। শিশুর নগ্ন সরলতা ও প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত তাঁর অদ্ভুত চরিত্র বড়ই মধুর। তিনি যখন আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে বসে থাকেন, তখন দেখলেই মনে হ'ত যে, কল্পনার সুন্দর আবরণ খুলে নিশ্চয় আমাদের মত সাদা চোখে জগৎটাকে দেখতে তিনি মোটেই ইচ্ছুক নন। অথচ তিনি সকলকেই ভালবাসেন—আর্ত্তের কাতর ক্রন্দন কখনও তাঁর কাছে উপেক্ষিত হয়নি। ভদ্রলোকের চেয়ে গরীব চাষারাই ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশী আদরের। তিনি যখন তাদের বাড়ীতে বেতের মোড়ায় বসে, কলাপাতার ঠোঙ্গায় করে তামাক খেতে খেতে তাদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে সুখদুঃখের কথা শুন্‌তেন, তখন তাঁর সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পেত।

সে যাই হোক্, আমি তাঁর "বোকামীতে" ব্যথিত হয়ে, অনেক সময় তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার কর্‌তাম, স্নেহের অভিমানে তাঁকে "সাংসারিক অভিজ্ঞতা" অর্জ্জন কর্‌বার জন্য উত্তেজিত কর্‌তে চেষ্টা

কর্‌তাম কিন্তু বরাবরই তা নিষ্ফল হয়ে এসেছে। আঘাত পেলে যে প্রতিঘাত করাটা স্বাভাবিক, এ সাংসারিক নীতিটা তিনি যেন স্বীকার কর্‌তে মোটেই প্রস্তুত নন। কিন্তু যে দিন শুন্‌লাম কতকগুলি নীচ প্রকৃতির লোক তাঁকে অন্যায় ভাবে অপমান করেছে, অথচ তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন কর্‌বার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি, সে দিন মনে মনে স্থির কর্‌লাম, যেমন করে পারি, তাঁকে উত্তেজিত করে এর প্রতি-বিধানের চেষ্টা কর্‌বই কর্‌ব।

তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একখানা বই পড়্‌ছিলেন, আমি ঘরে প্রবেশ কর্‌তেই মাথা না তুলেই বল্‌লেন, "কে প্রতাপ—বোস্?" কারণ আমার পদশব্দ তাঁর সুপরিচিত। ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বল্‌ছিল—বিনা বাক্য ব্যয়ে তক্তাপোষের উপর বসে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন করা দূরে থাক্, তাঁর বই পড়ার রকমটা দেখে বোধ হ'ল, ঘরে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ আছে সে কথাটা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবুও ভ্রুক্ষেপ নেই দেখে আর চুপ করে থাকা অসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল—কঠোরস্বরে বল্‌লাম, "ও বই এখন থাক্—আমার অনেক কাজ আছে, বসে থাক্‌তে আসিনি।" তিনি একটু কুণ্ঠিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন, "ওহো তুই যে কাজের লোক—সে কথাটা ভুলে যাওয়াটা মোটেই ভাল হয়নি।"

ভূমিকা অনাবশ্যক বিবেচনায় যা যা শুনেছিলাম সব বলে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কেমন ঠিক কি না?"

তিনি সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে, অন্যান্য কথা দিয়ে আমায় ভুলাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বল্লাম, "লজ্জা করে না? যার যা খুসি তাই বলে যাবে—আশ্চর্য্য লোক! মানুষ অনেক রকম দেখেছি, কিন্তু এত নির্লজ্জ হ'তে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

স্থির প্রশান্তভাবে তিনি উত্তর কল্লেন, "ঘটনা সত্য; কিন্তু তাই বলে তোর এতটা বিচলিত হওয়া শোভা পায় না।"

"না, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এত বড় একটা অন্যায় আমি আপনাকে নীরবে সহ্য কর্‌তে কখনই দেব না। আপনাকে কিছু কর্‌তে হবে না, কেবল অনুমতি দিন, দেখুন আমরা কি কর্‌তে পারি। বেশী কিছু নয়—আগুনে হাত দিলে যে হাত পোড়ে, এ চিরন্তন সত্যটা হতভাগাদের নূতন করে বুঝিয়ে দিতে চাই।" মাতা যেমন স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে সন্তানের দিকে চেয়ে ভৎ'সনা করেন, তেমনি করে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "ছিঃ প্রতাপ, এত বিচলিত হয়ো না। তোমার আমার বিচারে যে কার্য্য অন্যায়, কে জানে তাঁর চক্ষে তা কিরূপ! হয় ত এর মধ্যে কোন ভাবী মঙ্গল নিহিত আছে। বিশেষতঃ অপরাধীর দণ্ডদাতা মানুষ নয় ভগবান্; ক্ষণিক চাঞ্চল্যে সে কথা ভুলে যেও না ভাই।" তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে অবশেষে থেমে গেল, যেন আরও কত কি বল্‌বার ছিল কি যেন একটা বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে আর বল্‌তে পার্‌লেন না।

আমি উদ্ধতভাবে উত্তর দিলাম, "সেই অনাদি কাল থেকে বিচার কর্‌তে কর্‌তে ভগবানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়, নৈলে এত অনাচার কখনই তিনি নীরবে সইতে পার্‌তেন না। আপনি যাই বলুন্, ভগবান্ ভরসা করে অন্যায় অপমান সহ্য করাটা যে মহত্ত্ব—সেটা বুঝ্‌তে এখনও আমার অনেক দেরী।"

তিনি কিন্তু অবিচলিতভাবে বলে যেতে লাগ্‌লেন, "সুখও চাই, দুঃখও চাই; চরিত্র গঠন কর্‌তে দুইই সমান উপাদান। অজ্ঞ যারা, তারাই কেবল সুখ চায়, দুঃখ চায় না। কিন্তু যাঁরা জীবনরহস্য অনেকটা ভেদ কর্ত্তে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরা জানেন যে সুখের চেয়ে দুঃখই অধিক শিক্ষা দেয়; তাঁরা জানেন—প্রশংসার চেয়ে নিন্দার তীব্র কশাঘাতেই অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু হায় অন্ধ আশা!—" আমি বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লাম, "থামুন, ও সব দার্শনিক উচ্ছ্বাসের মূল্য কর্ম্মজগতে বড়ই কম। আপনি যতই কেন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করুন না, এরকম অপমান নীরবে সহ্য করা আপনার দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা।"

চমকিত হয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন, কি যেন বল্‌তে চাইলেন কিন্তু আবেগে তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। ক্ষিপ্তের মত অস্বাভাবিকস্বরে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "তুমি কি বুঝ্‌বে প্রতাপ? তুমি কি জান, আজ বার বৎসর হ'ল আমি কত ব্যাকুল আগ্রহে আঘাতের প্রতীক্ষা কর্‌ছি? আঘাত—কঠোর আঘাত—যা বজ্রনির্ঘোষে সংসারের অসারতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দেয়, যার নির্ম্মম স্পর্শে সমস্ত স্নেহ, মায়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে; –কিন্তু কৈ? তা কতদূরে বন্ধু? ঠিক বলেছ প্রতাপ—আমি দুর্ব্বল, কাপুরুষ! নৈলে বার বছরেও কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না কেন?"—তাঁর দৃষ্টি শূন্য, স্বর হতাশব্যঞ্জক।

আমি তাঁর আকস্মিক চঞ্চলতায় বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তার হাত ধরে কোমলস্বরে বল্‌লাম, "দাদা! মুখে যাই বলি, আপনি আমার হৃদয় জানেন—আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কেউ অন্যায় কথা বল্‌লে বড় ব্যথা পাই তাই—" তিনি বাধা দিয়ে একটু ম্লান হেসে বল্‌লেন, "আগে তোকে অপরাধীই বলি, তার পর ক্ষমা চাস্। পাগল, স্থির হয়ে বোস্, স্তাখ্, আজ তুই যেমন আমায় দুর্ব্বল ও কাপুরুষ বল্‌লি, বার বৎসর আগে আর একজন ঠিক এমনি করে বলেছিল।" সহসা কতক্ষণ চুপ করিয়া তিনি আবার বল্‌লেন, "দেখ্ প্রতাপ, এবার আর ঠক্‌ছি না; ঠিক বলেছিস, প্রতীকার করা চাই। সেবার একজনের কথা শুনিনি, এবার তোর কথা শুন্‌বো।"

এতক্ষণে আমি তাঁর কথার একটু সূত্র পেলাম, কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কে বার বছর আগে আপনাকে দুর্ব্বল, কাপুরুষ বলেছিল, দাদা?"

"সে অনেক কথা—তবে শোন্, সঙ্ক্ষেপে বলি।"

"তখন আমি তোর চেয়ে অনেক ছোট, এগার কি বার বৎসর বয়স হবে। আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে পড়্‌তো, তার নাম বিশ্বনাথ; আমি তাকে বিশু দাদা বলে ডাকৃতাম। ছোট জাতের ঘরে

তার জন্ম হয়েছিল, চাষ বাস করে খাওয়াই তাদের জাত-ব্যবসা। পাঠশালা থেকে উচ্চ প্রাইমারী পাশ করে সে ইংরেজী স্কুলে পড়্‌তে এসেছিল, তখন তার বয়স আঠার কি উনিশ হবে। সুন্দর বলিষ্ঠ তার কৃষ্ণবর্ণ দেহখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তো, তার পাতলা ঠোঁট দুখানি যেন হাসি দিয়েই গড়া। বেশভূষায় তার কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। আমাদের বাসার নিকটে একটা বাসায় সে থাক্‌তো, নিজে রান্না করে খেতো বাসন মাজ্‌তো, ঘর ঝাঁট দিতো। বাল্যকাল থেকে শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত, আত্মনির্ভরশীল পল্লী-যুবক পরমুখাপেক্ষী হ'তে অত্যন্ত লজ্জা বোধ কর্‌তো। ক্লাসে সব চেয়ে আমি ছিলাম ছোট, স ছিল বড কিন্তু সে আমায় অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তো আমিও তার সরল স্নেহময ব্যবহারে তার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাই সময় পেলেই তার কাছে ছুটে যেতাম, বিকালবেলায় তার হাত ধরে মাঠে বেড়াতে যাওয়া আমার নিত্যকর্ম্ম ছিল। কিন্তু শত উন্নতচরিত্র হলেও সে ছিল চাষা—ছোটলোক ; কাজেই অনেক ছেলে আমায় ঠাট্টা কর্‌তো ; কেউ কেউ—ভদ্রলোকের ছেলের ছোটলোকের সঙ্গে অত মেলামেশা ভাল দেখায় না বলে উপদেশ দিতেও ছাড়্‌তো না। যা হ'ক্‌, আমি তাদের কথায় কান দিতাম না

বিশু দাদা যাদের বাসায় থাক্‌তো, তাঁরা তাকে নীচের তলায় দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিল, একটা ছিল তার রান্নাঘর ; আর একটা শোবার ঘর। তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শোবার ঘরখানিতে বড় বেশী আস্‌বাবপত্র ছিল না। একখানি তক্তাপোষ, তার উপর সামান্য বিছানা—তার পাশেই একটা আম-কাঠের বাক্স, তাতে তার বই কাপড় চোপড় থাক্‌তো। ডানধারের দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একখানা ছোট শ্রীকৃষ্ণের পট। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সে, পটখানির সামনে ধুনো দিতো, মাঝে মাঝে দু' চার্‌টে ফুলও আশে পাশে দেখ্‌তাম, আর কি কর্ত্তো না ঠাকুরই জানেন। আর ছবির পাশে লাল কাপড়ে বাঁধা একখানি কাশীরাম

দাসের মহাভারত। অবসরমত সে সেখানা প'ড়্তো—মাঝে মাঝে আমি শুন্‌তাম। কখনো কখনো সে বই বন্ধ করে মহাভারতের কাহিনীগুলি আমায় বল্‌তো—আমি সেই অতীত যুগের মহাপুরুষদের কীর্ত্তিগাথা শুন্‌তে শুন্‌তে মুগ্ধ হ'য়ে তা'র প্রশান্ত মুখখানির দিকে চেয়ে থাক্‌তাম। এমনি ভাবে কত দিন গেছে।

একদিন নদীর ধার দিয়ে বেড়িয়ে বাসায় ফির্‌ছি, সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আমি উৎসাহে বল্‌লাম, "চল বিশুদাদা, গোবিন্দজীর আরতি দেখিগে।" দু'জনে এসে ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপে ছোট্ট ঠাকুরটী মোটেই দেখা যায় না। কাজেই আমি বল্‌লাম, "চল বিশুদাদা, বারান্দায় উঠি, ঐ দরজার সামনে থেকে বেশ দেখা যাবে এখন।" বিশুদাদা সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে, "না ভাই, আমরা ছোটজাত, বারান্দায় উঠেছি দেখ্‌লে কেউ বকবে।"

"বাঃ—আমাদের ঠাকুরবাড়ী, আমি সঙ্গে থাক্‌লে কে আবার কি বল্‌বে?"—বল্‌তে বল্‌তে তার হাত ধরে টেনে দরজার সামনে নিয়ে গেলাম। আরতি শেষ হলে পূজারী ঠাকুর চরণামৃত দিতে লাগ্‌লেন; এমন সময় বিশুদাদা হাত পাত্‌লে তার মুখের দিকে চেয়েই ঠাকুর মশাই মুখ বিকৃত করে বল্লেন, "একেবারে বারান্দার উপরে ওঠা হয়েছে; কেন নীচে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হ'ত?" আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম, "ও ইচ্ছা করে ওঠেনি, আমি ওকে নিয়ে এসেছি।" কিন্তু তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "খোকাবাবু ছেলেমানুষ কি জানে বল? তুমি তো বাপু বুড়ো ধাড়ি, তোমার একটু আক্কেল নেই? ছোট লোকগুলোর ঐ একধারা, দু'পাতা ইংরেজী পড়েই ঠাকুর দেবতা আর মান্‌তে চায় না।" লজ্জায়, অপমানে মুখটী নীচু করে বিশুদাদা ধীরে ধীরে নেমে চলে গেল; আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে শুন্‌ছিলাম; তাকে নেমে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বল্‌লাম, "রাগ করোনা ভাই, আমি কালই বাবাকে বলে এর একটা বিহিত কর্‌বো।" বিশুদাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর কর্‌লে, "আমি

কিছু মনে করিনি অমু, ছোট জাতের ঘরে জন্মেছি, —তা আমারই ভেবে কাজ করা উচিত ছিল।”

পরদিন বাবার নিকট এসে নালিশ কর্‌লাম। তিনি হেসে বল্‌লেন, “পাগল ছেলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।”

আমি এতক্ষণ এই ভাবরাজ্যসঞ্চরণশীল লোকটীর সুদূর শৈশব-স্মৃতি—মর্ম্মের নিহিত ব্যথা নীরবে শুন্‌ছিলাম, একটী কথা বলেও তার বাক্যস্রোতে বাধা দেইনি; এই বার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “আচ্ছা দাদা, এই সব ছোট জাত—এরাও তো হিন্দু, দেব দেবী সব মানে—তবে কেন এদের ঠাকুরঘরে ঢুক্‌তে দেওয়া হয় না?”

তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, “জানি না, কোন্ শাস্ত্রকার এ নিয়ম করে গেছেন! কিন্তু আমার মনে হয় এ উচ্চজাতীয়ের অনর্থক অহঙ্কার। মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে তাঁরা আপনাদের সব চেয়ে বড় দেখেন, অপরের স্পর্শে নিজেরা অপবিত্র হয়ে যান, তাই সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন দেবতারাও বুঝি তাই হন।” কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি দৃপ্ত স্বরে বলে উঠ্‌লেন, “ঘৃণা অবজ্ঞা উপেক্ষায় তাঁরা নীচ জাতির মন্দিরপ্রবেশদ্বার গায়ের জোরে রুদ্ধ করেছেন; কিন্তু তাঁর কৃপার দ্বার তো রুদ্ধ কর্ত্তে পারেননি! এই সব হৃদয়-হীন জাত্যভিমানীর দর্প চূর্ণ কর্‌তে যুগে যুগে তিনি আচণ্ডালকে কোল দিতে আসেন। তখন তাঁর প্রেমের বন্যায়, পতিত কাঙ্গাল, আর্ত্ত অনাথ, সমভাবে ভেসে যায়। কিন্তু সে বিশ্বপ্রেম বারে বারে দেখেও এঁদের জ্ঞানচক্ষু খুল্‌চে না, জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেন, ‘তথাপি লোকাচার’।”

আমি অনুচ্চস্বরে বল্‌লাম, “আচ্ছা, আপনার বিশুদাদার মত কত শত ধর্ম্মপ্রাণ আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র নীচ জাতের ঘরে জন্মেছেন বলে ধর্ম্মকর্ম্মের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। এদের কি কোন উপায় নেই?”

“হাঁ আছে বৈ কি? কতদিন এতবড় একটা অত্যাচার সহ্য হবে বল? উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—” মহাবাণী ঘোষিত হয়ে গেছে।

নীচ মহৎ হয়ে যাবে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হবে যাবে, প্রভুর কৃপায়। তাই এবারকার যুগাবতার ঠাকুরকে প্রতিমা ও মন্দিরের গণ্ডী থেকে বাইরে এনে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন—যাঁর যত ইচ্ছে প্রাণভরে পূজা কর?"

"কথাটা আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন কি?"

"স্বামিজী বলেছেন, জানিস তো?—

'হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যিনি তাঁর বুদ্ধ অবতারে রাজ-পুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। যাও, তাঁর নিকটে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, এবং তাঁর নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। বলি—জীবনবলি—তাদের জন্য, যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে আসেন, যাদের তিনি সকলের চেয়ে ভালবাসেন—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।'

"যাঁরা এইরূপে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করবে, তাঁদের কর্ত্তব্য কি?"

"তারা পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভগবানে বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হয়ে, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করবে। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করবে।"

"যাক্, এ সব কথা অন্য সময়ে শুনবো, তার পর যা বলছিলেন।"

"হাঁ—সেই ঘটনার পর থেকে বিশু দাদার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হ'ল। হাস্যপ্রফুল্ল বিশুদাদা গম্ভীর হ'ল। সময় সময় দেখতাম গম্ভীর চিন্তামগ্ন হয়ে উদাসনেত্রে চেয়ে থাকতো। তার পূত-চরিত্রের কথা কি বলবো—আর তখন আমিই বা কতটুকু বুঝি।

তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, আমার মত চঞ্চল বালকও তার অসীম নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে ভগবানকে ভক্তি করতে শিখেছিল। তাকে ছোটলোক চাষার ছেলে বলে যে যতই ঘৃণা করুক্ না কেন, তার চোখে চোখে পড়লে হেসে দুটী কথা কইত না, সে ক্ষুদ্র সহরে এমন লোক ছিল না বল্লেই হয়। আহা, আমাকে সে কত ভাল-বাস্‌তো, কতদিন কত ভাবে জ্বালাতন করেছি, কিন্তু সে একদিনও বিরক্তি বোধ করে নাই। রাসের সময় সেখানে খুব ধুমধাম হ'ত। যাত্রা, কথকতা, পুতুলনাচ—কত কি। আমরা দু'জনেই কথকতা শুন্‌তে ভালবাস্‌তাম; ঠাকুরও সুন্দর কথকতা কর্‌তে পারতেন। সে দিন তিনি ধ্রুবচরিত্র বলছিলেন; ভগবান্ লাভ কর্‌বার জন্য ক্ষুদ্র শিশুর তীব্র ব্যাকুলতায় গৃহত্যাগ ইত্যাদি মধুর স্বরে বল্‌ছিলেন। ধ্রুব বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আর পাগলের মত মাঝে মাঝে 'পদ্মপলাশলোচন হরি হে, একবার দেখা দাও', বলে কাতর স্বরে ডাক্‌ছে। সে বড় মধুর, সে বড় মর্ম্মস্পর্শী! কথক ঠাকুর মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর অতৃপ্ত কর্ণে সুধাবর্ষণ করে বারে বারেই ধ্রুবের সেই তীব্র ব্যাকুলতা বর্ণনা কর্‌ছিলেন। তারপর যখন সত্যসত্যই ঠাকুর এসে ধ্রুবের সম্মুখে দাঁড়ালেন, তখন চেয়ে দেখ্‌লাম, বিশু দাদার গণ্ডদ্বয়ে দরবিগলিত অশ্রুধারা! সেখান থেকে আমরা এক নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে ধ্রুবের কথাবার্ত্তা হল। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আচ্ছা, ধ্রুবের মত হরি বলে কেঁদে বনে বনে বেড়ালে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়, বিশু দাদা?"

তার বড় বড় চোখ দুটী আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—সে বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বিশ্বাস হয় না। এক একবার ইচ্ছে হয় ধ্রুবের মত বনে গিয়ে 'পদ্মপলাশলোচন হরি হে' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াই। হাঁ বনই ভাল? কি বল, সেখানে ছোটলোক বলে ঘৃণা কর্‌বার কেউ নেই।" কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বুক ফাটা স্বরে বল্‌ছে, "হরি যদি পেতে চাস আয় চলে আয়, তুই

সংসারের মায়া মমতা পায়ে দলে চলে আয়। সত্য কথা অনু—অবিশ্বাস করো না।"

"কেন জানি না বিশু দাদা, আমারও মনে হয় যেমন করেই হোক্ হরির দেখা পেতেই হবে। নইলে শান্তি পাব না। কিন্তু ভাবি—"

"কিন্তু? না, না কিন্তু কিছু নেই। তাঁর জন্য যদি সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়, তিনি দেখা দেবেনই দেবেন। পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুব যদি অত কষ্ট সহ্য করে তাঁর দেখা পেয়ে থাকে, তবে আর আমরা পাব না?—তারপর দু'জনে এমনি ধারা কত কথা হ'ল, অনেক জল্পনা কল্পনার পর স্থির হল, শেষ রাত্রেই বেরিয়ে পড়্‌ব।

রাত্রে সেই কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম;—ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা ভাল মনে নাই—যখন জ্ঞান হ'ল, চোখ মেলে দেখি তখনো অন্ধকার। পূর্ব্বদিনের সঙ্কল্পের কথা মনে হবামাত্র হৃদ্‌পিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো। পাশে ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি ঘুমিয়ে ছিল, একবার শেষ দেখা দেখ্‌বার জন্য তাকালাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পেলাম না। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শয্যাত্যাগ কর্‌লাম—আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এলাম। পশ্চিম আকাশে ম্লান চন্দ্র—তখনো কিছু রাত আছে। রাস্তায় এসে দেখি আমগাছের তলায় কে দাঁড়িয়ে, সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌লো, আর কেউ নয়—বিশু দাদা। আমায় দেখ্‌বামাত্র অগ্রসর হয়ে বল্‌লে, "তোর জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, অনু! রাত ভোর হয়ে এল, চল্।" বল্‌তে বল্‌তে বিশুদাদা অগ্রগামী হ'ল; আমিও কম্পিত পদে, স্পন্দিতবক্ষে তার পেছু পেছু চল্‌লাম। কেন যেন মন কেমন অবসন্ন হয়ে গেল। মাইল দুই তিন গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখে বল্লাম, "এসো বিশু দাদা একটু জিরিয়ে নেই।"

"না, না, পেছনে যদি লোক আসে! হয় তো তোমাদের বাড়ীর সকলে এতক্ষণ তোমার খোঁজ কর্‌ছে।"

সহসা বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌লো—মনে পড়্‌লো,

কতদিনের কত সুখময় স্মৃতি! কোথায় চলেছি, কি খাব, কে দেখ্‌বে? অবসন্ন হৃদয়ে কাতরভাবে বিশু দাদার দিকে চেয়ে বল্‌লাম, —"বিশুদাদা, চল ফিরে যাই"।

"কেন?"—বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে। লজ্জায় বেদনায় মাথা নামিয়ে অনুচ্চস্বরে বল্‌লাম, "সব্বাইকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"সব্বাইকে না ছাড়্‌লে কি হরি মেলে ভাই?—আয়, দেরী করিস্‌নি।

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "না বিশুদাদা, আমার মন কেমন করছে, আমি যেতে পার্‌বো না।"

হায়, সে বার বৎসর আগের কথা এখনো বেশ মনে পড়ে—বালসূর্য্যের কনককিরণোদ্ভাসিত তার জ্বলন্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি সে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে—আজ তুই যেমন বল্‌লি ঠিক তেমনি ভাবে বল্‌লে, "এ তোমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা।"

মর্ম্মবেদনায় দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম; বিশুদাদা স্থিরকণ্ঠে বল্‌লে "ছিঃ, এত দুর্ব্বল তুই! আগে জান্‌লে তোকে সঙ্গে আন্‌তাম না।" মুখ ফিরিয়ে বিশুদাদা চলে যায় দেখে অধীর ভাবে তার হাত জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম "তুমি যেয়ো না বিশুদাদা, চল ফিরে যাই"। ধীরে ধীরে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দ্রুত পদবিক্ষেপে চলে গেল। যতদূর দেখা যায় চেয়ে রইলাম, বিশুদাদা একটী বারও পেছন ফিরে চাইলে না।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত চৈত্রের উদ্বোধনে আমরা সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছি। উহাতে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, উক্ত অনুষ্ঠানটীকে স্থায়িত্বের সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে "প্রথমেই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ কতকটা জমি ক্রয় করা আবশ্যক। জমি পাওয়া গেলেই সদাশয় 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে বাটীনির্ম্মাণকার্য্য শুরু করা যাইতে পারে।" আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাগবাজারের যে স্থানে তিনি এই সদনুষ্ঠানের বীজ রোপণ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই পূতস্মৃতি-মণ্ডিত পল্লীতেই তন্নামধেয় "নিবেদিতা লেনের" উপরে কিঞ্চিদধিক চব্বিশসহস্র (২৪০০০৲) মুদ্রা ব্যয়ে ১৬ কাঠা পরিমাণ একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছে।

এই সমস্ত অর্থের অধিকাংশই ধার করা হইয়াছে এবং বাটীনির্ম্মাণ-কার্য্যে আরও অর্থের প্রয়োজন হইবে। সমস্ত যোগাযোগ হইলে কার্য্য আরম্ভ করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিলে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, বরং ভগবানের কার্য্য ভাবিয়া সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সাহায্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—এইমহাসত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও এই বিপুল ঋণগ্রহণরূপ দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি। এ দায়িত্ব শুধু আমাদের নহে—সমস্ত বাঙ্গালা দেশের—সমস্ত ভারতের। এ দায়িত্বভার শুধু পুরুষের নহে, নারীজাতিরও ইহাতে সমান দায়িত্ব—এমন কি অধিক। কারণ, জগতের সেই মাতৃস্থানীয়া নারীগণের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির বিকাশই এই বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই বিপুল ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমরা সহৃদয় স্বদেশবাসী নরনারীর নিকট আবেদন করিতেছি। বিগত দুর্ভিক্ষের

সময়ে যাঁহারা দুই বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে ইহা অচিরেই সম্পন্ন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা যতই সামান্য হউক, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে। (১ প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড়, হাওড়া; (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়-ভাণ্ডারে প্রাপ্তি-স্বীকার।

বিদ্যালয়ের জমির জন্য আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান স্বীকার করিতেছি :—

শ্রীহরিদাস মল্লিক, কলিকাতা	২৫৲	শ্রীরামদাস গাঙ্গুলী	১৲
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বদনগঞ্জ	২০৲	শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা	১০০৲
শ্রীমতী চারুমতী দেবী, কৃষ্ণনগর	১৲	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, রুড়কী	২৲
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, আলিগড়	১০০৲	মিঃ ডি, সি, সেনগুপ্ত, সাক্‌চী	১৲
জনৈক বন্ধু	১।০	মিঃ আর, সি, দত্ত	১৲
শ্রীচন্দ্রশেখর কর	৪৲	"মিনার্ভা", বম্বে	১০৲
শ্রীজয়শঙ্কর পীতাম্বর, পুনা	২০৲	শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ	৪৲
মিঃ পি, কৃষ্ণস্বামী, মান্দ্রাজ	২৲	সেঠ ওয়াসীমল আসোমল, মালয়দ্বীপ	১৫৲
মিঃ এন, ডি, মুদালিয়র	৫৲	ঠাকুর দাস বিঠল দাস, ঐ	১৫৲
শ্রীনন্দলাল বসু,	৫৲	মিঃ জে, রাজচেমর, ঐ	৭॥০
খুচরা আদায়	২০৲	রায়চাঁদ পুরুষোত্তম, ঐ	১৸০
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার	৭৲	মিঃ এস, এম, নারচালীয়া, ঐ	১৸০
শ্রীঅমূল্য চরণ বসু	১০৲	নাথরাম শিবরাম, ঐ	১৸০
মিঃ এস, এন, বি, কলিকাতা	১০০৲	মিঃ পি, এইচ, ওয়াদিলাল, ঐ	৮৸০
গনেন্দ্রনাথ	৪৩/০	মিঃ এল, ডি, সাংডি, ঐ	১৸০
শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত	৪৲	সর্দ্দার বিষণ সিং জী	৩॥০
জনৈকা মহিলা	১৪৬॥৵০	হোসেন, ঐ	২॥৵০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুন্সী, রংপুর	১০৲	মিঃ জি, এইচ, যোসী	৮॥০

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির আয়োজনে বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে মান্যবর জজ সার জন উডরফ কর্ত্তৃক তন্ত্র সম্বন্ধে ৬টী বক্তৃতা নিম্নলিখিত তারিখানুযায়ী শনিবার সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিষয়	তারিখ
১। তন্ত্র ও বেদ	২৪শে নবেম্বর
২। জ্ঞান ও উহার শক্তি	১লা ডিসেম্বর
৩। মায়া ও শক্তি	৮ই ,,
৪। বর্ণমালা	১৫ই ,,
৫। শক্তি উপাসনা ও সাধনা	৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮
৬। কুণ্ডলিনী যোগ	১২ই ,,

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অক্টোবর মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের ২১ জন ব্যতীত, আলোচ্য মাসে আরও ৩৯ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪২ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ৪ জন দেহত্যাগ করিয়াছে ও ১৪ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৮৩৩ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৮০ জন নূতন এবং ২২৩ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

ঐ মাসে ৩ জন রোগীকে, তাহাদের নিজ বাটীতে ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৩২৩।০ এককালীন দান ২৩৲ এবং ফলাদি বিক্রয় করিয়া ১৶১৫ হয়। মোট আয় ৩৭৭॥৶১৫। ব্যয় হিসাবে, সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ২০৯।৵৫ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে খরচ ৭৮॥৵১৫।

আশ্বাসবাণী।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

মহাপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে জগতে আসেন—জগৎকে আশ্বাসবাণী শুনাইবার জন্য। বৈদিক ঋষি শুনাইয়া গিয়াছেন,—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*　*　*　*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, সকলে শ্রবণ কর। * * আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, অজ্ঞানতমের অতীত। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধও স্বয়ং নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সংসারের সমুদয় পাপী, তাপী, জরা-রোগ-মৃত্যুক্লিষ্ট মানবকে অভয় বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন—এই আধিব্যাধিপূর্ণ সংসার অতিক্রম করিয়া জীবদ্দশায় নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলে তোমার আর কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না।

ভগবান্ শঙ্কর জীবকে শুনাইলেন—তুমি জীব নহ, তুমি শিব—তুমি অজ্ঞানবশে, অবিদ্যাবশে, মায়াবশে আপনার যথার্থ স্বরূপ না জানিয়া কষ্ট পাইতেছ। আপন স্বরূপজ্ঞান উপার্জ্জন কর—গুরুমুখে

বেদান্তের তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ কর, উহার মনন কর, উহার নিদিধ্যাসন কর—তুমি সম্যগদর্শন লাভ করিবে—তুমি শান্তি পাইবে।

আর কিঞ্চিদধিক চার শত বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবকে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার অপূর্ব্ব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দুঃখ ক্লেশ ভুলিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এখনও তদীয় ভক্ত-শিষ্যগণ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য সংসারের সব ক্লেশ ভুলিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন বর্ত্তমান যুগের কথা ভাবিয়া দেখ। এই সে দিন ভাগীরথীকূলস্থ দক্ষিণেশ্বরে যে অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়া গেল, একবার সেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী জ্ঞানপ্রেম-সমন্বয়াবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় আকুমার বৈরাগী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচনা করিয়া দেখ। তাঁহাদের পবিত্র জন্মদিন সম্মুখে আসিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র নরনারী তাঁহাদের জন্মদিনে আনন্দোৎসবে সম্মিলিত হইবে। কিসের এত আনন্দ? আনন্দ এই জন্য যে, লোকে আবার আশ্বাসবাণী পাইয়াছে আবার ইঁহারা মানবকে অমৃতের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

তুমি মায়ের ছেলে, তুমি কাহাকে ভয় কর? তুমি সিংহশাবক—নিজেকে শৃগাল মনে করিয়া কেন অনর্থক ভীত হইতেছ?—ইহাই তাঁহাদের অভয়বাণী—ইহাই তাঁহাদের আশ্বাসবাণী।

স্বামিজী বলিলেন-

Sinners? It is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, O lions and shake off the delusion that you are sheep. You are spirits free, blessed and immortal. Matter is your servant, not you the servant of matter.

পাপী পাপী কি বলিতেছ? মানুষকে পাপী বলাটাই যে পাপ! শুদ্ধ মানবাত্মার উপর ইহা যে এক স্থায়ী দোষারোপ। তোমরা সিংহ, উঠ। তোমরা মেষ—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠ। তোমরা

মুক্তাত্মা, অমৃতস্বরূপ, নিত্যানন্দময়। তোমরা জড়ের দাস নহ, জড় তোমাদের দাস।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আমরা এখন ছাড়িয়া দি—তাঁহার স্বরূপ-ধারণা আমাদের ধারণার বহু উর্দ্ধে -অতীত বলিতেও বলিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার পূতস্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়াছি। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার ভাল-বাসা আমরা লাভ করিয়াছি। এই কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি আমাদের মত মানুষ হইয়া আমাদের সুখে দুঃখে মিশিয়া আমাদের হইয়া খেলা করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে নানা কাযকর্ম্মের মধ্যে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, একটা জীবন্ত আশ্বাসবাণীরূপেই দেখিয়াছি। তিনি এক দিনের জন্য মাত্র আমাদের গীতা পড়াইয়া-ছিলেন। মনে পড়ে, সে দিন তিনি

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। "তুমি বীর তোমাতে এ ক্ষুদ্রভাব সাজে না—অভীঃ অভীঃ—ভয়শূন্য হও—ভয় নাই" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল কি স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন -- মহাপাপীকে ঘৃণা করো না—আহা, তখন মুখ হইতে যেন প্রেমের জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—যেন জগতের পাপী তাপী দুঃখী পতিতকে অনন্ত বাহুদ্বারা আলিঙ্গনে অগ্রসর হইয়াছেন!

জগৎ, এখনও কি তোমার আপনার লোক চিনিবে না? তুমি ধনী হও, দরিদ্র হও, পণ্ডিত হও, মূর্খ হও, তুমি পুণ্যাত্মা হও বা পাতকী হও, তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক একটা কঠোর সমস্যা রহিয়াছে, ঘোর অস্বস্তি রহিয়াছে। আর কতকাল সামাজিক কপট জীবন যাপন করিবে? ভাবের ঘরে চুরি ছাড়, মন মুখ এক কর —তোমায় আর কোন সাধন, আর কোন যোগযাগ করিতে হইবে না। তখন তুমি মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইবে।

যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহা এক দিন মগধরাজ্যে উদ্ভবলাভ করিয়া সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, যাহা কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় অর্জ্জুনের নিকট বিঘোষিত হইয়াছিল, যাহা কেরল দেশ হইতে আসিয়া ভারত প্লাবিত করিয়াছিল, যাহা নদীয়া হইতে আসিয়া ভারত মাতাইয়াছিল, যাহা নাজারথ হইতে সমগ্র জগতে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই বাণী আবার উচ্চারিত হইয়াছে—আবার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—যাহার ইচ্ছা এস— জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উঠ, জাগ, সেই চরম লক্ষ্যে না পঁহুছিয়া ক্ষান্ত হইও না। সামাজিক সমস্যা দুদিনের জন্য, রাজনীতির কোলাহল ক্ষণিক—এ সকল ছাড়াইয়া অনন্ত-সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি হইয়া—ইহলোক পরলোকের ব্যবধান ঘুচাইয়া অনন্ত পথে যাত্রা কর। ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষাদ্বেষি পুঁটুলি করিয়া দূরে, অতি দূরে ফেলিয়া দাও—এ অমৃতের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য—এখানে কেবল আনন্দ, আনন্দ।

মহাপুরুষেরা আসেন ক্ষণেকের জন্য আবরণ উন্মোচন করিতে, যবনিকা অপসারণ করিতে—এ সময়ে পাণ্ডিত্য আভিজাত্য ধনৈশ্বর্য্য ইত্যাদির অভিমানে অন্ধ না হইয়া তাঁহাদের প্রচারিত ভাবস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারিলে গন্তব্য স্থানে পঁহুছান অতি সুগম হয়। অতএব আর কালবিলম্ব করিও না।

বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইলেও সকল মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী একই প্রকার। দার্শনিক বিচার, শব্দের কচকচি যাহাতে বিরোধ বাধে, সে সকল পরে আসে—কিন্তু যথার্থ মহাপুরুষকে বাক্যের সাহায্যও লইতে হয় না—তাঁহার হৃদয় সাক্ষাৎ-ভাবে অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। তাঁহারা আজীবন নিভৃত গিরিগুহাবাসী হইলেও বাক্যবাগীশ বহু উদ্দাম বক্তা হইতে, শব্দ বিন্যাসকুশল বহু সুলেখক হইতে, তাঁহাদের অন্তরের মর্ম্মবাণী নীরবতার অপূর্ব্ব ভাষায় হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করে।

উহাতে বিশ্বসংসারের বাসনা, ভাবনা, আসক্তি ভুলাইয়া দেয়—কিন্তু সকলকেই আপনার করিয়া তোলে। মায়ামুগ্ধমানব মহাপুরুষের তত্ত্ব বুঝে না—তাই তাহারা

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।

তাঁহারা যে কোন্ ভাবের প্রেরণায় কখনও 'বজ্রাদপি কঠোরাণি,' আবার কখনও 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হন, তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সকল অবস্থায়, সকল ভাবেই যে জীবের কল্যাণকামনায় তাঁহাদের হৃদয় ভরপুর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু যে বলিয়াছিলেন,

আমার ধর নিতাই
প্রাণ আজ আমার করে কেমন
জীবে হরিনাম বিলাতে উঠ্‌লো তুফান প্রেমনদীতে
এখন জীবের দুঃখে আমার হৃদয় বিদরিয়া যায়।

ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতি সত্য কথা। রামানুজ গোপুরমের উপরে উঠিয়া সর্ব্বসাধারণকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র শুনাইতে কেন ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন যীশু বলিয়াছিলেন,—

Come unto me all ye that labour and are heavily laden and I will give you rest.—

কেন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

কেন বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, সমগ্র জগতের পাপ তাপ আমার উপর পড়ুক—জগতের লোক সুস্থ, নিরাময়, নিষ্পাপ হউক?

যাঁহারা বাহির হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ দেখিয়া মহাপুরুষজীবন আলোচনা করেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের হৃদয়ে যে এক সুর বাজিতেছে, সেইটী ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের জীবন বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয়

সুতরাং মহাপুরুষকে যদি চিনিতে চাও, তবে তাঁহাদের হৃদয়ের সেই এক সুরকে চিনিবার বুঝিবার চেষ্টা কর—তাঁহাদের জীবনের, সমুদয় রহস্য তোমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া আসিবে।

অত চিনিবার বুঝিবারই বা প্রয়াস কেন? তোমার জীবনের সমস্যাটা কি? তুমি একটা গোলে পড়িয়াছ, তুমি একটা দুরবস্থায় পড়িয়াছ, তুমি, সেই ভাবুক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়, তোমার মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ, ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়াছ।

Life is a sleep and forgetting
The soul that rises with us, our life's start
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar

মহাপুরুষ আসেন—তোমার সেই ভ্রান্তি দূর করিতে, তোমার সেই ঘুমের ঘোর কাটাইয়া তোমাকে জাগাইতে। যখনই তুমি জাগিলে, তখনই তোমার সব গোল মিটিয়া গেল, জীবনের দ্বন্দ্ব অবসান হইল—তুমি মুক্ত হইলে, তুমি সকল জ্বালা এড়াইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলে।

মানুষের পুরুষকার আছে—মানুষ চেষ্টা করে—প্রবৃত্তির হাত এড়াইতে, রিপুগণকে সংযত করিতে, সৎপথে বিচরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। মানুষ কত জপ তপ করে, কত তপস্যা করে, কত প্রাণায়াম, কত নিষ্ঠা, কত ব্রত, কত সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল চেষ্টা করিতে করিতে আবার সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে—

"জপ করে যে তোমায় পাওয়া সেটা কেবল ভূতের সাঙ্গা"

তখন মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী সে দিব্যকর্ণে শুনিতে পায় কিসের চেষ্টা করিতেছ? কেন ভিখারীর মত হারানিধির অন্বেষণে বেড়াইতেছ? স্বয়ং রাজা হইয়া আপনাকে রাজ্যভ্রষ্ট মনে করিয়া কেন অনর্থক কষ্ট পাইতেছ? সিংহশাবক হইয়া কেন আপনাকে মেষ মনে করিয়া ভীত হইতেছ? তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে

না—কেবল নিজেকে নিজে বুঝিতে হইবে, নিজেকে নিজে জানিতে হইবে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ

নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন কর—নিজেকে অবসন্ন করিও না।

সাধারণতঃ নীতিবাদীদের শিক্ষানুযায়ী আমরা এক একটী দোষকে সংশোধন করিয়া এক একটী গুণ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু একটা দোষ কতকটা সংশোধন হইতে না হইতে কোথা হইতে শত শত দোষ আসিয়া জুটে তাহাদিগকে তাড়াইতে গিয়া, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া একা মন বিব্রত হইয়া উঠে। কামকে তাড়াইলাম, ক্রোধ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল—ক্রোধকে দূর করিতে না করিতে লোভ দেখা দিল। আবার লোভ একটু সংযত হইয়াছে ত অমনি 'আমি সাধু, আমি ধার্ম্মিক'—ইত্যাকার অভিমান আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করিল। এখন কত দিক্ সামলাইবে? তাই বলি, মহাপুরুষগণের বাক্য অনুসরণ করিয়া হৃদয়টাকে একেবারে উচ্চভূমিতে আরোহণ করাও দেখি, দেখিবে, নীচ বাসনা নীচ ভাব সব এককালে দূর হইয়াছে তুমি যেন মর্ত্ত্যভূমি হইতে উন্নীত হইয়া একেবারে অমরধামে উপনীত হইয়াছ, বোধ করিবে। এ কাব্যকল্পনা নয়, সাধনরাজ্যের কঠোর সত্য।

তাই বলি, মহাপুরুষদের আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিতে শিখ—জানিয়া রাখ, তাঁহারা অমররাজ্য হইতে এই মরজগতে আনন্দসন্দেশ বহন করিয়া আনিতেছেন তাঁহারা ঈশ্বরের মূর্ত্ত রূপ। ঈশ্বর মর্ত্ত্যলোকে মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হন, মর্ত্ত্য নরনারীকে মররাজ্য হইতে তুলিয়া নিজ পদবীতে আরোহণ করাইবার জন্য।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

সংশয় বর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজের অজ্ঞতা দূর করিয়া জ্ঞান লাভ কর।

বিশ্বাস, বিশ্বাস—জ্বলন্ত বিশ্বাস। পাপ, অবনতি, পতন—এ সকল চক্ষের সমক্ষে শত সহস্র হইতে দেখিলেও বিশ্বাস হারাইও না।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—এই বেদবাণীকে মিথ্যা মনে করিও না। যদি জগতের সকল সাধুর উপর, সকল ভক্তের উপর, সকল মহাপুরুষের উপর তোমার সন্দেহ আসে—তথাপি যাঁহা হইতে সকল সাধুত্ব, সকল ভক্তি, সকল মহত্ত্বের উদ্ভব, সেই তোমার অন্তর্যামী হৃদয়দেবতার মহিমার উপর বিশ্বাস হারাইও না। একবার তাঁহার সঙ্গে সম্মিলন হইলে তুমিই মহাপুরুষ হইয়া বহু লোকের হৃদয়ে আশ্বাসবাণী দিবে—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তোমার জীবন সমুদ্রে আলোক-স্তম্ভের মত শত শত যাত্রীকে আলোকপ্রদান করিবে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

আর একটী ঘটনা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। উহা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে তাঁহার চকিত দর্শন লাভ। রাত্রিকাল; স্বামিজী ও আর একজন কাশীপুরের বাটীর বাহিরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। যে শোক তৎকালে তাঁহাদের হৃদয়কে দুর্ব্বিসহ ভারাক্রান্ত করিয়াছিল, তাঁহারা নিঃসন্দেহ তাহারই প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। মাত্র কয়েক দিন হইল তাঁহাদের আচার্য্যদেব তাঁহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সহসা স্বামিজী দেখিলেন, একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। .... কয়েক মিনিট পরে তাঁহার বন্ধু রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি দেখিলাম? ও কি দেখিলাম?"

দুই ব্যক্তির একই সময়ে কোন ছায়ামূর্ত্তি দেখার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছিল।

যিনি এবম্প্রকার অনুভূতিসকল লাভ করেন, তাঁহার মনের মধ্যে উহারা সহজেই কতকগুলি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিয়া থাকে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে "থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক" হইতে লিখিত একখানি পত্রে স্বামিজী উক্ত বিশ্বাসগুলির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, কেন হিন্দুগণ মানুষকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া থাকেন। ... . পরলোকবাসিগণই একমাত্র তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী, কিন্তু তাহারাও অপর একটী সূক্ষ্ম দেহধারী মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং তাহাও হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ। তাহারা এই পৃথিবীতেই অপর কোন আকাশে বাস করে, এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে, এবং আমাদের ন্যায় তাহাদেরও মন ইত্যাদি সমস্ত আছে। সুতরাং তাহারাও মানুষ। দেবগণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয়, অন্যান্য সকলে পুনরায় মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে।

যাঁহারা আমাদের আচার্য্যদেবকে আপ্তপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত উক্তিসকলের একটী নিজস্ব মূল্য থাকিবে। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে, যেখানে স্বামিজী শুধু একটী অনুমান বা শুধু একটী মত প্রকাশ করিতেছেন, সেখানেও উহার মূলে কোন না কোন অনন্যসাধারণ উপলব্ধি নিহিত আছে।

যখন তাঁহার আমেরিকার প্রথম বারের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, প্রথমে তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ্ অকাতরে দান করার পর তিনি এখন উহাদিগের বিশালতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহাদের বিশেষত্বগুলি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে এখন উহাদিগকে

কয়েকটী মুখ্য চিন্তাসূত্র একত্র গ্রথিত ও সংহত করা চলে। একবার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই তিনি সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন যে, দেহান্তে আত্মার গতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বেদান্ত সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইতেই পারে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার প্রথমবার ইংলণ্ড আগমনকালে তিনি জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম্মমতকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিতে হইলে উহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে তিনি অবহিত আছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দুই জন যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায়, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যুবকদ্বয় সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, "যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিক হইতে ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন এবং অলৌকিক রহস্যাদির দিকও মাড়ান না।" তিনি লিখিয়াছিলেন, "ইহা আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। সাধারণ লোকের জন্য কিছু না কিছু অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে সচরাচর ধর্ম্ম বলিতে লোকে শুধু প্রতীকাদি ও কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা স্থূলাকারপ্রাপ্ত দর্শনকেই বুঝিয়া থাকে। কেবল শুষ্ক দর্শন মানবের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।"

এইরূপে তাঁহার মধ্যে যে সংগঠনা কল্পনা (যাহা শুধু ভাঙ্গে না, নূতন কিছু গড়িতে চায়) উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সেই বন্ধুকেই লিখিত পরবর্ত্তী দুই তিনখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার একখানিতে জনৈক বিখ্যাত তড়িত্তত্ত্ববিদের সহিত কথোপকথনজনিত মানসিক উত্তেজনা তাঁহার তখনও রহিয়াছে—তিনি প্রাণ ও জড়ের সম্বন্ধরূপ সমগ্র সমস্যাটীকে খণ্ডন করিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কি শিখিতে পারা যায় তাহারও একটী সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছেন। পত্রখানি পড়িলেই সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের বন্ধু বেদান্তোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্ব শ্রবণে

মুগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার মতে একমাত্র এই সকল মতই আধুনিক বিজ্ঞানের গ্রাহ্য। আবার প্রাণ ও আকাশ উভয়েই সমষ্টিমহৎ বা ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। তিনি মনে করেন যে, তিনি গণিতশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, প্রাণ ও জড়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। আগামী সপ্তাহে আমি তাঁহার নিকট গিয়া ঐ নূতন গণিতের প্রমাণটী দেখিয়া আসিব. এইরূপ কথা আছে।

"তাহা হইলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। আমি এক্ষণে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এবং একটী সরলভাবে প্রতিপাদিত হইলেই অপরটীও হইয়া যাইবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি গ্রন্থ লিখিবার আমার ইচ্ছা আছে। তাহার প্রথম অধ্যায় সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক হইবে, এবং উহাতে বৈদান্তিক মতসমূহ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইবে।

ব্রহ্ম = The Absolute.

মহৎ বা ঈশ্বর = Primal Creative Energy.

প্রাণ আকাশ = Force and Matter.

"জীবাত্মার গতি কেবল অদ্বৈতবাদ দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন যে, জীবাত্মা মৃত্যুর পর যথাক্রমে সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও বৈদ্যুতলোকে গমন করেন। তথা হইতে এক অমানব পুরুষ উঁহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। (অদ্বৈতবাদী বলেন, তথা হইতে তিনি নির্ব্বাণ পদবী লাভ করেন।)

"অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, আত্মা আসেনও না, যানও না, এবং এই সকল লোক বা জগতের বিভিন্ন স্তর কেবল আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন ফলস্বরূপ। অর্থাৎ, সর্ব্বনিম্ন বা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল লোক—সূর্য্য-লোক; উহাতে প্রাণ জড়শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, আকাশ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়পদার্থরূপে। ইহার পরে চন্দ্রলোক, উহা সূর্য্যলোককে

বেষ্টন করিয়া আছে। এতদ্বারা আদৌ চন্দ্র বুঝায় না— দেবতাদিগের আবাস বুঝায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রারূপে প্রকাশ পায়। তাহারও পরে বৈদ্যুত-লোক, অর্থাৎ একটী অবস্থা যেখানে প্রাণ আকাশ হইতে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, আর বিদ্যুৎ প্রাণ না জড়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তাহার পর ব্রহ্মলোক, যাহার প্রাণ বা আকাশ কিছুই নাই, উভয়েই মহৎ বা আদিশক্তিতে লীন হইয়া আছে। এইখানে প্রাণ, আকাশ কিছুই না থাকায় জীব সমগ্র জগৎকে সমষ্টিমহৎরূপে ভাবনা করেন। ইহা বৈরাজপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি ইহা ব্রহ্ম নহে, কারণ তখনও বহুত্ব রহিয়াছে। তথা হইতে জীব সেই একত্বে পৌঁছান, যাহা চরম লক্ষ্য। অদ্বৈতবাদ বলে যে, এই সকল জীবের মনে ক্রমান্বয়ে উদিত কল্পনা মাত্র; জীব স্বয়ং আসেন না যানও না; এইরূপেই বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, কেবল একটাতে বিকাশ, অপরটাতে সঙ্কোচ বুঝায়।

"এখন, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাহার নিজের জগৎটাই দেখিতে পায়, সেইহেতু সে জগৎ তাহার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়—যদিও অপর যাহারা বদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে উহা বর্ত্তমান থাকে। নামরূপ লইয়াই জগৎ। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ কেবল ততক্ষণই তরঙ্গ, যতক্ষণ উহা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন থাকে। তরঙ্গ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সমুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু তখন ঐ নামরূপ তৎক্ষণাৎ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং যে জল নামরূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল তাহা ব্যতীত তরঙ্গের ঐ নামরূপ থাকিতেই পারে না, কিন্তু নামরূপ কিছু তরঙ্গ নয়। তরঙ্গ জলে মিশিয়া যাইলেই ঐ নামরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য তরঙ্গের সম্বন্ধে অপরাপর নামরূপ তখনও বর্ত্তমান থাকে। এই নামরূপই মায়া, আর ঐ জল ব্রহ্ম। তরঙ্গ সর্ব্বদা জল ছাড়া অপর

কিছুই ছিল না, তথাপি যতক্ষণ উহা তরঙ্গ পদবাচ্য ছিল ততক্ষণ উহার নামরূপও ছিল। আবার ঐ নামরূপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তরঙ্গ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না, যদিও জলাকারে ঐ তরঙ্গ অনন্তকাল নামরূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু যেহেতু নামরূপকে পৃথক করা যায় না, সেহহেতু তাহারা সৎ একথা বলা যায় না। তথাপি তাহারা শূন্য নহে। ইহাই মায়া।

"আমি এইগুলিকে সাবধানে বিস্তারিত করিতে চাই, কিন্তু আমি যে ঠিক পথে চলিয়াছি, তাহা আপনি নিমেষেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার জন্য আমাকে শারীরবিজ্ঞান আরও বেশী করিয়া পড়িয়া উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির কাহার কতটুকু ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমি এখন স্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে আর হাবজা গোবজা কিছু নাই।"

আবার এই পত্রখানিতে, অন্যান্য বহু স্থলের ন্যায়, আমরা স্বামিজীর প্রতিভার সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিধায়িনী শক্তির পরিচয় পাই। আচার্য্য শঙ্কর যে উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার নড়চড় হইতে দেওয়া হইবে না। "আত্মা আসেনও না, যানও না"—এই বাক্য চিরকালের জন্য সত্য থাকিবে, এবং অপর সকল সত্যের উপর আধিপত্য করিবে। কিন্তু যাঁহারা অপর প্রান্ত হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরিশ্রমও বৃথা যাইবে না। অদ্বৈতবাদীর দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি, এবং দ্বৈতবাদীর মনের পূর্ব্বাপর অবস্থাসমূহকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য করিয়া যাওয়া—এদুইটীই পরস্পরের এবং নূতন ধর্ম্মব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক।*

* স্বামিজীর প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেগুলি পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি এস্থলে যে সকল ভাবের পূর্ব্ব

কিন্তু মৃত্যু জিনিষটাকে বাহির হইতে দেখিলেই তবে উহাকে ঠিক চিনিতে পারা যায়। নিজ আত্মীয়বিচ্ছেদে আমরা এই চিরন্তন নিয়তির মহাসত্যগুলিকে তত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না, যেমন গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসাপ্রণোদিত হইয়া আমরা অপরের দুঃখে আমাদের সহানুভূতিটাকে জলন্তভাবে চিত্রিত করিতে গেলে দেখিতে পাই। যে সান্ত্বনার উপর আমরা নিজেদের বেলায় নির্ভর করিতে সাহসী হই না, তাহা অপরের জন্য অন্বেষণ করিতে গেলে মধ্যাহ্নতপনের ন্যায় স্পষ্ট, দৃঢ় বিশ্বাসরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামিজীও যে এই নিয়মের পার ছিলেন তাহা নয়, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। পত্রখানি তিনি যাঁহাকে "ধীরা-মাতা" বলিতেন সেই আমেরিকাবাসিনী মহিলাকে তাঁহার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। ইহাতে আমরা তাঁহার সার বিশ্বাসটুকু আত্মীয়তা ও সহানুভূতি দ্বারা সঞ্জীবিত দেখিতে পাই এবং উহা হইতে আমাদের প্রিয়জনেরাও মৃত্যুর পর কিরূপ গতি লাভ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও কতকটা আভাস প্রাপ্ত হই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্রুকলীন হইতে এই শোকসন্তপ্ত মহিলাটীকে লিখিতেছেন, "আপনার পিতা যে জীর্ণ শরীর ত্যাগ ক'রবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, আর যখন কোন ভাবী অপ্রিয় মায়া-তরঙ্গ কাহাকেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহাকে পত্র লেখা আমার রীতি নহে। কিন্তু এইগুলিই জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ, এবং আমি জানি, আপনি বিচলিত হন নাই সমুদ্রের উপরিভাগ পর্য্যায়ক্রমে উঠিতেছে ও নামিতেছে, কিন্তু যিনি সাক্ষিস্বরূপ, আনন্দময়ের সন্তান, তাঁহার নিকট প্রত্যেক পতন সমুদ্রের গভীরতা এবং তাহার তলদেশে

সূচনা দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তখনও চিন্তা করিতেছেন। "ব্রহ্ম ও মায়া" "বহির্জ্জগৎ এবং তাঁহার আমেরিকায় প্রদ, 'মানবের যথার্থস্বরূপ" এবং "সৃষ্টিতত্ত্ব" —এই বক্তৃতা-গুলি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

যে অসংখ্য মণি-মাণিক্য প্রবালাদি সঞ্চিত আছে, তাহাই অধিকতর-রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। আসা যাওয়া নিরবচ্ছিন্ন ভ্রম মাত্র। আত্মা কখনও যানও না আসেনও না। যখন সমগ্র দেশই আত্মার ভিতরে তখন এমন স্থান কোথায় যেখানে আত্মা যাইতে পারেন? যখন সমগ্র কালই আত্মার ভিতরে তখন এমন সময় কখন হইবে, যখন তিনি শরীরে প্রবেশ এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন?

"পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু সূর্য্য স্থির আছেন। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া গতিশীল, পরিবর্ত্তনশীল,—আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিতেছেন, এই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন, আর সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্থির অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জ্ঞানামৃত পান করিতেছেন। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকল আত্মাই বর্ত্তমান কালে, এবং একটা জড় উদাহরণ গ্রহণ করিলে—সকলে একই জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত। যেহেতু আত্মার দেশ বোধ নাই, সেই হেতু যাহা কিছু আমাদের ছিল, আছে এবং হইবে, সমস্তই সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, সর্ব্বদা সঙ্গে ছিল, এবং সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিবে। আমরা তাহাদের ভিতরে, তাহারা আমাদের ভিতরে।

"ধর কতকগুলি গোলাকার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। যদিও প্রত্যেকে পৃথক, তথাপি সকলেই কথিতে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ঐখানে তাহারা এক। প্রত্যেক এক একটা স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি সকলে কথ মেরু-রেখায় এক। কেহই ঐ মেরুরেখা হইতে সরিয়া যাইতে পারে না, এবং উহাদের কোনটা যতই মেরুরেখা হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করুক না কেন, তথাপি মেরুরেখায় দণ্ডায়মান হইয়া আমরা প্রকোষ্ঠগুলির যে কোনটাতে প্রবেশ করিতে পারি। এই মেরুরেখাই ঈশ্বর। ঐখানে আমরা তাঁহার সহিত এক, সকলেই পরস্পরের মধ্যে এবং সকলেই ঈশ্বরে রহিয়াছে।

"চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিয়া যায়, ভ্রম হয় যেন চাঁদ চলিয়া

যাইতেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ ও জড়পদার্থ গতিশীল, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যেন আত্মা গতিশীল। এইরূপে আমরা অবশেষে দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতির কি উচ্চ, কি নীচ, সকল লোকেই যে সহজাত সংস্কার (না, দৈবপ্রেরণা ? বশে মৃতব্যক্তিগণ কখন কখনও নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া অনুভব করে, তাহা বিচারের দিক হইতেই সত্য।

"প্রত্যেক আত্মা এক একটা নক্ষত্র, এবং সকল নক্ষত্র ঈশ্বররূপী সেই অনন্ত নীলিমার, সেই অনাদি অনন্ত আকাশে খচিত রহিয়াছে। ঐ খানেই প্রত্যেকের এবং সকলের মূল, যথার্থ সত্তা, এবং যথার্থ ব্যক্তিত্ব। এই নক্ষত্রসমূহের মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্রবালের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে অন্বেষণ করাতেই ধর্ম্মের সূত্রপাত, এবং তাহাদের সকলকে ঈশ্বরে এবং আমাদিগকেও সেই স্থলেই দেখিতে পাওয়া—ইহাই ধর্ম্মের শেষ। সুতরাং সমগ্র রহস্য এই যে, আপনার পিতা পরিহিত জীর্ণ বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিয়াছেন, এবং যেখানে তিনি অনাদি অনন্ত কাল হইতে আছেন, সেই খানেই দণ্ডায়মান আছেন। এই জগতে বা অপর কোন জগতে তিনি ঐরূপ আর একখানি বস্ত্র প্রকট করিবেন কিনা? আমার আন্তরিক প্রার্থনা তিনি যেন না করেন যতদিন না তিনি উহা পূর্ণজ্ঞানের সহিত করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কেহ নিজ কৃতকর্ম্মের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা কোথাও বলপূর্ব্বক নীত না হয়। প্রার্থনা কর, যেন সকলেই মুক্ত হয়, অর্থাৎ জানিতে পারে যে তাহারা মুক্তই আছে। আর যদি তাহাদিগকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিতে হয়, তবে আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি, যেন তাহাদের স্বপ্ন শান্তি ও আনন্দেরই স্বপ্ন হয়।"

মায়া।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী)

মিথ্যাজ্ঞানের নামই মায়া।

শ্রুতি "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন"—এখানে বহু নাই, সবই এক, 'মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—কেবল মায়ার জন্যই বহুজ্ঞান হয়, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—যে বহু দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, "যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি" -যে ব্রাহ্মণাদি জগতে আত্মদর্শন করে না এবং সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সৎ বিবেচনা করে, সেই মিথ্যাদর্শীকে সেই মিথ্যাদৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি জগৎ পরাভব করে,ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বহুজ্ঞানকে মিথ্যা এবং মায়াকেই উক্ত বহুজ্ঞানের কারণ বলায় মিথ্যাজ্ঞানকেই মায়া বলা যায়। এতদ্ভিন্ন শ্রুতি "ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্"—আদিতে ব্রহ্মই ছিলেন এবং অন্তেও কেবল তিনিই থাকিবেন, "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ"—যে ব্যক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দর্শন করে, তাহাকে সেই পদার্থ সকল পরাস্ত করিয়া থাকে, এই দুই বাক্যেও ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহার আদ্যন্ত ব্রহ্ম, তাহার মধ্যও ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান মিথ্যা বলিয়া, যে ব্যক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দেখে, সে কেবল মিথ্যাই দেখিয়া থাকে এবং অমৃতত্বের অভাবে মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান যখন মিথ্যা. এবং যখন মায়ার জন্যই উক্ত মিথ্যাবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে. তখন অবশ্য মিথ্যাজ্ঞানই মায়া।

এই মায়া বা মিথ্যাজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি, অপরটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি। মায়া যে শক্তির দ্বারা

ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, সেই শক্তির নাম আবরণ শক্তি ; এবং যে শক্তির দ্বারা মিথ্যা জাগতিক পদার্থসমূহের কল্পনা করে, সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ অর্থাৎ কল্পনা শক্তি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ যথা—"বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ"—বিক্ষেপ শক্তির দ্বারাই মিথ্যা জাগতিক পদার্থ সমুদয় কল্পিত হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন, 'মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা" —এই মায়া মৎ-কর্তৃক সৃষ্টা হইয়াছে। আবার শ্রুতিও "য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ"—এক অদ্বিতীয় মায়াবী মহেশ্বর সমস্ত লোককে স্বীয় মায়া শক্তির দ্বারা শাসিত করেন, এই বাক্যে মায়াকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং মায়া যখন ব্রহ্মেরই শক্তি, অথবা ব্রহ্মের শক্তির নামই যখন মায়া, তখন আর মায়াকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব বলিতে পারা যায় না ; এবং মায়ার নিরপেক্ষ অস্তিত্বও নাই। কারণ, "শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্নাস্তি" শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অথবা "শক্তিশক্তি-মতোরভেদঃ"—শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ।

যদিও ব্রহ্ম ও মায়া অনন্য, তথাপি ব্রহ্মে কিন্তু মায়া নাই—ব্রহ্ম মায়াতীত। কারণ, শ্রুতি মায়াকল্পিত পদার্থসমূহকে "বাচারম্ভণং" বাক্যের আড়ম্বর অর্থাৎ কেবল কথা বা নাম মাত্র বলিয়া-ছেন ; সুতরাং কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি নামরূপ যেমন সুবর্ণে থাকিয়াও সুবর্ণের সুবর্ণত্বের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না, মায়াও তদ্রূপ নিত্যকাল ব্রহ্মে থাকিয়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না—ব্রহ্মের কূটস্থ অবস্থার অল্প মাত্রও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ"—এই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা অসঙ্গস্বভাব। ভগবান্ও বলিয়াছেন, "অবিকার্য্যোহয়-মুচ্যতে"—আত্মা অবিকার্য্য।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি যখন মায়া শক্তির কার্য্যকেই "কেবল কথা বা নাম মাত্র" বলিয়াছেন, তখন আর কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এস্থলে সাধু নহে ; কারণ, মায়া ত

আছেই। সুতরাং তদুত্তর এই যে, কেবল নামরূপই যে শক্তির কার্য্য, অর্থাৎ যে শক্তি "কেবল নামরূপ" ছাড়া তত্ত্বতঃ আর কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অথবা কার্য্যান্ত-কালে আর থাকে না; যেমন সাগরে তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার শক্তি পূর্ব্বোক্ত ছিল না এবং পরেও থাকে না। সুতরাং কার্য্যকালে ই হউক আর তৎপূর্ব্বে বা পরেই হউক, মায়া কোনও কালে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেই জন্যই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বকালে ও সৃষ্টিকালে অর্থাৎ উভয় কালেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়াছেন। অতএব, যাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকে না, তাহা মধ্যে জ্ঞানের বিষয় হইলেও সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক বলিয়া, মিথ্যাজ্ঞানের নামই মায়া। সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন, "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" অর্থাৎ যাহার আদি ও অন্ত অব্যক্ত, তাহার মধ্যও অব্যক্ত; তবে যে মধ্যাবস্থা ব্যক্ত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক; অতএব হে ভারত, মিথ্যা বিষয়ের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া শোক করিতেছ কেন?

মায়ার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। সেই জন্যই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন "ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা"—যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় তাহাই মায়া। বাস্তবিক যাহা অজ্ঞানাবস্থায় বস্তুর ন্যায় সাবয়ব ও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানাবস্থায় আর থাকে না, তাহাকে কি প্রকারে নির্ব্বচন করা যাইবে? অতএব বেদান্ত-সার বলিয়াছেন, "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্ব-চনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ"—অজ্ঞান সদসৎ হইতে ভিন্ন, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী এবং যৎকিঞ্চিৎ ভাবরূপী অনির্ব্বচনীয় কোন কিছু। অজ্ঞান অর্থে "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানাভাব নহে। কারণ, জ্ঞান শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহা যে "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" নহে,

তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। শাস্ত্রে চৈতন্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বলে; আবার জ্ঞানকে আত্মগুণও বলা যায়। এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রথমতঃ যে চৈতন্যকে জ্ঞান বলা যায়, তাহা নিত্য নিরবয়ব চৈতন্যের নিত্য সহচর বলিয়া কস্মিন্ কালেও তাহার অভাব স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিবৃত্তিকে যে জ্ঞান বলা যায়, তাহা বাস্তবপক্ষে জ্ঞান নহে। কেন না, উহা যখন চৈতন্যব্যাপ্ত হইয়াই বস্তুর প্রকাশক হয়, অর্থাৎ উহা যখন চৈতন্য ছাড়িয়া স্বয়ং কিছুই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, তখন উহা জড়; সুতরাং যাহা জড়, তাহা জ্ঞান নহে। অতএব, বুদ্ধির অভাবও প্রকৃত জ্ঞানাভাব নহে। তৃতীয়তঃ আত্মগুণকে যে জ্ঞান বলা যায়, তাহারও একবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ, যখনই বলা যাইবে "আমি অজ্ঞান ছিলাম—কিছুই জানিতেছিলাম না" তখনই জ্ঞান থাকাও প্রমাণিত হইবে; ইহা একটী অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। বাস্তবিক, অননুভূত বিষয়ের কখনও স্মৃতি হইতে পারে না; কারণ, স্মৃতি শব্দের অর্থ ই—"পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় অবিদ্যমানে পরে স্মরণ।" সুতরাং অজ্ঞানের স্মৃতিই তাৎকালিক জ্ঞান থাকার প্রমাণ বলিয়া, জ্ঞানাভাব আদৌ অস্বীকার্য্য। অতএব অজ্ঞান অর্থে "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানাভাব নহে। পূর্ব্বে যে মিথ্যা জ্ঞানকে মায়া বলা হইয়াছে, উহা সেই মিথ্যাজ্ঞান। জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাবিষয়ক। ইহাই মায়ার সেই আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। একটী ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপকে আবৃত করে, অপরটী ঐ অবকাশে সেই স্থানে মিথ্যা জাগতিক পদার্থসমূহ কল্পনা করিয়া জ্ঞানকে মহাভ্রমে পাতিত করে।

শ্রুতির "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—ব্রহ্ম স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন, এবং "অহমবিক্রিয়ঃ"—ব্রহ্ম বিকাররহিত, এই দুই বাক্যে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, বিবর্ত্তবাদই শ্রুতির অনুমোদিত। কারণ কার্য্য দুই প্রকার—বিকার্য্য ও বিবর্ত্ত। কারণ স্বরূপচ্যুত হইয়া যে কার্য্য জন্মায়, সেই কার্য্যের নাম বিকার্য্য এবং স্বরূপচ্যুত না হইয়া যে

কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই কার্য্যের নাম বিবর্ত্ত—"সতত্ত্বতোঽন্যথা-প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥" দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, এবং সমুদ্র তরঙ্গ হয়, তাহা বিবর্ত্ত। অতএব, জগৎকারণ ব্রহ্ম যখন স্বয়ং এই জগৎ হইয়াও বিকারগ্রস্ত হন না—তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না, তখন অবশ্য শ্রুতি মতে ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত স্থলে রজ্জু-সর্পকে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মত কখনই শ্রুতির অনুমোদিত নহে। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মে ভ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "পরোরজঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানতিমিরের অতীত বলিযাছেন, তখন আর রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইতে পারে না; অর্থাৎ ব্রহ্মে কখনও ভ্রম থাকিতে পারে না। পঞ্চদশীকার বিবর্ত্তবাদ বুঝাইতে প্রথমতঃ যে "অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ"—স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তর জ্ঞান হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়; যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয, বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতির অনুমোদিত নহে; পরন্তু তিনি যে তৎপরে বলিয়াছেন "মৃদ্রূপস্যাপরিত্যাগাৎ বিবর্ত্তত্বং ঘটে স্থিতম্। মৃৎ সুবর্ণে নিবর্ত্তেতে ঘটকুণ্ডলয়োর্হি"- মৃত্তিকা রূপের অপরিত্যাগ হেতু ঘট মৃত্তিকার বিবর্ত্ত ইহা বলা যায়, ঘট ও কুণ্ডল, মৃত্তিকা ও সুবর্ণের বিবর্ত্ত-কার্য্য; এই জন্যই তাহাতে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের পূর্ব্বরূপ ত্যাগ হয় না, ইহাই শ্রুতির অনুমোদিত। আর শিষ্টদিগের রীতি অনুসারে যখন শেষ মতই বক্তার অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, তখন অবশ্য শেষোক্ত মতই পঞ্চদশীকারের। বাস্তবিক রজ্জুতে সর্পভ্রমরূপ বিবর্ত্তকার্য্য যে পঞ্চদশীকারের আদৌ অভিপ্রেত নহে তাহা তাঁহার "এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে"—তাহাতে মৃত্তিকাদির বিবর্ত্ত দৃষ্টান্ত বিষয়ে কোন হানি নাই, এবং "অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ। অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা"—শ্রুতিতে আছে, এই জগতের নামরূপ আমি প্রপঞ্চিত করি; সৃষ্টির

পূর্ব্বে অব্যক্ত যে ঈশ্বরশক্তি, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশিত হইয়া নাম ও রূপ এই দুই প্রকার হয়, এই দুই বাক্যে স্পষ্ট অনুমিত হয়। শ্রুতি মতে সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে বিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তবে যে উহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ নামরূপ; নামরূপই ঐ পার্থক্য রচনা করিয়াছে। অতএব যাহাতে "কেবল নামরূপ" ছাড়া পদার্থতঃ আর কিছুই সৃষ্ট হয় না, সেইরূপ বিবর্ত্তকার্য্যই শ্রুতিসম্মত; কিন্তু নামরূপের ভ্রম হওয়ারূপ বিবর্ত্তকার্য্য নহে। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "তন্নামরূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত"—তাহা জগৎ) কেবল নামরূপের দ্বারাই ব্যক্ত করিলেন। অতএব, নামরূপই মায়া। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন, "এই নামরূপকেই মায়া বলে" "এই মায়া নামরূপেরই কার্য্য।" তবে উহাকে মিথ্যাজ্ঞান বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যকালে সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইলেও তৎপূর্ব্বে বা পরে উহা যখন আর থাকে না, অথবা উপাদান হইতে উহার যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তখন উহা কার্য্যকালে জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আত্যন্তিক মিথ্যা হইলেও ব্রহ্ম দের ন্যায় তাত্ত্বিক অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে; সুতরাং উক্ত নামরূপ মিথ্যা বলিয়া, নামরূপ বা মায়াসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়। মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান বলিবার আরও বিশেষ সার্থকতা এই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইলেও জীবগণ সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক জানিয়া আর উহার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন ভ্রম নাই, তখন তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান হইবে কি প্রকারে? কারণ, ভ্রম এবং মিথ্যাজ্ঞান ত একই; তবে কেবল নামমাত্র প্রভেদ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে সে জ্ঞানকে যেমন মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম বলা যায়, এস্থলে মিথ্যাজ্ঞান সেরূপ নহে। কারণ, শ্রুতি যখন স্পষ্টই "তন্নাম-রূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত"-নামরূপের দ্বারা এই এই জগৎকে সৃষ্টি করিলেন,

বলিয়াছেন, তখন আর জগতের জ্ঞান মিথ্যা নহে। সমুদ্রে যে তরঙ্গের জ্ঞান হয়, তাহা কি রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা? তবে যখন উপাদান হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে যাইলে আর থাকে না, তখন উহা মিথ্যাই। সুতরাং মিথ্যা বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বলিয়া মায়াকে "মিথ্যাজ্ঞান" বলা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দও জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন, "আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটী মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পাবে না। এই নামরূপকেই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃজন করিয়া এক জনকে আর এক জন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পাবে না। রূপের অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে।" অতএব মিথ্যাজ্ঞান অর্থে "কিছুই নাই অথচ জ্ঞান হইতেছে" নহে; পরন্তু যাহার জ্ঞান হইতেছে তাহা মিথ্যা। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় দেববাণীতে বলিয়াছেন, "মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।" এস্থলে আরও একটী বক্তব্য বিষয় এই যে যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করকে বিজ্ঞানবাদী স্থির করিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা আচার্য্যকৃত বেদান্তের "নাভাব উপলব্ধেঃ"—এই সূত্রের ভাষ্যমর্ম্ম আদৌ অবগত নহেন। কারণ, আচার্য্য শঙ্কর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে "ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোহর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি"—বহির্ব্বস্তুর অভাব অবধারণ করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহার উপলব্ধি হয়—বাহিরে স্তম্ভ দেখিয়া তবে স্তম্ভের জ্ঞান হয়। ভিত্তি, ঘট, পট

ইত্যাদি অগ্রে বাহিরে দেখিলে তবে তাহাদের জ্ঞান হয়, এই বাক্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন ; এবং আরও তিনি ঐ সূত্রের ভাষ্যেই বিজ্ঞানবাদীর "নম্নু নাহমেবং ব্রবীমি ন কঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি, কিন্তুপলব্ধিব্যাতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি" কিছু অনুভব করি না এরূপ কথা আমরা বলি না ; অনুভব করি সত্য, কিন্তু অনুভূতি ব্যতিরিক্ত অন্ত বাহ্যার্থ কিছুই অনুভব করি না, এই বাক্যের প্রতি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, "বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি"—তোমাদের মুখের অঙ্কুশ নাই, তাই তোমরা ঐরূপ বল ; যদি উপযুক্ত অঙ্কুশ থাকিত, তাহা হইলে আর ঐরূপ বলিতে না। এতদ্ভিন্ন তিনি বেদান্তের "মায়ামাত্রন্তু" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে "মায়াময্যেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি" স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী ; তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই, এইরূপ বলিয়া সর্ব্বশেষ "তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্"—অতএব স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র, বলিয়াছেন। অতএব, মায়া সম্বন্ধে কথিত মতই আচার্য্য শঙ্করের অনুমোদিত। তবে যে তিনি বেদান্তের ভাষ্য-ভূমিকায় "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ" এই বাক্যে মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য—মায়া পরমার্থতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইতেছে বলিয়া উহার মিথ্যাত্ব জানাইবার জন্য।

এক্ষণে পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, মিথ্যায় যদি মিথ্যা বুদ্ধি না হইয়া সত্য বুদ্ধি হয়, তবে ত তাহাই ভ্রম। সুতরাং তদুত্তর এই যে, শ্রুতি যখন "নামরূপে সত্যম্" নাম ও রূপ সত্য, এই বাক্যে নাম রূপকে সত্য বলিয়াছেন, "এবং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—বিধাতা ঠিক পূর্ব্বকল্পের ন্যায় এ কল্পেও চন্দ্র সূর্য্য সৃজন করিলেন, এই বাক্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের নামরূপের সহিত পর পর কল্পের নামরূপের সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের ন্যায় বর্ত্তমানকল্পেও আম গাছে আম হইতেছে কিন্তু কাঁঠাল গাছে আম হইতেছে না, তখন অবশ্য নামরূপ সত্যই। বাস্তবিক নামরূপ যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কল্পে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় আম গাছে আম না হইয়া

কাঁঠাল গাছেই আম হইত; এবং "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" —পরমেশ্বর 'ভূঃ' এই সার্থ শব্দ স্মরণ ও উচ্চারণপূর্ব্বক ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই শ্রুতি ও 'নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বর" পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দ লইয়া, স্মরণ করিয়া, ভূতসমূহের নামের, রূপের ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এই স্মৃতি যে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, তাহারও প্রামাণ্য রক্ষিত হইত না। কারণ, নামের সহিত সেই সেই রূপের এবং সেই রূপগত কর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধসূত্র না থাকিলে, পরমেশ্বর ভূলোকের সৃজনেচ্ছায় 'ভূঃ' শব্দ স্মরণ করিলে তাহাতে ভূলোক সৃজিত না হইয়া অন্য কোন কিছু অর্থাৎ হয় ত স্বর্গলোক সৃজিত হইত। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "সন্ন্যাসীর গীতি"তে বলিয়াছেন—

"সত্য সব, কিন্তু নামরূপ পারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।"

স্বামিজীর গীতুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নামরূপও সত্য; কিন্তু আত্মা যিনি, তিনি নিত্য নামরূপ বিমুক্ত বলিয়া আত্মা নামরূপের পারে। অতএব যাহা সত্য, তাহাতে সত্যজ্ঞান হইলে সে জ্ঞান ভ্রম নহে। আবার যিনি নামরূপের অতীত ভূমি হইতে দেখিতেছেন, অর্থাৎ নামরূপবিমুক্ত কেবলোপাদান তুরীয়ব্রহ্মপদকে দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট নামরূপের আত্যন্তিক অভাব হেতু তিনি উহাকে মিথ্যাজ্ঞানরূপেই দর্শন করিতেছেন, সুতরাং উভয়েই অভ্রান্ত। অতএব, তুরীয়পদ হইতে দেখিলে নামরূপ বা মায়া মিথ্যাজ্ঞানই। কিন্তু তাই বলিয়া, নামরূপ দর্শন কালে অনাম অরূপ ব্রহ্মের দর্শনাভাব বশতঃ নামরূপের ন্যায় ব্রহ্মকে আর মিথ্যা বলিতে পারা যায় না; কারণ নামরূপ আপাতসত্য হইলেও উহা যে পরমার্থতঃ সত্য নহে, অর্থাৎ উহা যে পদার্থতঃ কিছুই নহে কেবল কথা বা নামমাত্র, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

এই নামরূপ বা মিথ্যাজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া এবং ব্যষ্টিকে অবিদ্যা বলে। সমষ্টি নামরূপ অর্থাৎ সমষ্টি মিথ্যাজ্ঞান বা মায়া

অনাদি ও অনন্ত; কারণ জীবভাব অনাদি এবং জীবও অনন্ত। সেই জন্য শ্রুতি "অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে"—"অনাদি অনন্ত গহন-গভীর সংসার মধ্যে" এই বাক্যে মায়াকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যষ্টি নামরূপ অর্থাৎ ব্যষ্টি মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা, অনাদি হইলেও ইহার অন্ত আছে—ইহা অনন্ত নহে; অর্থাৎ তুরীয়পদ প্রাপ্তি কালে মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিবোধ হওয়ায়, জীব মুক্তি লাভ করে। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন "নিবৃত্ত এব যস্মাৎ তে তৎ সত্যত্বমতিগতা। ঈষৎ নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্"—তোমার তাহাতে যে সত্যত্বজ্ঞান নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাকেই ঘট-জ্ঞানের নিবৃত্তি বলা যায়; এইরূপ নিবৃত্তিই জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে, ঘট-জ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি মৃত্তিকা-জ্ঞান-জন্য নহে। তাৎপর্য্য এই যে, সমষ্টি অনাদি ও অনন্ত বলিয়া, ব্যষ্টির উহাতে মিথ্যাজ্ঞান হইলেও উহার অভাব হয় না; কিন্তু ব্যষ্টির উহাতে মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় মুক্তি হয়।

এক্ষণে শেষ কথা এই যে, যাঁহারা সমষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে মলিনসত্ত্বপ্রধান ও জীব বলেন, এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিয়া উভয়ের মধ্যে নিয়ম্যনিয়ামক ভাব অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মত কিন্তু শ্রুতিসম্মত নহে। কারণ, ব্যষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে মলিনসত্ত্বপ্রধান বলিলে, শ্রুতি যে "বিশুদ্ধসত্ত্বঃ" ইত্যাদি বাক্যে জীবন্মুক্ত পুরুষদের ভূয়োভূয়ঃ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলিয়াছেন, তাহার আর প্রামাণ্য থাকে না। অতএব, উক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতির অন্যরূপ তাৎপর্য্য আছে। মায়া সম্বন্ধে কথিত মতই শ্রুতির অনুমোদিত বলিয়া অনুমিত হয়।

দর্শনে বেদতত্ত্ব।

(শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মাইতি, বি এল)

শাস্ত্র বলিতে প্রধাণতঃ বেদ বুঝায়। অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রই সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ। স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র দর্শনাদি শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও প্রামাণিকতায় বেদের নিম্নস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে কোথাও কোথাও উল্লিখিত আছে যে ঐ সকল পুরাণ বেদতুল্য। আমাদের বিশ্বাস এ সকল কেবল প্রসংশাবাদ মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন—"বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাঁহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। * * অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি দেশীয় ধর্ম্মপুস্তক সমূহে যদিও বর্ত্তমান তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত' সংগ্রহ বলিয়া আর্য্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ' নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্যে বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তকের প্রমাণভূমি। আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই 'বেদ'।"

বেদ বলিতে মূলতঃ ঐশ্বরিক জ্ঞান বুঝাইলেও এই জ্ঞান ঋষিহৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ভাষায় ব্যক্ত হয়। সুতরাং আর্য্যজ্ঞান প্রকাশক এই ভাষাকে বেদ বলিতে আপত্তি হইতে পারে না। আর্য্যজ্ঞান যে পুস্তক সমূহে লিপিবদ্ধ থাকে সে পুস্তকগুলিকে বিচার কালে বেদ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অধিকন্তু এই পুস্তকগুলি হইতেই অধিকাংশ স্থলে সাধারণ লোকে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে—তাহাদের নিকট উহাই বেদ। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, মধ্ব প্রভৃতি দার্শনিক এই পুস্তকগুলির প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে বৈদিক শব্দগুলিকে নিত্য, বিকারহীন এবং অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে। এই শব্দ ধ্বনি নহে—তাহা হইতে পৃথক্ এবং বর্ণও নহে। ইহারই নাম স্ফোটবাদ। শব্দও যেরূপ নিত্য, বৈদিক শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য। অন্য কোন দর্শনে এই মত স্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু কঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন এবং প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নামে বেদের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহারা বেদ প্রণয়ন করেন নাই। মীমাংসা-দর্শনে বেদসম্বন্ধে এইরূপ মত দেখা যায়। উত্তরমীমাংসায় বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হইলেও, বোধ হয় স্ফোটবাদ স্বীকৃত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮।২৯ সূত্রের ভাষ্যে এই মত উল্লেখ করিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি স্ফোট-বাদ বিরুদ্ধ বর্ণবাদের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনীর গুরু) এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত উভয়ই প্রায় এক মতাবলম্বী। কেবল তাঁহাদের বিরোধ এই যে, শব্দ বলিতে উত্তরমীমাংসা বর্ণ বুঝেন এবং পূর্ব্ব-মীমাংসা স্ফোট বুঝেন।

সাংখ্য দর্শনে বেদকে অনিত্য বলা হইয়াছে—"ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।" যথা—"স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।" কিন্তু সাংখ্য মতে বেদ অপৌরুষেয় এবং স্বতঃপ্রমাণ। অপৌরুষেয় হইলেই যে নিত্য হইবে তাহা নহে; যেমন, অঙ্কুরাদির অপৌরুষেয়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু তাহা নিত্য নহে। বেদশব্দ সকল যথাবিধি উচ্চারিত হইলেই ফল উৎপাদন করে। উচ্চারণকর্ত্তার অর্থবোধ থাকুক বা না থাকুক, বৈদিক মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলেই যথোক্ত ফল প্রসব করিবে। সেই জন্য সাংখ্য বলেন "নিজ-শক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্।" নিত্য না হইলেও বেদ নিজের শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারাই স্বতঃপ্রমাণ। সাংখ্যদর্শন মতে—"আপ্তো-পদেশঃ শব্দঃ।" ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষ-শূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবগত বিষয়ের উপদেশকে শব্দ বলে। লোক-

ব্যবহারে আমরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি, সেই সকল শব্দের অর্থবোধ যে প্রকারে হয়, বৈদিক শব্দ সকলেরও অর্থবোধ সেই প্রকারে হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে লৌকিক ও বৈদিক শব্দে সাংখ্য মতে কোন প্রভেদ নাই। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় বেদের এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। সাংখ্য বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও বেদের স্বতঃপ্রমাণতা স্বীকার করায় বেদের গৌরবের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

পাতঞ্জল দর্শনে বেদ সম্বন্ধে কোন বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলা হইয়াছে। যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত। সুতরাং সাংখ্যমত ও যোগমত একই বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। পাতঞ্জলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার সহিত বেদের কি সম্বন্ধ তাহা বলা হয় নাই।

বৈশেষিক দর্শনে সুস্পষ্টভাবে বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলা হইয়াছে এবং ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

ন্যায় দর্শনের মত প্রায় সাংখ্য দর্শনের মত। বেদকে আপ্তোপদেশ বলিয়া ন্যায় দর্শনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপিচ, ন্যায়মতে শব্দ অনিত্য কিন্তু অবিকারী। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও বেদ ও ঈশ্বরে কি সম্বন্ধ তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী দর্শনসকলের মধ্যে কেবল মাত্র বৈশেষিক দর্শন এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

'নানা মুনির নানা মত'—অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ এ বিষয়েও তাই। দর্শনসমূহে বেদ সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত আছে সত্য, কিন্তু বেদকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হন নাই। সাংখ্যাদি নাস্তিক দর্শনও এ বিষয়ে বেদান্তাদির সহিত একমত। কি কারণে বেদকে এই উচ্চ স্থান দেওয়া হইল তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য

বিষয় নহে। সংক্ষেপে এই বলিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, কর্ম্মফল, দেবতা প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষোপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা হয় না। অনুমানের দ্বারা কেবলমাত্র এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব যে অসম্ভব নয়, ইহাই প্রমাণ করিতে পারা যায়। এই সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব যাঁহারা সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্যই এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ। সেই জন্য ন্যায় ও সাঙ্খ্য দর্শনে বেদকে আপ্তোপদেশ বলা হইয়াছে। বৈশেষিক আর একটু অগ্রসর হইয়া আপ্তের জ্ঞানকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণাদিতেও এই ভাবটীই প্রচারিত হইয়াছে। উপনিষদেও কথিত আছে "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" অবশ্য ইহাই বেদান্ত মত; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে এই মত পরিস্ফুট হয় নাই।

এক ও বহু

(শ্রী—)

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ, বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

যে প্রেমে জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক হইতে বহুর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, বহুর নিকট হইতে এক আবার সেই প্রেমই ফিরিয়া পাইতে চাহে। ইহারই নাম সৃষ্টিবিলসন, ইহাই ভাগবত-লীলা। সুখ, দুঃখ, বাধা, বৈচিত্র্য, ছোট, বড় সকল প্রকার দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য-জ্ঞানের ভিতর দিয়া বহুকে আবার সেই প্রেমের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে হইবে—এককে পাইবার জন্য। তাই বলি সে কোন্ শুভমুহূর্ত্তে, কোন্ শুভ অবসরে বিধাতার মনে আচম্বিতে বহু হইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল, লীলাবিকাশের সে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণ; অনন্ত আজ

সান্ত হইল, পূর্ণ আজ অংশে অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল, নিবাত-নিষ্কম্প বর্ত্তিকালোক আজ সহস্র চূর্ণ রশ্মিতে বিচ্ছুরিত, বিভগ্ন ও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সৃষ্টিরহস্যের প্রথম অঙ্ক উদ্‌ঘাটিত হইল।

তাহার পর যুগ যুগ ধরিয়া সকল বৈচিত্র্য সেই আদি একত্বের অভিমুখেই ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—কার্য্যকারণবাদ তাহার সাক্ষী। জ্ঞানীর জ্ঞান, দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সকলই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সেই একত্ব জ্ঞানকেই ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় চলিয়াছে। যে যে পরিমাণে সেই অখণ্ড একত্বের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার জীবনের সাফল্যও সেই পরিমাণে হইয়াছে। কেহ বা রুদ্রের বাম মুখ দর্শনে ত্রস্ত হইয়াছে—কেহ বা সত্য, শিব, ও সুন্দরের পরম রমণীয় দক্ষিণ মুখের দর্শনে জীবন ধন্য জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু ভাবুকের কাছে যাহা ভাব-পদার্থবিশেষ, সাহিত্যিক কবির যাহা কল্পনা মাত্র, দার্শনিকের যাহা বিচার্য্য, একমাত্র জ্ঞানীই তাহাদের সকল সাধনার সম্মিলনক্ষেত্রে, সকল আংশিক প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক সত্যের ক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধে আপেক্ষিকের সীমানার বহির্ভূত প্রদেশে সেই এক অবিভাজ্য, অখণ্ড সত্যের দর্শন লাভ করিয়াছেন। যাহারা অংশকে, বহুকে, বৈচিত্র্যকেই শ্রেষ্ঠতম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে অথবা তাহাদেরই মধ্যে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে একটি বিধৃতিসূত্র আবিষ্কার করিয়াই নিরস্ত হইয়াছে, তাহারা জ্ঞানীর বোধিলব্ধ অখণ্ড সত্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। যাহারা পরিবর্ত্তনকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানে তাহারা আদৌ বিবর্ত্তনের প্রয়াসী নহে, এবং নহে বলিয়াই এক ও বহুর রহস্য তাহাদের নিকট অবিদিত। বহুত্বের একত্বে সমাধান তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণই করিয়াছেন এবং করিতেছেন—সেই তত্ত্ববুদ্ধির লাভকেই শাস্ত্রে "পরা-বিদ্যা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতীতের ইতিহাসে ভারতবর্ষ এই পরাবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল। অথচ তাই বলিয়া "অপরা"কেও অবমাননা করিয়া স্থানভ্রষ্ট করিতে চাহে নাই—তাহারাও শাস্ত্রে "বেদিতব্য" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা এই পরাবিদ্যার আলোকে, সাহিত্য দর্শন ও

ধর্ম্মসম্বন্ধে এই স্থানে একটু চিন্তা করিব। সংসারে প্রধানতঃ তিন প্রকার মানসিক-শক্তি-বিশিষ্ট লোক আমরা দেখিতে পাই। প্রথম, যাঁহারা এই সংসারকে লইয়াই বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত —যাঁহারা "যেন তেন প্রকারেণ" ইহাকেই পরম সত্য বলিয়া স্থির ধরিয়া লইয়াছেন। আমাদের দেশীয় সাহিত্যের একটা খুব বিশাল অংশ এই শ্রেণীর লোকেরই লীলাপ্রাঙ্গণ। সাহিত্য ও ধর্ম্ম এই দুইটি জিনিষ এক না হইলেও,যে সাহিত্য উচ্চ নীতি ও ধর্ম্মভাবকে উপেক্ষা করিয়া, হাস্যাস্পদ করিয়া, নর নারীর অনুরাগ প্রভৃতিতেই নিবদ্ধ থাকিয়া সেই সকলকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্য বলিয়া ধার্য্য করে এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে যাহা প্রতিভা, সেই "নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি"কেই যথার্থ দর্শন ও সত্যপ্রাতিভ বা True wisdom বলিয়া প্রচার করে তাহা ধর্ম্মভাব ও তদুপলব্ধি সহায়ে জীবনগঠনের চেষ্টা যে কি পদার্থ তাহা আদৌ বুঝিতে সক্ষম হয় না। সেইরূপ মতের সাহিত্যকে "সাহিত্যিক যথেচ্ছবাদ" নাম দেওয়া যাইতে পারে; ইহার দর্শনও সেই বহুত্ববাদ বা Pluralism. সাহিত্য যেখানে আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া, ধর্ম্মের রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করিবার বাসনায় লোলজিহ্ব হইয়া উঠে ধর্ম্ম তখনই তাহাকে উন্মত্ত সারমেয় বোধে শৃঙ্খলিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করে, অন্যথা সমাজে প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বিশেষভাবে যুক্তিশক্তিসম্পন্ন, চিন্তাশীল; তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সম্পৎ এই চিন্তা। ইঁহাদের কেহ কেহ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক; জগৎ হইতে জগদতীত পদার্থ যে কিছু আছে তাহা ইঁহারা দর্শনে ও বিজ্ঞানে স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার কোনও কোনও স্থলে, সংসারের বহু ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইলেও ইঁহাদের নরদৃষ্টি নিম্নে সংসারের প্রলোভন—নাম, যশ, প্রভৃতি বৈচিত্র্যের মাধুরীমূর্ত্তিনিচয়ের দিকেই নিবদ্ধ: য়ুরোপের দার্শনিকগণের অনেককেই আমরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি—যদিও ইহারা সকলে নাম, যশ প্রভৃতির জন্য দার্শনিক এরূপ বলিলে ইঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কিন্তু ইঁহাদের দর্শনে বৈচিত্র্য প্রায় সকল স্থলেই এতই

মনোরম যে তাহা কোনরূপেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহচর হইতে পারে না বলা যাইতে পারে; দর্শন বলিতে য়ুরোপ যাহা বুঝে অর্থাৎ বুদ্ধিগত ব্যাপ্তির জ্ঞান বা Generalised knowledge, ইহা মাত্র তাহাই। উচ্চ আধ্যাত্মিকতাকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শন অতীন্দ্রিয়বাদ বা ধার্ম্মিকত্ব—Mysticism and Religion নাম দিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে। বিচারের ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেও উপলব্ধির ব্রহ্মকে অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক অবজ্ঞা করিয়াছেন। ফরাসী বার্গসঁ প্রচারিত দর্শন তাহা স্বীকার করিলেও সর্ব্বত্র তাহার সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা আমরা পরে দেখিব।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক যাঁহারা, তাঁহারা যথার্থই 'ধার্ম্মিক' পদবাচ্য। তাঁহারা বৈচিত্র্যের প্রলোভনকে অপার বিড়ম্বনা বোধে ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকল বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি, সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সেই একেরই উপলব্ধিকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন। সকল চিন্তাশীল সমাজে, জীবনের সকল বিভাগ ইঁহাদের উচ্চ জীবনের আলোকে সমুজ্জ্বল হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করে। ধর্ম্ম যেখানে শিথিল, সাহিত্য ও দর্শনও সেখানে তদ্রূপ। কারণ, উহারা জীবনকেই প্রতিফলিত করে। আবার যেখানে ধর্ম্মের উচ্চ উপলব্ধি বর্ত্তমান, সাহিত্য ও দর্শন সেখানে তাহাদেরই প্রসাদ বহনে নিযুক্ত। ধর্ম্মই আদর্শের সংস্থাপক। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান শুধু পথের কথাই বলিয়া দেয়। যাহারা সেই ধর্ম্মজীবনলাভের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া "সাহিত্যিকের ধর্ম্ম", "দার্শনিকের ধর্ম্ম", "বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম" প্রভৃতি উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহারা সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে নাস্তিক মতাবলম্বী।

দর্শনের দিক হইতে সত্যের একাত্মকতা যেরূপ বিচার করা যায়, সাহিত্যের দিক দিয়া ঠিক সেরূপে হয় না। কারণ, সাহিত্যের মালমসলা 'বহুর' নিকট হইতেই লওয়া। কিন্তু সাহিত্য উচ্চভাব শিক্ষা দিয়া মানবমনকে একত্বের দিকে পরিচালিত করিতে সমর্থ। দুইটি ভাবের আধিপত্য সকল দেশের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম Realistic বা বাস্তববাদী সাহিত্যিক—ইঁহাদের অনেকেই উচ্চ

নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বে বিশ্বাস রাখেন নাই তাঁহাদের এই নগ্ন বাস্তবতা য়ুরোপের কোন কোন দেশে যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেরই বিদিত। আবার, এই বাস্তবতাকে পরিহার করিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয় যে উচ্চ আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী আপন প্রভুত্বের উদ্ধারসাধন করিয়া বিকাশের পথ দেখিয়া লইয়াছে, তাহাও সেই একের সহায়ে—যাহাকে ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বর অথবা Absolute যেরূপ অভিরুচি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার নাম Transcendental movement in literature. আর একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সাহিত্যের সেই Realism ও Idealismই কখনও বা classicism, কখনও Romanticism, কখনও Impressionism, কখনও storm and stress movement-রূপ আকার ধারণ করিয়াছে। এই দুইটির কোন একটি সাহিত্যের শেষ কথা নহে কারণ, যে রাগাত্মিকা বা মনোরঞ্জিনী প্রবৃত্তির সাহায্যে সাহিত্য গঠিত হয়, তাহা মানব-মনের অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত—সমগ্রত্ব লইয়া নহে। কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রবৃত্তিও মানবকে অনেক দূরে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া তাহাও অবহেলার বস্তু নহে, এবং তাহা লইয়াই সাহিত্যিক আর্টের ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত কতই না বাদানুবাদ চলিতেছে।

আবার দর্শনের দিক হইতে আমরা কখনও একত্বের জ্ঞান বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে দেখি—কখনও বা বহুত্ব ও বৈচিত্র্যই অনুভূতির 'এক'কে বিলুপ্ত করিতে প্রয়াসী দেখি। য়ুরোপখণ্ডেই ডেমক্রিটাস ও এপিকিউরাসের বহুত্ববাদ ক্রমে প্লেটোর আদর্শবাদে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, নূতন ধারার দর্শনে হিউম ও কান্তের ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার-দর্শন আসিয়া হেগেলের আদর্শবাদে পরিসমাপ্ত। তেমনি এখনও কোন কোন স্থলে বহুত্ববাদ আসিয়া হেগেলের একত্ববোধ পর্য্যায় বা unity of categoriesকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে চাহিতেছে। আবার

নূতনভাবে একত্বের আদর্শোপলব্ধির তত্ত্বও ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছে।

এখন মোটামুটী বলা যাইতে পারে যে, দর্শনেও ইহসর্ব্বস্ববাদ (Materialism) এবং ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ (Idealism) এই দুইয়েরই নানা আকারে পুনঃ পুনঃ অভিনয় চলিয়াছে। ইহাদের কোনটিই দর্শনের শেষ কথা হইতে পারে নাই। কারণ, সাহিত্যের সীমার ন্যায় দর্শনের সীমাও নির্দ্দি । কেবলমাত্র যুক্তিশক্তির ব্যবহারে যখন যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, দর্শন তখন তাহাকেই বড় করিয়া দেখে—সম্পূর্ণ সমাধান আনিয়া দিতে পারে না। অতএব ইহা বেশ পরিস্ফুট যে, ধর্ম্মের প্রভাব ব্যতিরেকে সাহিত্য ও দর্শন উভয়েই স্ব স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান আর তাহাদের আয়ত্তীভূত থাকে না। Realism ও Pluralismএর করাল ছায়া যখন মানবসাধারণের উপর ঘনান্ধকার বিস্তার করে, বৈচিত্র্যই যেন তাহার নিকট একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়া উঠে। বৈচিত্র্যের যাহা স্বরূপ—আমরা সাধারণভাবে যাহাকে 'এক' আখ্যা দিয়াছি—তাহা আর তখন প্রিয় নহে, পূজ্য নহে—তাহা কেবল কৌতুহল উদ্রেক করে মাত্র—'স্বরূপ-বিশ্রান্তির' দিকে মানবমনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। এই বাস্তব ও বহুত্ববাদ অনেক সময়ে খুব উচ্চ আদর্শের ছদ্মবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে—কখনও আমরা উহাকে বুঝিতে পারি, কখনও বা পারি না। না পাবার কারণ—সকল সময়ে আমাদের মনে উচ্চজীবনের আদর্শ বর্ত্তমান থাকে না, যাহার তুলনায় আমরা বিসম্বাদী মতসকলের বিচার করিতে পারি। ভারতবর্ষ সেই উপলব্ধির এককেই পরিস্ফুট আকারে দেখিতে চাহিয়াছে—কল্পনার এককে নহে, দর্শনের এককে নহে, বিজ্ঞানের এককেও নহে।

য়ুরোপীয় দর্শনের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে, একত্বোপলব্ধির নূতন দর্শনের ভিতরেও তাহার সেই বৈচিত্র্যকে একত্বের সহিত একই আসনে উপস্থাপিত করিবার উদ্যম। অতএব

যে সত্য পূর্ণ ও সমরস তাহাকে সে চাহে না, ইহাই বলিতে হয়। উচ্চ উপলব্ধিপূর্ণ জীবনের অভাবই ইহার কারণ। হেগেলের দর্শনের পশ্চাতে আশানুরূপ উচ্চ জীবন ছিল না, আবার এখনকার ফরাসী মনীষী বার্গস'র দর্শনে পূর্ব্ব যুগের স্বীকৃত বিতর্কবুদ্ধি বা Intellectualism সত্যের পথপ্রদর্শক বলিয়া অস্বীকৃত হইলেও উচ্চতম বোধি বা Intuition তাহার যথার্থ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে—সেই একই কারণ বশতঃ। বার্গস তাঁহার Creative Evolution নামক গ্রন্থে (২৩১ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন,—"The more we succeed in making ourselves conscious of our progress in pure duration, the more we feel the different parts of our being enter into each other and one whole personality concentrate itself in a point." ইহাকে সেই অখণ্ড জ্ঞানের কথা, অপরোক্ষানুভূতির সমর্থন বলা হয়। আবার অন্যত্র (২৩৬ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়াছেন, "Life in its entirety regarded as a creative evolution, transcends finality, if we understand by finality the realisation of an idea conceived or conceavable in advance." এই কথাগুলি তিনি হেগেল ও তচ্ছিষ্য গ্রীণ ও কেয়ার্ডের মতের বিরুদ্ধেই গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহারা সত্যের পূর্ব্বস্বীকৃত রূপকে, অখণ্ডানুভূতিকে স্বীকার করিয়াছেন—বার্গস তাহা করিতে চাহেন নাই। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দিক হইতে যে স্থির সত্যকে জানা হইল, creative evolutionএর পরিণামের স্রোতে পড়িয়া সে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। সত্য প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তাহাকেই আমরা জানিতেছি—অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান কি ইহাই? আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণ কিন্তু ইহার বিচার অন্যরূপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই জগতেরই সর্ব্বদা পরিণাম সিদ্ধ—মনের দ্বারা এই পরিণাম বুঝা যায়। আত্মানুভূতি স্বসংবেদ্য, উহা মনের ধর্ম্ম নহে। Intuitive knowledge পরিণাম জ্ঞান নহে—

এ উভয় আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিসদৃশ। বার্গসঁর দর্শন যাহাকে সত্যলাভের পথে বিঘ্ন মনে করিল, প্রকারান্তরে আবার তাহাকেই সে স্বীকার করিল।

এইরূপে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ William James একদিকে যেমন Vicious Iutellectualism বা সত্যলাভসম্বন্ধে দুষ্ট বিতর্ক বুদ্ধিকে ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন, আবার অন্যদিকে সেই বিতর্কবুদ্ধির কবলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার Pragmatism পুস্তকের সার সঙ্কলন করিলে ইহাই দাঁড়ায়ঃ— বহুকে ছাড়িয়া ঐ অশরীরী একত্বের অনুসন্ধানে ছুটিও না, অথবা যদি সেইরূপ করাই তোমার জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব কর, তবে তাহা করিতে পার ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার সে ভাবুকতার সত্য তোমারই থাক। জগতে পরিদৃষ্ট বিভিন্নতার সমন্বয় সে ভাবের একত্বোপলব্ধিতে হইতে পারে না। হয়ত এমন এক দিন আসিবে যখন আমরা ঐ ঐক্যের ভাবকে সর্ব্বোচ্চ মত বলিয়া গ্রহণ করিব। কিন্তু আপাততঃ এই মুহূর্ত্তে তাহা সম্ভবই নয়। ঐ দেখ নানা বিজ্ঞান কত রকমে কত সত্য আবিষ্কার করিতেছে, আর এতদ্ব্যতীত আমরা আমাদের চারিদিকে কত বাদবিসম্বাদ, কত অন্যায়, কত পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি। এ সকলের প্রতিবিধান যে আমাদেরই করিতে হইবে, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ—বীরের মত যুদ্ধ কর, অ-'বৈজ্ঞানিক' হইও না। বিচিত্রতাকে স্বীকার কর, বরণ কর, তবেই সংসারে তোমার মঙ্গল হইবে—(Pragmatism, পৃষ্ঠা ৭৫, ৭৬, ১৫৮, ১৬০, ৩০০)। Jamesএর প্রচারিত Pragmatism, যাহা স্বার্তন্ত্র্য ও সুবিধাবাদ অথবা দার্শনিকের ভাষায় 'পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ', স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক করমর্দ্দন করিয়াই ক্ষান্ত। জীবনে তাহা যে কার্য্যকরী হইতে পারে, স্বামিজী তাহা "চোখে আঙ্গুল দিয়া" দেখাইয়া দিলেও ইনি সেটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না—(Pragmatism—The one and the

many)। সেটা নাকি বড়ই ভাবগত এবং —বোধ হয় অনাবশ্যকরূপে —বড়ই আধ্যাত্মিক (It is emotional and spiritual altogether)। Jamesএর উক্তিতে আমরা তাঁহার মার্কিনী ভাবেরই পরিচয় পাই। যে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমেরিকায় জীবন অতিবাহিত হয়, Jamesএর তত্ত্ব তাহারই নিদর্শন। জগতে চিন্তাসমন্বয়ের মন্দিরে Pragmatismএর একটি স্থান আছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত দর্শন বলিয়া নহে। দর্শনের ভিতর যে একটা সম্পূর্ণ ভাবের কথা, আমরা শুনিতে চাই, প্রকৃত, আত্মা, ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কতকটা সম্যক্ ধারণার দাবী আমরা দর্শনের নিকট স্থাপিত করি, James এর মতবাদে তাহার অভাব। তিনি সর্ব্বসমঞ্জসীভূত একটা সত্যের মূর্ত্তি দেন নাই। সেই জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবারিত মনোবৃত্তির পরিচালনা স্বীকারে অপর দার্শনিকদিগের তুলনায় তিনি উদার ও বিচারপরায়ণ বলিয়া সকলের প্রণম্য হইলেও মানবের মনোবিকাশের শেষ ধারাটির উপরে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। Pluralismই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্তে দাঁড়াইয়াছে। সত্য তাহার কাছেও নিয়ত প্রবহমান-রূপেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে।

উপরে যে দুইটি মত আমরা সমালোচনা করিলাম; তাহা হইতেই য়ুরোপের সাধারণ মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। যাহারা কেবল চিন্তার রাজ্যেই বৈচিত্র্যসমন্বয়ের কথা বুঝে, ধ্যানের সহায়ে অতীন্দ্রিয়োপলব্ধির পূর্ণবিকাশে যে সমন্বয়—যেখানে সকল বাহ্য-ভাবাত্যয়ে এক পূর্ণজ্ঞানের প্রতিষ্ঠ, 'প্রকৃতির আপূরণে' সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম-দৃষ্টির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানব যে অবস্থায় আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ পর্য্যন্ত স্বীকার করে, তাহা এখনও য়ুরোপের দার্শনিক জ্ঞান ও সহজ জ্ঞানের নিকট প্রহেলিকা মাত্র। এইরূপে সেই সহজ জ্ঞানের বাস্তববাদ এবং দার্শনিক বহুত্ববাদ বুদ্ধিবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত পরিচালনে পাশ্চাত্য দর্শনকে 'প্রতিনিয়ত বিড়ম্বিত করিতেছে। তবে বার্গসঁর Intuition মতবাদ এবং

অধ্যাপক অযকেনের Activism মত পাশ্চত্যে দর্শনকে একটা নূতন আলোকের সম্মুখীন করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তন্ত্রশাস্ত্রপারদর্শী বিচারপতি উডরফের একটি কথা এই সূত্রে সহজেই মনে উদয় হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"The latest tendency in modern western philosophy is to rest upon Intuition as it was formerly the tendency to glorify dialectic. Intuition has, however, to be led into higher and higher possibilities by means of Sadhana." বহুর বন্ধনকে ভুলিতে হইলে, মায়া পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইলে এই সাধনারই শরণ লওয়া জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রাচ্য ভূভাগে সেই সাধনার পূর্ব্বাভাস আমরা পাইতেছি, পাশ্চাত্যেও কি তাহার প্রতি-রূপ আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব না? যে দিন সে জ্ঞান আসিবে সকল স্থলেই দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ সে দিন আর থাকিবে না। য়ুরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় সাধনার প্রকাশের দিন ইহা একবার ঘটিয়াছিল। আজ বিশ্বব্যাপী ভাবতার দর্শনের আলোচনার ভিতর দিয়া মধ্যযুগের সেই ধর্ম্মভাব কি য়ুরোপ আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইবে না? আমাদের বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দ য়ুরোপে সেই নূতন ভাবের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছেন—কালে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইতে চলিল।

আবার সাধারণ সহজ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে সেখানেও কি আমরা বিশ্বসৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য মানবমাত্রেরই মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই না? ভাবুক কবিগণ বিচিত্রতার মোহে মুগ্ধ, কিন্তু দৃষ্টি আছে সেই একের উপর। সকল অসম্পূর্ণতার, সকল অভাব অভিযোগের সম্পূরণ হইবে সেই একত্বের ভিতর। সর্ব্বসাধারণ যাঁহার দিকে চাহিয়া ভাবে, কবি সে ভাব কথায় প্রকাশ করিয়া বলেন—"On the earth a broken round, in the heaven a perfect orb" (Browning)। এই পূর্ণত্বের আদর্শ মানবের অন্তর্নিহিত আত্মজ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিত। ভাবার সাহায্যে

সে সেই এককে কখনও স্বারাজ্য, কখনও সালোক্য, কখনও সান্নিধ্য, কখনও সাযুজ্য প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিলেও ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে এমন একটি অবস্থার কার্য্যে অন্বেষণ ও ভাবে আরাধনা করিতেছে, যাহা তাহাকে ইহবৈচিত্রের পথ হইতে দূরে মুক্তির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আহ্বান করিবে। কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট যে, বৈচিত্র্যবিমূঢ় মানব, 'সাহিত্যিক' মানব, দার্শনিক' মানব, একবারে সকল বৈচিত্র্য ঘুচাইতে চাহে না। এই জন্য সকল সময়ে তাহার মুক্তির কল্পনা বৈচিত্র্যের বর্ণখেলা বিবর্জ্জিত নহে। হয়ত সে জীবনে কাহাকেও বড আপনার বলিয়া বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহার মুক্তির ক্ষেত্রে সে ঠিক তাহাকেই নিকটে রাখিতে চায়। হয়ত বা জীবনে সে কোন বিশিষ্টভাবের সুখশয্যায় আসীন থাকিয়া মোহন স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে সেই স্বপ্নকে তাহার মুক্তির রাজ্যে সত্য করিয়া দেখিতে চায়, তাহার নিকট তাহাই পরমাশান্তি, ধ্রুব সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসংস্থ অদ্বৈতবাদী যিনি, তিনি বলিবেন, প্রাগুক্ত লোকগুলি মুক্তির নামে এখনও সোণার স্বপন দেখিতেছে। সত্য যখন এক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ-প্রাপ্তিই যখন মুক্তি, এ বৈচিত্র্য তখন কোথায়? ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবের মুক্তি নহে, অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক সুখের পরিকল্পনে তাহার স্বর্গলাভ হইতে পারে - মুক্তি সে নয়, মোক্ষ সে নয়। জ্ঞানী বলিতেছেন, "ইহ চেদবেদীতথ সত্যমস্তি, নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" আর বলিতেছেন "নেতি নেতি", "নেদং যদিদমুপাসতে," "য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যুমাপ্নোতি" —ইহাকে, ব্রহ্মকে নানা ভাবিয়া সংহারের পথে, মৃত্যুর পথে ধাবিত হইও না।

বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার অনুশীলনে, জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে উন্নতশীর্ষ, পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের অনুবর্ত্তন-প্রয়াসী প্রাচ্যের দল আজ একত্ব ও নানাত্বের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের নূতন নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে উন্মুখ। সেই সকল নূতন খণ্ড ধর্ম্ম আজ অনেককে নানারূপে বিপথে লইয়া

যাইতেছে। সাহিত্য আজ তাহার জীবনের প্রতিকৃতিকেই বড় বলিতে চাহিতেছে। জীবন-প্রহেলিকার সমাধান কোথায়, তাহার সন্ধান সাহিত্যে আজকাল বড় একটা মেলে না। দর্শনও তদ্রূপ কোনরূপে কায়ক্লেশে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিলেও তাহাকে কেবল ভাবগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একমাত্র সত্যলাভের জন্য অগ্রসর কেবল সেই আধ্যাত্মিক। দার্শনিক, সাহিত্যিক তাহাদের ভাবের বিরোধী হইলেও কি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে না। জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল বেদনা কি কেবল এক দীর্ঘশ্বাসেই ফুরাইয়া যাইতে চায়? পেলব প্রেমের গানেই কি সকল ব্যথা নিঃশেষ হইয়া যায়? নিবিড় করিয়া সুখ বলিয়া দুঃখকে আলিঙ্গন করিলে কি হৃদয় সকল বাধাবিমুক্ত হইয়া যায়? সত্যের উচ্চতম রূপ কি, তাহা দেখিবার বা বুঝিবার কি আর কোন ইচ্ছাই হয় না?

সাহিত্য, দর্শন, বহুত্ববাদ, বাস্তববাদ যে যতটা উচ্চ ভাবের ও উচ্চ চিন্তার সাহায্যে মানবকে আদর্শের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, আসুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম্মের আহ্বান, উচ্চ জীবনের আহ্বানকে আর শ্রুতিগোচর না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। ভারতের ও জগতের জীবনে নূতন যুগধর্ম্মের মূর্ত্ত আকার আজ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। ব্যক্তিকে যদি আমরা স্বীকার না করি, তাঁহার দিব্যদর্শনকে, তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টিকে, তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর মহত্তম সাধনাকে আর অবহেলা করিলে চলিবে না; এই যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে, আজ দূর নিকট হইয়াছে, 'পর' বলিয়া যাহাকে ত্যাগ করা হইত সেও আজ 'ঘরের' হইয়াছে, দীন আজ উচ্চের হাত ধরিয়াছে, বহির্জগতে 'বহু'কে আজ নানাপ্রকারে 'এক' হইতে দেখা গিয়াছে; অন্তরের মধ্যে উপলব্ধির দিব্য আলোকে সকল বৈচিত্র্য, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈশিষ্ট্যকে আত্মজ্ঞানের বিরাট্ যজ্ঞে তাহাদের স্বস্বরূপে, একে, অদ্বৈতে পর্য্যবসিত দেখিতে পাওয়া যাইবে না কি?

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক দর্শন।]   [এরিষ্টটল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল)

ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া বিরূপানুমান (Inference by opposition কাহাকে বলে ও কিরূপে সাধিত হয় সে কথা অল্প বিস্তর উল্লেখ করিয়াছি। বিরূপানুমান ছাড়া আবর্ত্তন (conversion) ও ব্যাবর্ত্তন (obversion প্রণালী অবলম্বনে অমিশ্র নিরপেক্ষানুমান সম্ভব হয়, সেই কথাই অতঃপর আলোচিত হইবে।

"কোন মানুষ অমর নহে" এই বাক্য হইতে 'কোন অমর মানুষ নহে" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এস্থলে প্রথম বাক্য, অর্থাৎ পুরোগাবয়ব ও পরবাক্য অর্থাৎ অনুগাবয়ব সমগুণ ও সমপরিমাণ বিশিষ্ট। কিন্তু এই অনুমানপ্রণালী দ্বারা পুরোগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ যথাক্রমে অনুগাবয়বের বিধেয় ও উদ্দেশ্য পদ হইয়াছে। উপরোক্ত উদাহরণে পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণ এবং সমপরিমাণবিশিষ্ট, কিন্তু কোন কোন স্থলে আবর্ত্তনপ্রণালী অবলম্বনে দেখা যায়, পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণবিশিষ্ট হইলেও সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে। "সকল মানুষ মর" এই বাক্য হইতে "সকল মরই মানুষ" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক, যেহেতু মানুষ ছাড়া অনেক পদার্থই মরণধর্ম্মশীল। "সকল মানুষ মর" এই বাক্যকে আবর্ত্তিত করিয়া "কোন কোন মর প্রাণী মানুষ" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সৎ সিদ্ধান্ত। যে আবর্ত্তনে পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণ ও সমপরিমাণবিশিষ্ট সেটীকে সমাবর্ত্তন বা simple conversion বলে, ও যেটীতে পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণবিশিষ্ট কিন্তু সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে, সেটীকে পরাবর্ত্তন অর্থাৎ conversion by limitation বলে।

"সকল মানুষ মর" ইহা হইতে 'সকল মর মানুষ', এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বলিয়াই "আ" বাক্যকে সমাবর্ত্তিত করা যায় না—"আ" বাক্যের পরাবর্ত্তনই সম্ভব।

"কোন মানুষ অমর নহে" এই বাক্য হইতে " কান অমর মানুষ নহে ' এটী সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত। কোন অমরই মানুষ নহে সুতরাং কোন কোন অমরও য মানুষ নহে, সেটী সহজবোধ্য। অতএব দেখা গেল, "এ" বাক্যের সমাবর্ত্তন ও পরাবর্ত্তন উভয়ই সম্ভব।

"কোন কোন মানুষ ধনী" ইহা হইতে "কোন কোন ধনী মানুষ" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু "সকল ধনীই মানুষ" এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। যহেতু মনুষ্যেতর পদার্থ যক্ষ বা দেবতাদি ধনী হইতে পারে। সুতরাং দেখা গেল, "ই" বাক্যের সমাবর্ত্তনই সম্ভব, পরাবর্ত্তন সম্ভব নহে।

"কোন কোন প্রাণী চিন্তাশীল নহে" এই বাক্য হইতে "কোন কোন চিন্তাশীল প্রাণী নহে" বা "কোন চিন্তাশীলই প্রাণী নহে" একপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। যেহেতু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রাণসম্পন্ন। সুতরাং "ও" বাক্যের আবর্ত্তন আদৌ সম্ভব নহে। চিত্রের সাহায্যে এই সকল সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায় (গত আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধন দ্রষ্টব্য)।

'সকল মানুষ মর" এই বাক্য হইতে "কোন মানুষ অমর নহে" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এই স্থলে অনুগাবয়বের বিধেয় পদ পুরোগাবয়বের বিধেয় পদের বিরুদ্ধ। এই প্রণালীকে ব্যাবর্ত্তন বা obversion বলে। উপরোক্ত উদাহরণ হইতে আরও দেখা যায় যে, পুরোগাবয়ব অন্বয়ী বাক্য হইলে অনুগাবয়ব ব্যতিরেকী হইবে এবং ব্যতিরেকী হইলে অন্বয়ী হইবে।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, "আ" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "এ" বাক্য, "ই" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "ও" বাক্য, "এ" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "আ" বাক্য, এবং "ও" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "ই" বাক্য পাওয়া যায়।

অমিশ্র নিরপেক্ষানুমান প্রণালী ব্যতীত মিশ্র নিরপেক্ষানুমান বলে আমরা একটী বাক্য হইতে অপর বাক্য পাইয়া থাকি।

কোন স্থলে ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আবর্ত্তন, কোথাও বা আবর্ত্তন-পূর্ব্বক ব্যাবর্ত্তন প্রণালী অবলম্বিত হয়। ইহাকে নিষেধাবর্ত্তন বলে. (conversion by negation)।

সকল মানুষ মর

∴ কোন অমর মানুষ নহে—(ব্যাবর্ত্তন)

∴ কোন মানুষ অমর নহে—(আবর্ত্তন)

"আ","এ" এবং "ও" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আবর্ত্তন বা নিষেধা-বর্ত্তন সম্ভব- 'ই" বাক্যের তাহা সম্ভব নয়, যেহেতু "ই" বাক্যকে ব্যাবর্ত্তন করিলে "ও" বাক্য সিদ্ধ হয় এবং "ও" বাক্যের আবর্ত্তন হইতে পারে না। আবার দেখা যায়—

সকল মানুষ মর

কোন কোন মর মানুষ—(আবর্ত্তন)

কোন কোন মর অমানুষ নহে—(ব্যাবর্ত্তন)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, "ও" বাক্যের আবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং "ও" বাক্যের আবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্যাবর্ত্তন বা নিষেধাবর্ত্তন সম্ভব নহে ; আ, ই এবং "এ" বাক্যের সম্ভব।

আবার দেখা যায়, "সকল মানুষ মর" এই বাক্য হইতে "সকল অমর অমানুষ" এইরূপ সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক নয়। এস্থলে পুরোগাব-য়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ অনুগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের বিরুদ্ধ। এই প্রকার সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হওয়া যায়, দেখা যাউক।

সকল মানুষ মর

কোন মানুষ অমর নহে—(ব্যাবর্ত্তন)

কোন অমর মানুষ নহে—(আবর্ত্তন)

সকল অমর অমানুষ—(ব্যাবর্ত্তন)

এই মিশ্র নিরপেক্ষানুমানকে conversion by contraposition

বা বিরুদ্ধাবর্ত্তন বলে। ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে, "ই" বাক্যের বিরুদ্ধাবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণ, "ই" বাক্য ব্যাবর্ত্তিত হইলে "ও" বাক্যে পরিণত হয় এবং "ও" বাক্যের আবর্ত্তন হয় না।

নিষেধাবর্ত্তন ও বিরুদ্ধাবর্ত্তন ছাড়া আর এক প্রকার মিশ্র নিরপেক্ষানুমান আছে, যাহাতে অনুগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ পুরোগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ হইতে ভিন্ন গুণবিশিষ্ট। এই প্রণালী অবলম্বনে "কোন মানুষ অমর নহে" এই বাক্য হইতে "কোন কোন অমানুষ অমর" বাক্য প্রাপ্ত হই। দেখা যাউক, কি উপায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়ঃ—

কোন মানুষ অমর নহে
কোন অমর মানুষ নহে—(আবর্ত্তন)
সকল অমর অমানুষ (ব্যাবর্ত্তন)
কোন কোন অমানুষ অমর—(আবর্ত্তন)

এই অনুমানপ্রণালীকে অন্তরাবর্ত্তন বা Inversion বলে।

এই প্রকারে আবর্ত্তন ও ব্যাবর্ত্তনপ্রণালী অবলম্বনে কোন একটী বাক্য হইতে নানা অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাবর্ত্তিত বাক্যটী "ও" হইলে "ও" বাক্যের আর আবর্ত্তন সম্ভব হয় না।

এই স্থলে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এরিষ্টটল নিরপেক্ষানুমান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন নাই। তবে তিনি যে নিয়ম স্থির করিয়া গিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান ন্যায়শাস্ত্রে নিরপেক্ষানুমানের মূলভিত্তি।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্বন্ধ লইয়াই যাবতীয় বাক্য ব্যবহৃত হয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই বিধেয় পদটী উদ্দেশ্য পদের জাতি বা ব্যাবর্ত্তক গুণ বা ধর্ম্ম বা উপলক্ষণ। এই সম্বন্ধ নিরূপণ দুই প্রকারে হইতে পারে ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রণালী

অবলম্বনে (Inductive method) বা সাপেক্ষ অনুমান প্রণালী অবলম্বনে (Deductive method)।

বিধেয় পদটী যদি উদ্দেশ্য পদের সংজ্ঞাবাচক অথবা সার গুণবাচক শব্দ হয়, তবে বিধেয় পদটী উদ্দেশ্য পদের সহিত আবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু যদি বিধেয় পদটী জাতিবাচক বা উপলক্ষণ হয় তাহা হইলে উক্ত প্রকারে আবর্ত্তিত হইতে পারে না।

"মানুষ হয় প্রাণী" এই স্থলে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের জাতি। সুতরাং "প্রাণী হয় মানুষ" এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। 'মানুষ হয় চিন্তাশীল জীব'—চিন্তাশীল জীব এইটী এস্থলে উদ্দেশ্যের বিধেয়ক এবং উদ্দেশ্যের সংজ্ঞাবাচক সুতরাং "চিন্তাশীল জীব হয় মানুষ" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাপারটী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা দ্বারা যে পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহা কোন্ জাতির অন্তর্গত এবং তাহার ব্যাবর্ত্তক গুণ কি—এই দুইটী বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। পরন্তু সেই জাতি ও ব্যাবর্ত্তক গুণ প্রত্যেকটীই মানুষ বলিতে যাহা বুঝি তাহা হইতে ব্যাপক এবং প্রত্যেকটী পৃথক ভাবে ব্যাপক হইলেও উভয়ের সংযোগে "মানুষ" ছাড়া ব্যাপকতর কিছু বুঝায় না।

এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাপারটী যথাযথ সম্পন্ন করাই সত্য নির্ণয়ের সোপান। সক্রেটীস ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান যে, প্লেটো তাহারই উপর সোপান নির্ম্মাণের উপায় ও প্রণালী নিরূপণ করিয়া যান, এবং এরিষ্টটল সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হন। উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যায়, কোন একটী পদার্থের সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই পদার্থটী কোন্ জাতির অন্তর্গত সেটী প্রথমেই স্থির করিতে হইবে এবং সেই জাতির অন্তর্গত অপর জাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ কোথায় এবং সেই পদার্থটীকে কোন অপর জাতি বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে সেটীও বিবেচ্য। অর্থাৎ পদজাতিকে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে

সার গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে সেই পর জাতিকে বিভাগ করিয়া অপর জাতিতে উপনীত হইতে হইবে।

কোন বস্তুর সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম মনে রাখিতে হইবে, বিরুদ্ধ বাক্যের সাহায্যে আমরা কথনও যেন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না করি। অর্থাৎ 'সৎ কি' এ প্রশ্ন করিলে 'যাহা অসৎ নয় তাহাই সৎ' এইরূপে সংজ্ঞা প্রদান বিধেয় নহে। দ্বিতীয়তঃ, যেটীর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছি প্রকারান্তরে সেই কথাই ধরিয়া লওয়া দোষ-যুক্ত। তৃতীয়তঃ, কোন পদার্থকে তৎব্যাপ্য পদার্থের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা বা তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক। যথা— যদি কেহ প্রশ্ন করে, মানুষ কাহাকে বলে এবং তদুত্তরে কেহ যদি কেহ বলেন 'রাম মানুষ' তাহা হইলে সেটী ন্যায়সঙ্গত হয় না।

সাপেক্ষানুমান সম্বন্ধে প্লেটো যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এরিষ্টটল তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করেন। একটী উদাহরণ লইয়া সে কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হন। যথা—

জীব

মর অমর

পদযুক্ত পদহীন

প্লেটো জীবকে মরজীব ও অমরজীব দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াই ধরিয়া লন যে,'মানুষ মর জীব'। তাহার পর মর জীবকে আবার পদযুক্ত ও পদহীন দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াই স্থির করেন, মানুষ পদবিশিষ্ট মর জীব। এরিষ্টটল এই "ধরিয়া লওয়া" ব্যাপারটীতে বিশেষ আপত্তি করেন। তিনি বলেন 'মানুষ মর জীব' এ কথা অনুমানবলে সিদ্ধ করিতে হইবে। এরিষ্টটল আরও বলেন, অনুমানপ্রণালী বলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত দুষ্ট। বিশুদ্ধ অনুমানে এইরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইবে—

মানুষ হয় মর।

সক্রেটীস হয় মানুষ।

সুতরাং সক্রেটীস হয় মর।

অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদের যেটা বিধেয়ক, সেই উদ্দেশ্য পদের অন্তর্গত যাবৎ পদার্থেরও সেই বিধেয়ক হইবে।

এই স্থলে একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে দেখা যাউক, প্লেটোর ধরিয়া লওয়া ব্যাপারটী কি? সকলেই জানেন, নিগমনমূলক যুক্তি বা সাপেক্ষানুমান (Deductive method) প্রণালীতে দুইটী অবয়ব থাকে, এবং একটী হেতু থাকে।

মানুষ মর—এটী সাধ্যাবয়ব (major remise)

যদু মানুষ—এটী পক্ষাবয়ব (minor premise)

∴ যদু মর—এটী নিগমন (conclusion)

যেহেতু মানুষ মাত্রেই মর এবং মানুষ যদুকে ব্যাপিয়া আছে, সেই হেতু যদু মর। সুতরাং হেতু (middle term) বলিতে মানুষকেই বুঝাইতেছে। এই দৃষ্টান্তটী বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, একটী ব্যাপ্যক বাক্য হইতে একটী ব্যাপ্য বাক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং এই প্রণালীর সর্ব্ব মূলে এমন একটী ব্যাপক বাক্য থাকা চাই, যেটীকে আর ব্যাপকতর পদার্থের অন্তর্গত করা যাইতে পারে না। তবেই সেটী মূল পদার্থ হইবে, নতুবা অনবস্থা দোষ উপস্থিত হইবে। প্লেটো যখন পদার্থের শ্রেণীবিভাগকার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং এরিষ্টটল যেখানে প্লেটোর দোষ দর্শন করেন, বাস্তবিক পক্ষে সেটী প্লেটোর দোষ নহে। কারণ এই ধরিয়া লওয়া ব্যাপারটী যে ন্যায়সঙ্গত, সেটী এরিষ্টটলও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে কোন্‌খানে স্বীকার করিতে হইবে, সেইটীই বিবেচ্য।

উপরোক্ত উদাহরণে মানুষকে মরণধর্ম্মশীল বলিয়া ধরা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, কোন দার্শনিক এ পর্য্যন্ত 'মানুষ মর' এই সিদ্ধান্ত নিগমন-মূলক যুক্তিপ্রভাবে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? রাম, শ্যাম যদু, হরি, সক্রেটীস, প্লেটো সকলেই মরিয়াছে বলিয়া কে বলিল মানুষ মাত্রেই মর? যদি কেহ অস্বীকার করে, এমন কোন তার্কিক নাই

যে যুক্তি দ্বারা তার আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে।

আমরা আগামীবারে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর আলোচনায় অগ্রসর হইব।

(ক্রমশঃ)

ব্রজ-ভ্রমণ।

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

পর দিবস প্রত্যুষে অন্যান্য যাত্রিগণের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে শ্রীশ্রীরাল গ্রামে সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও শ্রীশ্রীবলদেব দর্শন করিয়া বসতীগ্রামে আসিলাম—এই গ্রামে মহারাজ বৃষভানু কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। বসতীগ্রামের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মুখরাই গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীমতী রাধিকার মাতামহী বাস করিতেন। ইহার ১ মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। বসতীগ্রাম ও রাধাকুণ্ডের মধ্যপথে "কদমখণ্ডি" অর্থাৎ কদম বন ও জগমোহন কুণ্ড দর্শন করিয়াছিলাম। এই বন কদম ফুলের সৌরভে আমোদিত করিয়া যাত্রীদিগকে বহুদূর হইতেই আকৃষ্ট করে। শ্রীরাধাকুণ্ডে বেলা প্রায় ১১টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়া মণিপুর কুঞ্জে আশ্রয় লইলাম। বহুলা গ্রাম হইতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড প্রায় মাইল। আজ এই স্থানেই রাত্রিবাস করিতে হইবে।

বৃন্দাবন হইতে মথুরার মধ্য দিয়া একটি পাকা রাস্তা রাধাকুণ্ডে আসিয়াছে। সমস্ত দিন ঘোড়ার গাড়ি ও এক্কায় করিয়া যাত্রী আসিয়া এই গ্রামটিকে ছোট খাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরে পরিণত করিয়াছে। ইহার রাস্তাগুলি পাথর দিয়া বাঁধান; রাস্তার ধারে সারি সারি বিপণি-

শ্রেণী, ঔষধালয় ডাক্তারখানা, পোষ্ট আফিস ইত্যাদি। গ্রামটি নানা দেশ হইতে আগত বিচিত্র বেশভূষাধারী যাত্রিগণে সর্ব্বদাই মুখরিত। বৃন্দাবনের সমস্ত দেব দেবী এখানেও বিরাজিত আছেন। সহরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। উভয় কুণ্ডই পরস্পর সংলগ্ন। স্বনামধন্য লালাবাবু বিস্তর অর্থব্যয়ে এই কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করাইয়া পাথর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। কুণ্ডদ্বয়ের চারিদিকেই ঘাট স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কুণ্ডদ্বয়ের উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ :—পূর্ব্বে এই স্থানকে "অরিট্ট থেয়র" বলিত। কংসের অনুচর অরিষ্টাসুর বা বৃষাসুর বৃষের আকার ছিল বলিয়া) এই স্থানে বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ উহাকে নিধন করিয়া অতি মনোরম, নানা ফলপুষ্পে শোভিত—উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ এই বাগানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা ললিতাদি আট জন সখির সঙ্গে তাঁহার বাগানে সূর্য্যপূজা করিবার জন্য ফুল তুলিতেছেন। স্নানান্তে মুক্তকুন্তলা অপরূপ শোভাময়ী বালিকাকে অনেকক্ষণ দেখিলেন তাহার পর রহস্য করিবার জন্য সহসা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "তাইত বলি—রোজ রোজ আমার বাগানে লতা পাতা ছিঁড়িয়া কে ফুল তুলিয়া লইয়া যায়! আজ চোর ধরিয়াছি—কিছুতেই ছাড়িব না।" বালিকা ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গেল এবং বলিল "তুমি বৃষ বধ করিয়া গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ—আমাদের ছুঁইয়া সূর্য্যপূজার ব্যাঘাত করিও না।" তাহাদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া গোহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। অনেক চিন্তার পর রাধিকা বলিলেন "যদি সর্ব্বতীর্থজলে স্নান করিতে পার তবেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সেই স্থানেই বংশী দ্বারা এক কুণ্ড খুঁড়িয়া তীর্থসকলকে আহ্বান করিলেন তাঁহার আহ্বান মাত্রেই তীর্থসকল আসিয়া কুণ্ড-টিকে পূর্ণ করিয়া দিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া কল্পিত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া রাধিকারও ঐরকম একটি কুণ্ড করিতে ইচ্ছা হইল—তখন সব সখি

মিলিয়া কৃষ্ণের কুণ্ডের পার্শ্বেই নিজ নিজ কঙ্কণ দ্বারা কুণ্ড খনন করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর কুণ্ড খোঁড়া হইল কিন্তু জল যে আসে না! বালিকাদের স্বভাবসরল মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে লজ্জিতা দেখিয়া বলিলেন যে, শ্যামকুণ্ডের জল লইয়া এই কুণ্ড পূর্ণ করিলেই হইবে। তাঁহার বাক্যে সকলেই সম্মত হইয়া কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যভাগে খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলেন; তখন শ্যামকুণ্ডের জল আসিয়া রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করিল। এই সংযোগস্থল এখনও দেখা যায়। কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই সংযোগ সাধিত হইয়াছিল; সেই জন্য এই তিথিতে নানা দেশের বহু যাত্রী এই স্থানে আগমন করেন ও গভীর রাত্রে এই উভয় কুণ্ডে স্নান করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করেন। শ্যামকুণ্ড হইতে রাধাকুণ্ডের শোভা ও বিস্তার বেশী। কুণ্ডদ্বয়ের চারিদিকে অনেক রকমের বড় বড় গাছ আছে, তাহারা পরিশ্রান্ত পর্য্যটককে শীতল ছায়া দান করে। শত শত যাত্রী ইহাদের তলায় শুইয়া বসিয়া ধ্যান ধারণায় কাল কাটাইয়া দেয়।

আমরা যে মণিপুরী কুঞ্জে আশ্রয় লইয়াছিলাম—উহা রাধাকুণ্ডের ধারেই। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর আমরা সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যভাগে রত্নবেদীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলাম। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলাম। রাধাকুণ্ডে রাজা রায় বনমালী রায় বাহাদুরের একটি বাড়ী আছে। চৌরাশীক্রোশ ব্রজ ভ্রমণকারীদের তিনি প্রতি বৎসরই পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের ভবনে ভোজন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা ৩টা। আরও ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় ৪টার সময় রাধাকুণ্ডের তীর্থগুলি দর্শন করিতে বাহির হইয়া নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম:—

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের উপবেশন স্থল—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রাধাকুণ্ডে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের বৈঠক

শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্দির, হনুমান মন্দির, মণিপুর পুরাতন কুঞ্জে রাসবিহারীর মন্দির, কুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির, ঝুলন তলা, শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্থান, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুরের ভজন কুটীর। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ফুল-সমাজ- ইনি এই স্থানে ভজন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। এখানে বৈষ্ণব বাবাজীগণ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন স্থান, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও গোবিন্দ ঘাট, শ্রীশ্রীগদাধরচৈতন্য মন্দির, নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর, মণিপুর বড় কুঞ্জে শ্রীশ্রীগোবিন্দজী, ব্যাসঘেরা, মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর ভজন কুটীর, গোপকুয়া, অষ্টসখি কুঞ্জ, বনখণ্ডি, তমাল তলা, শ্যামকুণ্ডের মধ্যদেশে শ্রীশ্রীব্রজনাভ কুণ্ড, শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্যামকুণ্ডের নিকটে ললিতাকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের পশ্চিমে মল্লহার কুণ্ড—শ্রীমতী রাধিকা ইহার তীরে বসিয়া সূর্য্য পূজা করিবার জন্য মালা গাঁথিতেন। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীশ্রীমহিমেশ্বর নামে অতি প্রাচীন মহাদেব বিরাজিত আছেন, ইহা ছাড়া এখানে আরও অনেক কুঞ্জ ও মন্দিরাদি আছে। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিবার সময় পাণ্ডারা সবগুলিই যাত্রীদের অতি আগ্রহের সহিত দেখাইয়া থাকে। তীর্থ ও কুণ্ডগুলি দর্শন করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ভোর হইলে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া গিরি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলাম। এই পাহাড়টি প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৩।১৪ মাইল পথ চলিতে হয়। রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় ১½ মাইল রাস্তা আসিলে কুসুম সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম "কৃষ্ণ সরোবর"। এই সরোবরের তীরে কুসুমকানন। শ্রীমতী রাধিকা এই কুসুমকানন হইতে কুসুম চয়ন করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন। সরোবরের চারিধারেই পাথর বাঁধান ঘাট। ঘাটের উপর দুই একটি মন্দিরও দেখিতে পাওয়া

যায়। স্থানটি অতি নির্জ্জন—তপস্যা করিবার উপযুক্ত। সরোবর-পরিক্রমাকালে দুইটি বালক-তাপসকে দেখিলাম। আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে তাঁহারা এই স্থানে প্রায় ১ বৎসর হইতে আছেন ও পরম সুখেই আছেন।

কুসুম সরোবরের নিকটেই নারদ কুণ্ড। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা দেখিতে অভিলাষ করিয়া এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

গিরি গোবর্দ্ধন—কুসুম সরোবর হইতে আরও ১½ মাইল পথ আসিলে গোবর্দ্ধনে পৌঁছান যায়। পর্ব্বতটিকে দূর হইতে একটি গাভীর ন্যায় দেখায়। প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত পাহাড়টির কতক অংশ নানাবিধ লতাগুল্মতরুরাজবেষ্টিত কতক অংশ শুধু বড় বড় কাল পাথরে আবৃত—একটি তৃণ পর্য্যন্ত নাই। এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত গোবিন্দসদৃশ পূজ্য, এই জন্য ইহার উপরে কেহই উঠিতে পায় না।

শ্রীভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাকালে নন্দ প্রভৃতি গোপসকল সুবৃষ্টি হইয়া উত্তমরূপ শস্যাদি জন্মায়, এই কামনায় বৎসরান্তে একবার দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিতেন। এইরূপ পূজার সময় আগত হওয়ায় গোপবৃন্দ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহাতে বাধা প্রদান করিয়া পূজা করিতে নিষেধ করেন; এবং ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে এই গিরিকেই পূজা করিয়া অভীষ্টলাভ করিতে উপদেশ দিলেন। মহারাজ নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সম্মত হইয়া গোবর্দ্ধনেরই পূজা করিলেন। নিজ পূজা ও সম্মান বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইন্দ্রদেব অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘসকলকে প্রবল বেগে বারি বর্ষণ করিয়া ব্রজমণ্ডল ডুবাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। মেঘ সকল অবিরল ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল। অশনিপাত ও শীলাবৃষ্টিতে ব্রজমণ্ডলে প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। ব্রজবাসী ও অন্যান্য জীবকুলের কষ্টের সীমা রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের কষ্ট দেখিয়া এই পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া ব্রজবাসিগণকে

নিজ নিজ গোধন লইয়া পর্ব্বতগর্ভে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সাত দিন মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল, ব্রজবাসিগণের কোন বিপদই হইল না। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন ও তাঁহার নিকটে আসিয়া নানাবিধ স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। বারিবর্ষণ বন্ধ ও আকাশ নির্ম্মল হইলে গোপবৃন্দ গোধন লইয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদবধি গোবর্দ্ধনের পূজা দ্বারা সকল অভীষ্ট সাধিত হইতে লাগিল।

গোবর্দ্ধনের নিকটেই ভরতপুর-রাজবংশের অনেকগুলি সমাজ-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতের স্বর্গকামনায় এই সকল মন্দিরে চিতাভস্ম রক্ষিত হইত। ভরতপুর রাজার ধর্ম্মশালা ও বাগান-বাটীও ইহার নিকটে আছে। পর্ব্বত যাত্রিগণ পরিক্রমাকালে ইহার আশে পাশে ছোট ছোট পাথরের ঘর তৈয়ার করিতে লাগিল—বালক বালিকাদের খেলাঘরের ন্যায় এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিল যে, তাহাদের মৃত আত্মীয় বন্ধুগণের যাহাতে পরজন্মে উত্তম গৃহাদি লাভ হয়, এই কামনায় তাহারা এইরূপ করিতেছে। কারণ, গোবর্দ্ধনে যে যাহা কামনা করে তিনি তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিলাম যে অধিকাংশ যাত্রীই দু-চার খানি পাথরের দ্বারা দু-তিনটি করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিল।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমাকালীন নিম্নলিখিত স্থানগুলি পাওয়া যায়ঃ—উদ্ধবমন্দির, রত্নসিংহাসন, বিহারকুণ্ড, মানসগঙ্গা—গোপবৃন্দ যখন গোবর্দ্ধনের পূজা করিতেছিল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে মানসে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ব্রজবাসীদের সহিত স্নান করিয়াছিলেন। শোনা যায় যে, এই গঙ্গায় স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জ্জিত হয়। মানস-গঙ্গা একটি বৃহৎ সরোবর। ইহার ধারে শ্রীশ্রীহরিদেবজীর অতি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান—মানসগঙ্গার উত্তর ধারে চক্রেশ্বর মহা-দেবের মন্দির ব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীমহাদেব চারি নামে বিখ্যাত হইয়া

পূজিত হইতেছেন, যথা:—শ্রীবৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, মানসগঙ্গায় চক্রেশ্বর বা চাকৃলেশ্বর ও কাম্যবনে কামেশ্বর। গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা করিয়া পুনরায় পরিক্রমায় নির্গত হইতে হয়। চাকৃলেশ্বর মহাদেবের নিকট সনাতন গোস্বামীর ভজন-স্থানও বিদ্যমান। গোস্বামিজী এই স্থানে ভজন করিতেন। একদিন তিনি মশা ও "কোঙরী" নামক এক প্রকার ছোট ছোট পোকার উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে মনস্থ করিলেন। সনাতনের মনের ভাব অন্তর্যামী ভগবান্ মহাদেব জানিতে পারিয়া তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, আজ হইতে এখানে মশক ও কোঙরীর উপদ্রব আর থাকিবে না। তদবধি এখানে মশক ও কোঙরীর উপদ্রব নাই। এক্ষণে এই স্থানে অনেক বাবাজী সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া আমরা পথে গোবর্দ্ধন গ্রাম, ঋণমোচন, পাপমোচন, চন্দ্র সরোবর, শ্রীবলদেবজী, শৃঙ্গারমন্দির, অন্নকূট গ্রাম, বলরামের হস্তচিহ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে আসিলাম। এই সরোবর দেবরাজ ইন্দ্র গোবিন্দের প্রীতি কামনায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের তীরেই শ্রীগোপাল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীকে দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন। পুরী গোস্বামী গোপালকে চিনিতে পারেন নাই, পরে স্বপ্নে সেই বালকরূপী গোপালকে চিনিতে পারিয়া এবং গোপালের মূর্ত্তি যে মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়া কুণ্ডের উত্তর তীরে আছে ইহাও জানিতে পারিয়া পরদিন উহা উত্তোলন করেন এবং সেই কুণ্ডের জলে অভিষেক করিয়া মহা সমারোহে অন্নকূট উৎসব করেন। গোবিন্দকুণ্ড হইতে পুছারি গ্রামে আসিতে হয়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে গাভীর আকার কল্পনা করা হয়। এই গ্রাম গোবর্দ্ধনের পুচ্ছের নিকট বলিয়া ইহাকে "পুছরীলোঠা" বলা হয়। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সাত বৎসর বয়সের পদচিহ্ন স্থান, গোবর্দ্ধন ধারণের স্থান, গোবিন্দ দাস গোস্বামীর সমাধি, হরিজী কুণ্ড, শ্রীনাথ মন্দির, যতীপুরা বা মুখারবিন্দ দর্শন করিলাম—এই স্থানে গোবর্দ্ধনের মুখ। এই

কারণ যাত্রিগণ এই স্থানে দুধ ও ভোজ্য দ্রব্য ভোগ দিয়া থাকেন। নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ এইখানেই গিরির পূজা করিয়াছিলেন। এখানে গোকুলীয়া গোস্বামীদের শ্রীশ্রীগোপালদেব বিগ্রহ স্থাপিত আছে, তথায় অন্নকূট উপলক্ষে বহু যাত্রিসমাগম হয় ও উক্ত উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যতীপূরা বা মুখারবিন্দ হইতে দানঘাটিতে আসিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপীদের নিকট হইতে দান লইয়াছিলেন। এইখানেই গোবর্দ্ধন পরিক্রমার শেষ হইল। আমরা বেলা ৫টার সময় গোবর্দ্ধনে মানসগঙ্গায় ফিরিয়া আসিলাম।

গোবর্দ্ধন হইতে অতি প্রত্যূষে আমরা লাঠাবন (অপর নাম, দীগ) অভিমুখে রওনা হইলাম। পূর্ব্বে বনযাত্রা লাঠাবন হইয়া যাইত না—সোজা মেঠোপথেই কাম্যবনে যাইত। ভূতপূর্ব্ব ভরতপুররাজ ব্রজবাসীদের প্রভূত অর্থদানে বশীভূত করিয়া যাত্রা তাঁহার রাজ্যমধ্য দিয়া লইয়া যান। গোবর্দ্ধন হইতে দীগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা। পথে গোলালকুণ্ড, বেহেজ গ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও শ্রীবলদেব দর্শন করিয়া ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় দীগে পৌঁছিয়া মহারাজার একটি উদ্যানে গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম। উদ্যানের পূর্ব্বদিকে কৃষ্ণকুণ্ড নামে এক বৃহৎ সরোবর আছে। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর স্নান করিয়া মাধুকরী লইয়া আসিলাম। এই রাজ্যে গরীব দুঃখী যাত্রিগণ এত বেশী সদাব্রত পায় যে অন্য কোনও বনে এত পায় না। পরিক্রমাকালে ভরতপুররাজ স্বয়ং মুক্তহস্তে সদাব্রত বিলাইয়া থাকেন।

বেলা প্রায় ৪টার সময় নগর ও ইহার বিখ্যাত দুর্গ দেখিতে যাইলাম। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে এই দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মহারাজ বদন সিংহ এই সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগল ও মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে জাঠ জাতিকে রক্ষা করেন। এখনও দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও ইহার মধ্যস্থিত ভগ্ন রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী দৃঢ় ও সুন্দর, এবং চারিদিক গভীর পরিখাবেষ্টিত।

দুর্গের স্তম্ভ ও প্রাচীরাদি যে এক সময়ে মনোহর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে চিত্রবিচিত্র ছিল, তাহা এই ভগ্ন অবস্থায় দেখিলেও বেশ বুঝা যায়। এই দুর্গ ইংরাজ জেনারেল ক্রেসার কর্ত্তৃক একমাস অবরুদ্ধ থাকিয়া আত্মসমর্পণ করে। অবরুদ্ধ অবস্থায় দুর্গগাত্রে যে সকল গোলা লাগিয়াছিল তাহার চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান।

নগরটি চতুর্দ্দিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত—সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইহার "বন বন" অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদ সৌন্দর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে বিখ্যাত ইংরাজ কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইলে দুর্গ ও সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। নগরের অধিবাসীরা অধিকাংশ "জাঠ"। জাঠগণ বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্ত হইলেও রণদুর্ম্মদ ও বলিষ্ঠ। এখানে একপ্রকার সুন্দর চামর দেখিলাম। ইহা চামরীর পুচ্ছে প্রস্তুত না হইয়া হাতির দাঁতে অথবা চন্দন কাঠের ঝুরি দ্বারা প্রস্তুত হয়। জাঠরমণীগণই ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবং ইহার অধিবাসিগণ সৌখিন ও গীতবাদ্যপ্রিয়।

আমরা যখন এই নগরে প্রবেশ করি, তখন বাবাজীগণ আমাদের অগ্রে অগ্রে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছিলে। সেই উচ্চ কোলাহল ও সংকীর্ত্তনের সুরে আকৃষ্ট হইয়াই হউক অথবা পূর্ব্ব হইতে আমাদের আগমন জানিতে পারিয়াই হউক—নগরের অধিবাসী স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা—কাতারে কাতারে রাজ পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। ইহাদের সরল আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে না পারিলেও তাহারা কীর্ত্তনের সুর ও উদ্দাম নৃত্য বেশ উপভোগ করিতেছে। নগর ভ্রমণকালীন আমার একটি যুবকের সহিত খুব আলাপ হইয়াছিল—ইনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের দেশের আচার ব্যবহার, দুর্গ ও সহরের ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিধ তথ্য জানাইতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে গীত বাদ্যের কথা উঠিলে ইনি আমাদের রাত্রে ভোজন করিতে ও গীতবাদ্য শুনিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি

আমার সহিত এত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরে ব্রজভ্রমণ সময়ে অন্যান্য জাঠযুবকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরকে অল্পকালের মধ্যে আপন করিয়া লওয়া ইঁহাদের খুবই স্বাভাবিক—এত সরলতা অন্যত্র দুর্লভ। যাহা হউক রাত্র ১০ টা পর্য্যন্ত গান বাজনা হইল—গানগুলির অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক—ভাষা ভাঙ্গা ব্রজবুলী। অতঃপর পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সরকার)

লভিয়া জনম বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালীর এই দেশে,
সংসার ছাড়ি কত দেশে তুমি ভ্রমিলে গো যোগীবেশে;
পরহিতব্রতে সারাটী জীবন দেহ মন প্রাণ ঢালি,
ধর্ম্মের সার-মহিমা প্রচার করিয়া গেলে গো চলি;
জ্ঞানের আলোক বিতরি ধরায় নাশিলে মোহ তিমির,
ফললাভ আশে কর নাই কিছু হে মহাকর্ম্মবীর।

লঙ্ঘি জলধি গেলে যবে তুমি আমেরিকা মহাদেশে,
চিকাগো সহরে, উদার সৌম্য, পরিব্রাজকবেশে,
বিশ্ব-ধর্ম্ম-সভায় তোমারে লইল সাদরে বরি,
হিন্দুর মান রাখিলে গো তুমি ধরম ব্যাখ্যা করি;
জনতা-বিপুল সভায় করিলে দুইটী কথায় স্থির,
হিন্দুধর্ম্মে তুলিলে উচ্চে সবার ধর্ম্মবীর।

গুরু উপদেশে লোকহিতকর কতই না কাজ করিলে,
'গরীবের সেবা' মহাব্রত সেটা তুমিই মানবে শেখালে;
ছিলে যোগী তবু স্বদেশের তরে নিজ দেহ পাত করেছ,
নিষ্কাম হয়ে করিতে কর্ম্ম তুমিই মোদের বলেছ;
শিখায়েছ তুমি রাখিতে জীবনে ত্যাগের আদর্শ স্থির,
নরপতি হ'তে পারিতে গো তবু হইলে কর্ম্মবীর।

পরের ধর্ম্ম ঘৃণার নয়নে দেখ নাই তুমি কভু,
যবন খ্রীষ্টানে আদরেতে সবে বক্ষে লয়েছ প্রভু;
অতুল ঐশ্বর্য্য কত নরনারী তোমার চরণে সঁপেছে—
ফেলি দূরে সব চলে গেছ তুমি. তারা পিছু পিছু ছুটেছে.
দেবতার কাজে এসেছিলে হেথা—ছাড়িয়া এ দেহনীড়
দেবতার মাঝে গেলে চলি পুনঃ তুমি গো ধর্ম্মবীর।

মথুরা অঞ্চলে জলপ্লাবন।

আমরা বৃন্দাবন হইতে ২৮শে নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানা পাইয়াছি তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, মথুরা অঞ্চলে কি ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছে। আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট সহস্র সহস্র বিপন্ন নরনারীগণের দুঃখ মোচনে সাহায্যার্থ আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে যিনি যাহা পাঠাইতে চান তাহা ম্যানেজার উদ্বোধন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

আলোয়ারের যে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে তাহার জল আলোয়ারের ভরগাঁও জেলার অনেক স্থল, ভরতপুরের কয়েকটী গ্রাম এবং মথুরা জেলার বহু গ্রাম নষ্ট করিয়া এখনও প্রবাহিত হইতেছে। এই জলে মথুরা জেলার বড় বড় পঞ্চাশটি এবং ছোট ছোট অ রও

অনেক গ্রামের এই সময়কার শস্য - জোয়ার, সোয়ার, বাজরা, তুলো এবং বহু প্রকার কড়াই - নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জল অদ্যাবধি কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক গলা এই ভাবে বর্ত্তমান শস্য ত নষ্ট হইয়াছেই, তাছাড়া আবার উহারা জলে পচায় বাষ্প দূষিত হইয়া যে অতি ভয়ঙ্কর রকমের ম্যালেরিয়া হইতেছে, তাহা এই সত্য ঘটনাটী হইতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। যেখানে একটু উঁচু জমি জলের উপরে জাগিয়া আছে, তাহাতে মূলো কিম্বা অন্য কোন শাক সবজী দিবার জন্য কৃষক গ্রাম হইতে এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল লইয়া গেল, এবং বৈকালে অভুক্ত অবস্থায় জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইল। পরে তাহার স্ত্রী খাওয়াইবার জন্য যখন ডাকিল, তখন সাড়া না পাইয়া লেপ তুলিয়া দেখে তাহার স্বামী মরিয়া রহিয়াছে!

যা তা খাইয়া রক্তামাশয, পেটের অসুখ প্রভৃতি এখনই সুরু হইয়াছে, পরে কলেরাও আরম্ভ হইতে পারে। কারণ, নীচু জমিতে যে সব কুয়া ছিল সেগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যে গ্রামের সমুদয় কুয়া জলের মধ্যে সেখানকার লোকদের ঐ পচা জল খাইয়াই বাঁচিতে হইবে বা মরিতে হইবে - শেষোক্তটাই হইতেছে। যে গ্রাম অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে সে গ্রামের মাটীর ঘরগুলির দেয়াল প্রায় মাসাবধি জলে ডুবিয়া থাকায় গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। লোকেরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া গাছের তলায় অথবা ফাঁকা জায়গায় শুইতেছে, সে জন্য ব্রন্‌কাইটিস্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হইতেছে। বালকবালিকারাই ইহাতে বেশী মারা যাইতেছে। গ্রামের চারিদিকে জল দাঁড়ানয় গ্রামটী স্যাঁতসেঁতে হইয়াছে—একে বস্ত্রাভাব, তদুপরি ঐরূপ স্থানে শোয়ায় সহজেই রোগগ্রস্ত হইতেছে। শীত অত্যধিক পড়িয়াছে এবং ক্রমশঃই বাড়িতেছে। গ্রামসমূহের চারিদিকে জল দাঁড়াইয়া থাকায় ঠাণ্ডা বৃন্দাবন হইতেও অধিক। মথুরা জেলার প্লাবিত জমির পরিমাণ সোজা ভাবে ৩০ মাইল, কিন্তু জল নীচু জমি হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাওয়ায় প্রায় ৬০ মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন যাইবার রাস্তায় প্রায় ৫ হাত চওড়া নালা কাটিয়া সরকার বাহাদুর জল নিকাশের পথ করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে অবিরত প্রচণ্ড বেগে প্রায় একমাস যাবৎ জল যাইতেছে। আমরা এক বুক জল ভাঙ্গিয়া গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, উহার কিছু পরে প্রায় এক ফারলং রাস্তার উপর দিয়া ৮ ইঞ্চ উঁচু হইয়া জল যাইতেছে, তাহার পর গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত রাস্তার উপর আর জল নাই কিন্তু দুই ধারে আছে। গোবর্দ্ধনের পরেই আবার রাধাকুণ্ডের রাস্তায় প্রায় ২০ হাত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও অত্যন্ত বেগে জল বাহির হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় সব জলে জলময়। মোটের উপর মথুরা প্রভৃতি জেলায় নিতান্ত দুর্দ্দিন উপস্থিত। মথুরায় একটী সেবাসমিতি দেখিলাম—মাত্র দুটী লোক কাজ করিতেছে! তাহারা কিছু কিছু কাপড় কিনিয়া কতক লোককে দিতেছে। কলিকাতার মাড়োয়ারীরা পঞ্চাশটী পুরাণো কোট পাঠাইয়াছিল, তাহার কয়েকটী নিতান্ত দুঃস্থ এবং পীড়িতদের দিয়াছে। সামান্ত কিছু কুইনাইন-ট্যাবলেট ও যৎসামান্ত কবিরাজী ঔষধ লইয়া ১০দিন যাবৎ তাহারা কায করিতেছে।

প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম অল্পে অল্পে কাজ হইতে পারে, এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহা বিরাট ব্যাপার। বিস্তর অর্থ ও লোকবল দরকার। যে ঔষধগুলি আমি পাঠাইবার জন্ত লিখিয়াছি, তাহা ছাড়া আরও ঔষধ যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রথমে centre হইতে ঔষধ লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জল ভাঙ্গিয়া যাইয়া ঔষধ দিয়া আসিতে হইবে, পরে লোকেরা জানিতে পারিলে centreএ আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইবে। দেখিলাম চাষীরা জ্বর-গায় জল ভাঙ্গিয়া কোথায় একটু উঁচু জমী আছে তাহাতে কিছু রোপণ করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির প্রাণরক্ষার জন্ত লাঙ্গল দিতে যাইতেছে। বর্ষাণায় centre করিলে লালা বাবুর ষ্টেটের Asst. Supdt. যে কয়টী ঘোড়ার দরকার তাহা দিবেন। ইহা ব্যতীত থাকিবার স্থান এবং দু এক জনের আহারের

ব্যবস্থা এবং একজন চাকরও দিতে পারেন। তিনি যতদূর সম্ভব সাহায্য ক'রতে রাজি আছেন। সে জন্য আমি কল্য বর্ষাণায় কিছু ঔষধাদি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

কি কি ভাবের সাহায্য চাই :—

(১) শস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং পরবর্ত্তী শস্য হইবার উপায় না থাকায় যত দিন না নূতন ফসল উঠে ততদিন আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(২ গৃহহীন লোকদের জন্য বাঁশের সাহায্যে চালা ঘর করিয়া দিতে হইবে।

(৩) রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্য চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৪) যাহাদের পরিবার বা গায়ে দিবার কিছুই একরূপ নাই, তাহাদের জন্য গজি থান কিনিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতে হইবে। পুরাতন বস্ত্রাদি পাইলেও উত্তম হইবে।

(৫) গ্রামের লোকেরা যাহাতে জল গরম করিয়া উহাতে কর্পূর অথবা শুঁট পিঁপুলাদি দিয়া খায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কোন কোন গ্রামের আল কাটিয়া দিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহাতে অন্য দিক দিয়া জল না প্রবেশ করে তজ্জন্য স্থান বিশেষে বাঁধ দিতে হইবে।

মথুরায় একটী সেবাসমিতি ছাড়া আর কেহই এখনও ইহাদের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই। আমরা রাধাকুণ্ডে কাজ সুরু করিয়াছি। গোবর্দ্ধনের Govt. Dampier Hospital এক মানুষ ভোর জলের নীচে; তাঁহারা Hospitalটীর জিনিষ পত্র গোবর্দ্ধনের একটী ধর্ম্মশালায় লইয়া আসিয়াছেন। একটী হিন্দুস্থানী ডাক্তার তাহার chargeএ আছেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটী বাঙ্গালী ডাক্তারও ২৯শে নবেম্বর হইতে কাজ সুরু করিবেন বলিলেন। দিন দিন মৃত্যুসংখ্যা খুব বাড়িতেছে। জনৈক মাড়োয়ারী কলিকাতার সেবাসমিতিকে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন আরও বিস্তর অর্থ ও লোকের প্রয়োজন। ● ●

সংবাদ ও মন্তব্য।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজির ষট্‌পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষে "দরিদ্র-নারায়ণ"গণের সেবা আগামী ২০শে মাঘ, সন ১৩২৪, ইংরাজি ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খৃঃ, রবিবার, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

আগামী মাঘ মাসে, ইংরাজি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) 'কুম্ভমেলার' অধিবেশন হইবে। এই বিরাট মেলায় দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসী সমবেত হইবে। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে তথায় গঙ্গাতীরে একটী সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। নিরাশ্রয় দরিদ্র-নারায়ণগণ পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আশ্রমে আনিয়া ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করা, বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিগণ পথহারা হইয়া স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সময়োপযোগী সাহায্য করাই উক্ত সেবাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য। এই শুভ অনুষ্ঠানটীর সাহায্যকল্পে যিনি যাহা সাহায্য করিতে চান —অর্থ হউক, ঔষধপথ্যাদি হউক—তাহা ব্রহ্মচারী পঞ্চানন, সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মঠ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্ত দরিদ্র ফণ্ডের বিগত জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত হিসাব।

জমা—

পূর্ব্বের হিসাবের শেষ ৬ অনৈক মহিলা, হাতিয়াবাগান, কলি-

কাতা – ১০, , এম মুখার্জ্জি, ক্যাম্প পঙ্গু, ঝরাইকেল – ১, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, মেসার্স এস, ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং, কলিকাতা ৩ মোট ২০ টাকা।

খরচ

দুঃস্থ খ্রীষ্টান ভদ্রপরিবারকে ১, শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ১, জনৈক খ্রীষ্টান ভদ্রলোককে ১, বাগবাজারের লেবু বাগানের দরিদ্র পরিবারকে ২, শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ১, জনৈকা মহিলা, উজানি গ্রাম ফরিদপুর ৫, নিকাসি পাড়াস্থ দরিদ্র পরিবারকে ২, শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ২ জনৈকা দরিদ্রা রমণীকে ১, শ্রীসীতানাথ ভট্ট ১, দরিদ্র ছাত্রকে মাসিক সাহায্য ৩ টাকা।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নভেম্বর মাসের আমরা যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের ১৪ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ৪০ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ৭ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, এক জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছে ও ১৬ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৫৫০ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫৫৪ জন নূতন এবং ১৯৯৬ জন পুরাতন।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৮১॥ এককালীন দান ৪ এবং পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিয়া ৸৶০—মোট ১২৩৸৶০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের জন্য ৩০৫।৶৫, বিল্‌ডিং ফণ্ড হিসাবে ব্যয় ২৫৫৴১০।
